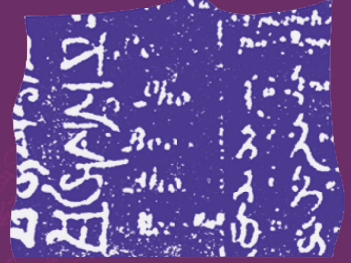


বর্ষ ৬৬ | সংখ্যা ৫৫ | জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ | মে ২০২৫

মাহিতিক

সাহিত্যিকী

বর্ষ ৬৬ | সংখ্যা ৫৫ | জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ | মে ২০২৫



বাংলা গবেষণা সংসদ

ISSN 1994-4888

ଆଦିତ୍ୟ

মাহিত্রিক

সংখ্যা : ৫৫ ॥ মে ২০২৫

বর্ষ : ৬৬ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

শহীদ ইকবাল

সম্পাদক



বাংলা গবেষণা সংসদ

বাংলা বিভাগ ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্যিকী

(Sahityiki)

পঞ্চপঞ্চাশৎ খণ্ড

প্রকাশক

বাংলা গবেষণা সংসদ

বাংলা বিভাগ ৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

স্বত্ব

বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী ৬২০৫

বাংলাদেশ

মুদ্রণ

দি সিটি অফসেট প্রিন্টার্স

তলাইমারী, রাজশাহী

প্রচ্ছদ

বিপ্লব দত্ত

মূল্য : তিনশত টাকা

ISSN : 1994-4888

প্রাপ্তিস্থান : সম্পাদক, সাহিত্যিকী, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ই মেইল : rubanglagobeshona@gmail.com

জ্ঞাতব্য : এ পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত অভিমত সম্পূর্ণভাবে লেখকের/ লেখকবৃন্দের
একান্ত নিজস্ব। এজন্য সম্পাদনা পরিষদ বা প্রকাশক কোনোভাবে দায়ী নন।

SAHITYIKI, Vol. 55, May 2025

Edited by Dr. Shahid Iqbal, Professor and Chairman, Department of Bangla,
University of Rajshahi, Rajshahi, BANGLADESH. Published by Bangla Gobeshana
Sangsad, Department of Bangla, University of Rajshahi; Printed by The City Offset
Printers, Talaimari, Rajshahi.

মাহিতিকো

সম্পাদনা পরিষদ
(২০২৪-২০২৫)

সম্পাদনা-পরিষদ

প্রফেসর শহীদ ইকবাল

প্রফেসর খন্দকার ফরহাদ হোসেন

প্রফেসর মনিরা কায়েস

প্রফেসর শামীমা হামিদ

প্রফেসর এ কে এম মাসুদ রাজা

সম্পাদক

সদস্য

সদস্য

সদস্য

সদস্য

সূ চি প ত্র

তারিক মনজুর

মেঘনাদবধ কাব্যে নামশব্দের ব্যবহার ০৯-১৯ পৃ.

মনোরমা ইসলাম

রাজিয়া খানের উপন্যাস : সমাজ-অস্বীকৃত প্রেম ও স্বাভাবিক জীবনবোধের বয়ান ২১-৪০ পৃ.

মো. সৃজা উদ্-দৌলা

সানাউল হকের শিশুসাহিত্য ৪১-৫৭ পৃ.

মো. আবুল ফজল

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় উপনিবেশায়ন ৫৯-৮১ পৃ.

মোছাঃ রওশন আরা

তিতাস একটি নদীর নাম : অন্ত্যজ নারীর অন্তর্বয়ন ৮৩-৯৭ পৃ.

মোঃ মোকাদ্দেস-উল-ইসলাম

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ইকোট্রিসিজম ৯৯-১১৫ পৃ.

মো. আবু বকর সিদ্দিক

বাংলাদেশের ছোটগল্পে দেশভাগের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ১১৭-১৪৮ পৃ.

শাকিলা আলম

জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য : অর্থময়তার সূত্র-সন্ধান ১৪৯-১৬৮ পৃ.

নীলিমা শীল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প : বাস্তবত্বের সফল রূপায়ণ ১৬৯-১৮৮ পৃ.

মো. নাজমুল হাসান

নবাবুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস : নির্মাণকৌশল ১৮৯-২১০ পৃ.

সমরেশ জন্মশতবার্ষিক-স্মরণ [২১১-২৪৮ পৃ.]

মো. খোরশেদ আলম

সমরেশ বসুর কথাসাহিত্য : সিন্ধুতে বিন্দুস্পর্শ

মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ

মাহিত্যিক

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬ ব. ঃ ১৯৫৯ খ্রি.

ru.ac.bd/bangle/bangle-journal-shahittyki

Print : ISSN 1994-4888

বর্ষ : ৬৬ সংখ্যা : ৫৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ ঃ মে ২০২৫

প্রকাশকাল : মে ২০২৫

প্রবন্ধ জমা : ০২ নভেম্বর ২০২৪

প্রবন্ধ গৃহীত : ০৬ নভেম্বর ২০২৪

পৃষ্ঠা : ০৯-১৯

মেঘনাদবধ কাব্যে নামশব্দের ব্যবহার

তারিক মনজুর

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ই মেইল : t.manzoort707@gmail.com

সারসংক্ষেপ

মধুসূদন দত্তের ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা ও সক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় *মেঘনাদবধ কাব্যে*। বিশেষত এই কাব্যের পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে কবি উপমা ও অনুপ্রাস তৈরি করেছেন। এছাড়া তিনি নানা ধরনের শব্দের প্রয়োগ করেছেন— শ্রেণিগতভাবে এসব শব্দ যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি গঠনগতভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। কাব্যের বিষয় ও ভাব প্রকাশে এবং ছন্দ ও গতি উপস্থাপনে শব্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এই আলোচনায় *মেঘনাদবধ কাব্যে* ব্যবহৃত নামশব্দ বা বিশেষ্য শব্দের বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করা হয়েছে। নামশব্দের প্রয়োগে বিষয়গত, ভাবগত কিংবা শৈলীগত যে প্রভাব পড়েছে, সেটিও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় এসেছে।

মূল শব্দ

মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন দত্ত, মহাকাব্যের ভাষা, ভাষা ব্যবহার, নামশব্দ, নামশব্দের শ্রেণি, নামশব্দের গঠন, উপমা, অনুপ্রাস।

আধুনিক যুগের প্রথম কাব্যনিদর্শন হিসেবে মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৯৭৩) *মেঘনাদবধ কাব্যের* (১৮৬১) উল্লেখ করা হয়। এই বিবেচনায় *মেঘনাদবধ কাব্যের* প্রকাশসাল থেকেই বাংলা কবিতায় আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে বলে ধরা হয়। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যু (১৭৬০) থেকে *মেঘনাদবধ কাব্যের* প্রকাশ পর্যন্ত একশ বছর তাই শেষপর্যন্ত ‘যুগসন্ধির কাল’ হয়েই থেকেছে। *মেঘনাদবধ কাব্যে* মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য থেকে বেরিয়ে আসার স্পষ্ট প্রচেষ্টা আছে। তাছাড়া কবি মধ্যযুগের পয়ারের শৃঙ্খলও ভাঙতে সচেষ্ট হয়েছেন।

মহাকাব্য রচনার আগ্রহ থেকেই মধুসূদন দত্ত *রামায়ণের* কাহিনিকে অবলম্বন করে *মেঘনাদবধ কাব্য* রচনা করেন। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য এই কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে নানাভাবে। প্রথমত, প্রচলিত আখ্যানকে তিনি ভিন্নতর দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন। এইসূত্রে পৌরাণিক চরিত্রগুলোর ভেতর দিয়ে মানবীয় অনুভব-অনুভূতিকে উপস্থাপন করার সুযোগ নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এই কাব্যের ছন্দ ও চলনভঙ্গি মধ্যযুগের কবিতা থেকে ভিন্নতর রূপ লাভ করেছে। প্রতি জোড়া চরণে যেমন অন্ত্যমিলের বাধ্যবাধকতা কবি ভেঙেছেন, তেমনি যতিচিহ্নের স্বাধীন ব্যবহারের সুযোগ নিয়েছেন। তাছাড়া শব্দপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে মধুসূদন দত্ত অলংকার ও ঝঙ্কারমণ্ডিত নতুন কাব্যভাষা নির্মাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কবির সমকালে অন্য মহাকাব্য-রচয়িতাগণও এই কাব্যভাষা অনুকরণের চেষ্টা করেছেন।

মহাকাব্যের ধারণায় এর ভাষার ধরন আলাদা করা হয়েছে এভাবে— মহাকাব্যের ভাষা হবে ওজস্বী ও গাভীর্যপূর্ণ (কুন্তল, ২০১২ : ৮৩)। সেটি বজায় রাখতে গিয়ে মধুসূদন দত্ত *মেঘনাদবধ কাব্যে* প্রচুর তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। এমনকি, সেকালের বাংলা ভাষার লিখিত বা কথ্য রূপে ব্যবহৃত হতো না, এমন অনেক শব্দও তিনি অভিধান থেকে তুলে এনেছেন। এ কারণে পরবর্তী সময়ে *মেঘনাদবধ কাব্যের* ভাষা বাংলা কি না, এই তর্ক তৈরি হয়েছে। তবে মোহিতলাল মজুমদার (১৩৫৪ : ১৫৬-১৫৮) এ ধরনের তর্ক খণ্ডন করে বলেছেন, *মেঘনাদবধ কাব্যের* ভাষা বাংলা নয়— এমন কথা একটা স্বতঃসিদ্ধকে অস্বীকার করার মতো। তাঁর মতে, *মেঘনাদবধ কাব্যের* ভাষার ফাঁকে ফাঁকে কবি খাঁটি বাংলার ভঙ্গি ধরে রেখেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি কাব্য থেকে কিছু পঙ্ক্তি তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, ভাষাগুলোই রবীন্দ্রনাথের কালে কাব্যটি জনপ্রিয় হয়।

মধুসূদনের কাছে শব্দের জাত মুখ্য ছিল না। তাঁর সামনে বাংলা মহাকাব্যের আদর্শ নমুনাও অনুপস্থিত ছিল। বিশেষত অমিত্রাক্ষর ছন্দকে অবলম্বন করায় নিজের মতো করে মহাকাব্যের ভাষা তৈরি করে নিতে হয়েছে তাঁকে। মহাকাব্যের ওজস্বীগুণ ও গাভীর্য ধরার জন্য তিনি তৎসম এবং যৌগিক শব্দের প্রচুর ব্যবহার করেছেন। অবশ্য নীলিমা ইব্রাহিম (১৯৭০ : ১০৯) আরেকটু বাড়িয়ে বলেছেন : ‘বাংলার বৈষ্ণব কবিদের

প্রেম ও অশ্রবন্যা প্রবাহের ভাষা দিয়ে তিনি তাঁর বাসব-বিজয়ী মেঘনাদের বীরত্ব কাহিনি ও অলংকার রচনা করবেন কী করে? তাই নতুন করে বাংলা ভাষায় ছন্দ, শব্দ, অলংকার ও ধ্বনিব্যঞ্জনা তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছে।' নীলিমা ইব্রাহিম স্বীকার করেছেন, এই কাব্যে অপ্রচলিত ও দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে একইসঙ্গে বলেছেন, কিছু প্রচলিত কথ্যভাষার শব্দও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : বারুই, জাঙ্গাল, পাকসাট। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন এভাবে, 'যেমন দুরূহ শব্দ সম্বন্ধেই তাঁর উদ্দেশ্যকৃত নয়, তেমনি ভাষায় গুরুচণ্ডালী দোষ স্থাপনও স্বেচ্ছাকৃত নয়। ভাবকে রূপ দেবার জন্য এ ভাষা স্বতঃই তার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।' (নীলিমা, ১৯৭০ : ১১০)

শব্দের প্রয়োগ দেখানোর জন্য শব্দের শ্রেণি আলাদা করা দরকার। উৎপত্তি অনুসারে বাংলা শব্দকে তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি এ রকম ভাগ করা যায়। গঠনগতভাবে শব্দকে মৌলিক ও সাধিত— এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আবার পদ হিসেবে ব্যবহারের ধরন হিসেবে শব্দ কয়েক শ্রেণির; যেমন— বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, ক্রিয়া, অনুসর্গ, যোজক ও আবেগ। এই আলোচনায় মূলত নামশব্দ বা বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগ অনুসন্ধান করা হয়েছে। অন্য শ্রেণির শব্দের মতো এই কাব্যে নামশব্দ বা বিশেষ্য শব্দ প্রয়োগেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। নামশব্দের গঠন এবং এর ব্যবহারের বিশেষত্ব, বৈচিত্র্য ও ভঙ্গি তুলে ধরার প্রয়াস আছে এই প্রবন্ধে।

২. শব্দ ও নামশব্দ

ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ প্রসঙ্গে বলা হয়, শব্দের অর্থ থাকে। তবে শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্কটি ঠিক সরাসরি নয়, পরোক্ষ। আমাদের মনে বিভিন্ন রকম ধারণা রয়েছে। এই ধারণাগুলোর মধ্যস্থতায় শব্দ ও বস্তু পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত হয়ে থাকে। আধুনিককালে বস্তু ও শব্দের সম্পর্ক-তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে Saussure-Gi Course in General Linguistics (১৯৫৯) গ্রন্থের 'সংকেততত্ত্বে'। এরপর এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় Ogden ও Richards-র *The Meaning of Meaning* গ্রন্থের (১৯২৩) 'সাংকেতিক ত্রিভুজে'। Saussure-র তত্ত্বে প্রতিটি শব্দ হচ্ছে একেকটি ভাষিক একক, যাতে সম্পর্কিত থাকে ধারণা ও ধ্বনিমূর্তি। তিনি ধারণা ও ধ্বনির মিলিত রূপকে বলেন সংকেত (Sign)। ধারণা বা নির্দেশিত বস্তুকে Saussure বলেন দ্যোতিত (Signified) আর ধ্বনিসমষ্টিকে বলেন দ্যোতক (Signifier)। তাঁর মতে দ্যোতক আর দ্যোতিতের মধ্যে কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই, ওই সম্পর্ক পরোক্ষ। আমাদের মানসিক অনুষঙ্গত বন্ধনই দ্যোতক ও দ্যোতিতকে সম্পর্কিত করে রাখে। (Saussure, ১৯৫৯ : ৬৫-৭০)

ভাষায় ব্যবহৃত এই দ্যোতক বা শব্দকে ব্যাকরণে নামশব্দ, গুণবাচক শব্দ, কাজশব্দ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে আলোচনা করা হয়। Lyons (১৯৬৮ : ৪০৩) শব্দের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, শব্দ হলো বিভিন্ন বস্তুর নাম। তিনি ভাষায় ব্যবহৃত সব শব্দকে দেখেছেন নাম হিসেবে। যেমন, সর্বনাম কোনো নামশব্দের প্রতিনিধিত্ব

করে, বিশেষণকে গুণবাচক নাম হিসেবে চিন্তা করা যায়, ক্রিয়া হলো কাজের নাম ইত্যাদি। হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৯ : ৩০-৩১) অবশ্য এর সমালোচনা করে বলেছেন, বিশেষ্য শ্রেণির শব্দের জন্য এই মত ভালোভাবেই কাজ করে। তবে বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রে এই নামকরণ তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা কঠিন, তবে তা অসম্ভব নয়।

মেঘনাদবধ কাব্যে নামশব্দ অনুসন্ধান করার সময়ে Lyons-র মতো সব ধরনের শব্দকে নামশব্দ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। প্রথাগত ব্যাকরণে যেসব বাংলা শব্দকে বিশেষ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে, সেগুলোই গ্রহণ করা হয়েছে। নামশব্দ মূলত নাম বোঝায়। একে ব্যাকরণে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করে দেখানো হয়। প্রসঙ্গক্রমে নামশব্দ সম্পর্কে কয়েকজন ব্যাকরণবিদের ধারণা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (২০০৮ : ৪৭) বিশেষ্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : ‘যে পদ দ্বারা ব্যক্তি, জাতি, দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া বা সমষ্টির নাম বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্য পদ বলে।’ তিনি বিশেষ্যের ছয়টি শ্রেণি নির্দেশ করেছেন— ব্যক্তিবাচক, জাতিবাচক, দ্রব্যবাচক, গুণবাচক, ক্রিয়াবাচক ও সমষ্টিবাচক।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শব্দ-রূপের বিভাজনের ক্ষেত্রে নাম-পর্যায়কে আলাদা করে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, ‘চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়-দ্বারা এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন ও অনুভূতি প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ শক্তি-দ্বারা যাহার ধারণা করা যায়, এইরূপ বস্তু, গুণ বা সত্তার উল্লেখ, নাম বা বিশেষ্য শব্দের দ্বারা হইয়া থাকে’ (১৯৯৬ : ১৯৯)। তিনি ইংরেজি ব্যাকরণ অনুসারে বিশেষ্য বা সংজ্ঞা বা নামশব্দের বিভাজন দেখিয়ে বলেছেন, বাংলায় এই ধরনের শ্রেণিভাগের বিশেষ সার্থকতা নেই। এর বদলে সুনীতিকুমার নামশব্দের বৈচিত্র্য ও গঠনে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি পুংবাচক নামের পরে প্রত্যয় যোগে স্ত্রীবাচক নামগঠনের নমুনা তুলে ধরেছেন। একইসঙ্গে বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয়ের প্রয়োগে নামশব্দের বহুবচনের রূপ দেখিয়েছেন। এই আলোচনায় অবশ্য বচনজ্ঞাপক শব্দাংশকে প্রত্যয় না বলে লগ্নক বলা হয়েছে।

বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে বিশেষ্য শব্দ সম্পর্কে বলা হয়েছে : কোনো ব্যক্তি, স্থান, দ্রব্যসামগ্রী, গুণ বা অবস্থার নাম বিশেষ্য শব্দশ্রেণির মধ্যে পড়ে। বিশেষ্যের রূপ বোঝাতে লেখা হয়েছে : যাতে -র/-এর বা -গুলি/-গুলো বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং যা কর্তা/উদ্দেশ্য বা কর্ম হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে তা-ই বিশেষ্য। বিশেষ্য শব্দের লিঙ্গভেদ সম্পর্কে বলা হয়েছে : বাংলায় সংস্কৃত ঋণশব্দে বিশেষ্য ও অল্পস্বল্প বিশেষণ শব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গ রূপ পাওয়া যায় (মাহবুবুল, ২০১২ : ১৬৬)। বাংলা একাডেমির ব্যাকরণে বিশেষ্য শব্দের প্রাথমিক শ্রেণি হিসেবে দুটি ভাগ দেখানো হয়েছে : সংজ্ঞা বিশেষ্য ও সাধারণ বিশেষ্য। সাধারণ বিশেষ্যের আবার কয়েকটি ভাগ দেখানো হয়েছে। ভাগগুলো করা হয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা (মূর্ত বিশেষ্য ও

ভাব বিশেষ্য), গণনযোগ্যতা (গণন বিশেষ্য, পরিমাপ বিশেষ্য ও সমষ্টি বিশেষ্য) এবং সজীবতা (সজীব বিশেষ্য ও অজীব বিশেষ্য) অনুসারে।

বিদেশি বাংলাভাষীদের কাছে নামশব্দের শ্রেণিকরণে বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন : হানা রুথ টমসন (২০২১ : ৮২) বিশেষ্যকে শ্রেণিকরণ করেছেন এভাবে : সংখ্যা (একবচন-বহুবচন), জীব (সজীব-অজীব), নির্দিষ্টতা (নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট), মর্যাদা (মানী-সাধারণ), গণনা (গণন-অগণন), কারক (কর্তা, কর্ম, সম্বন্ধ, অধিকরণ)।

নামশব্দের নানা শ্রেণি থাকলেও এই প্রবন্ধে সেগুলোকে প্রধানরূপে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। বরং নামশব্দের ব্যবহার-বৈচিত্র্য মেঘনাদবধ কাব্যের কাব্যভাষায় কতটুকু প্রভাব ফেলেছে সেটি দেখা হয়েছে।

৩. মেঘনাদবধ কাব্যে নামশব্দের প্রয়োগ

মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে নামশব্দের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ ঘটেছে। এর গঠন যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি অর্থপ্রকাশেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। কাব্যের বিশালতার কারণে নানা শ্রেণির নামশব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। গঠনগতভাবে একক নামশব্দের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে যৌগিক নামশব্দের প্রয়োগ আছে। এছাড়া নামবাচক শব্দের সঙ্গে লিঙ্গ ও বচন প্রকাশক শব্দের প্রয়োগেও বৈচিত্র্য দেখা যায়।

নামশব্দের প্রয়োগ ছাড়া উপমার কাজটি হয় না। সাধারণত একটি নামশব্দকে আরেকটি ভিন্নজাতীয় নামশব্দ দিয়ে উপমিত করা হয়। আবার অনুপ্রাস তৈরির জন্য কবি উপযুক্ত নামশব্দ গ্রহণ করে থাকেন। তাছাড়া কবিতায় চরণের মাত্রা ঠিক রাখার জন্যও প্রতিশব্দ থেকে উপযুক্ত নামশব্দটি গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

মধুসূদন দত্তের নামশব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য ও ধরন আলোচনার জন্য যেসব নমুনা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো আলোচ্য মহাকাব্যের প্রথম সর্গ থেকে গৃহীত। উদাহরণ সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য (২০০১) গ্রন্থটি।

৩.১ শ্রেণি অনুযায়ী নামশব্দ

বিভিন্ন ধরনের নামশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে মেঘনাদবধ কাব্যে। নিচে শ্রেণি অনুযায়ী কিছু প্রয়োগ-উদাহরণ দেওয়া হলো :

সংজ্ঞাবাচক নামশব্দ : এর মধ্যে পড়ে ব্যক্তি, স্থান, দেশ, কাল, সৃষ্টি ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট নাম। যেমন : উত্তর, গরুড়, গোকুল, চিত্রাঙ্গদা, দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব, বিভীষণ, বীরবাহু, মেঘনাদ, রাবণ, রাম, লঙ্কা, সজার, সারণ, হস্তিনা, হিড়িম্বা

জাতিবাচক নামশব্দ : এ ধরনের নামশব্দ নির্দিষ্ট কোনো নামকে না বুঝিয়ে প্রাণী ও অপ্রাণীর সাধারণ নামকে বোঝায়। যেমন : কানন, কুক্কুর, ঘোড়া, নর, বীর, পাখি, রাক্ষস

বস্তুবাচক নামশব্দ : কোনো বস্তু বা দ্রব্যের নামকে বস্তুবাচক নামশব্দ বলা যায়। যেমন : জল, ত্রিশূল, পল্লব, বীণা, মালা, মেঘ

সমষ্টিবাচক নামশব্দ : এ ধরনের নামশব্দ দিয়ে ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন : অস্ত্রীদল, পিশাচদল, ব্যাধ-দল, যন্ত্রদল, যন্ত্রীদল

ভাববাচক নামশব্দ : যে নামশব্দ দিয়ে কোনো কাজের নাম বোঝায় তাকে ভাববাচক নামশব্দ বলে। যেমন : আক্ষেপ, আঘাত, পীড়ন, বাস, বাসনা, যাতনা

গুণবাচক নামশব্দ : গুণগত অবস্থা ও ধারণার নামকে গুণবাচক নামশব্দ বলে। যেমন : চৌর্য, মহিমা

৩.২ গঠন অনুযায়ী নামশব্দ

মেঘনাদবধ কাব্যে নামশব্দের গঠনেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রথমত নামশব্দকে একক ও যৌগিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

একক নামশব্দ : এ ধরনের নামশব্দ প্রথাগত ব্যাকরণে মৌলিক শব্দ হিসেবে পরিচিত। এই কাব্যে প্রচুর পরিমাণে নামশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলো বাংলা ভাষায় একক শব্দ হিসেবে পরিচিত। যেমন : আঁখি, চামর, জগত, জননী, দাস, দেবি, ধরা, নয়ন, পিতা, বজ্র, মা, মেঘ, শস্য, স্ফটিক।

যৌগিক নামশব্দ : একাধিক শব্দ মিলে যৌগিক নামশব্দ তৈরি হয়। মেঘনাদবধ কাব্যে এ ধরনের যৌগিক নামশব্দের ব্যবহার হয়েছে প্রচুর। যেমন : অমাত্য-প্রধান, অশ্রুধারা, ইন্দ্রপ্রস্থ, কনক-আসন, কাকলী-লহরী, ক্রৌঞ্চবধু, চিশু-ফুলবন-মধু, জন্মভূমি-রক্ষা, নরকুল, নরাধম, পদছায়া, বজ্র-আঘাত, বাঁশরীস্বরলহরী, বিশ্বরম, ভবমণ্ডল, ভূতল, মানস-সরস, যমপুর, সভাতল, সম্মুখ-সমর, রক্ষঃ-দল-পতি, রোদন-নিদাদ, সুচন্দন-বৃক্ষশোভা, সেনাপতি-পদ, স্বর্ণ-চূড়-রথ, স্বর্ণ-ছাদ, লঙ্কা-অধিপতি, হরকোপানল। এসব উদাহরণে দেখা যায়, একাধিক নামশব্দ এক হয়ে একটি যৌগিক নামশব্দ গঠন করেছে, আবার নামশব্দের আগে গুণবাচক শব্দ যোগ হয়েও যৌগিক নামশব্দ গঠিত হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য মধুসূদনের কাব্যভাষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ রকম যৌগিক নামশব্দের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, ‘কাব্যভাষাকে ঘনপিনদ্ধ সংবদ্ধতায় বেঁধে দেয় বিশেষ্যবাচক রীতি নানা দৈর্ঘ্যের সমাসের বিপুল আয়োজন ঘটিয়ে।’ (শ্যামাপ্রসাদ, ১৯৯১ : ২২৯)

প্রত্যয় ও উপসর্গ যোগ করেও নামশব্দ গঠিত হয়। প্রত্যয়, উপসর্গ (এমনকি সমাস)-যোগে গঠিত শব্দকে ব্যাকরণে সাধিত শব্দ বলে। সাধিত নামশব্দগুলো প্রায়শ একক নামশব্দের মতো আচরণ করে। উপসর্গযোগে গঠিত নামশব্দের নমুনা : আকৃতি, দুর্বীর, নিদাঘ, নীরব, প্রহার, বিগ্রহ, বিবাদ, বিষাদ, সংগ্রাম। দেখা যাচ্ছে শব্দের শুরুতে আ-, দূর-, নি-, প্র-, বি-, সম্ ইত্যাদি উপসর্গের প্রয়োগে নতুন নামশব্দ তৈরি হয়েছে। আবার প্রত্যয়যোগে গঠিত নামশব্দের নমুনা : চৌর্য, দৌবারিক, পুরী, বলী, বীরতা, বৈদেহী, মহিমা, যজ্ঞী, রথী, লীলাস্থলী। নামশব্দ ও ধাতুর পরে -তা, -য, -ইক, -ইমা (ইমন), -ঈ ইত্যাদি প্রত্যয়ের ব্যবহারে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে।

৩.৩ স্ত্রী নির্দেশক নামশব্দ

সাধারণত প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক নামশব্দগুলো তৈরি করা হয়। মেঘনাদবধ কাব্যে ব্যবহৃত স্ত্রীবাচক নামশব্দের উদাহরণ :

আ : চন্দ্রাননা, চারুনৈত্রী

ইনী : কাস্তালিনী

ঈ : কিষ্করী, দয়াময়ী, দেবী, বারুণী, মধুকরী
বতী : ভাগ্যবতী

৩.৪ বহুবচন নির্দেশক নামশব্দ

নামশব্দের আগে-পরে বহুবচন প্রকাশক শব্দ বা শব্দাংশের প্রয়োগ আছে। উদাহরণ :

আবলী : দীপাবলী
কুল : কমলকুল, ফুলকুল, বায়ুকুল, রাক্ষসকুল, রিপুকুল, শিলাকুল
চয় : তরঙ্গচয়
জন : সভাজন
দল : বামাদল, বৈরীদল, ব্যাধদল, ভ্রমরদল, মেঘদল, সঙ্গীদল
নিকর : রাক্ষসনিকর
নিচয় : তরঙ্গনিচয়
বৃন্দ : বালিবৃন্দ, রিপুবৃন্দ
মণ্ডল : নক্ষত্র-মণ্ডল, আকাশ মণ্ডল
যুথ : বারণযুথ
রাজি : তরঙ্গরাজি, বাজিরাজি, রত্নরাজি
শ্রেণি : মেঘশ্রেণি

এছাড়া নামশব্দ বা গুণবাচক শব্দের দুইবার প্রয়োগেও বহুবচন প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন : শত শত তেজস্কর, শত শত পাত্রমিত্র, স্তম্ভ সারি সারি। বহুবচন প্রকাশক লগ্নক বা শব্দাংশগুলো কেবল সংখ্যার আধিক্য বোঝায়নি, ব্যাপ্তি ও বিশালতা বোঝাতেও ব্যবহার হয়েছে (যেমন, আকাশ মণ্ডল)।

৩.৫ নামশব্দে বিভক্তির ব্যবহার

বাক্যের মধ্যে অন্য শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝাতে নামশব্দের সঙ্গে অর্থহীন যেসব লগ্নক যুক্ত হয় তাদেরকে বিভক্তি বলে। বিভক্তির সঙ্গে কারকের সম্পর্ক রয়েছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতিতে (২০২০) বিভক্তিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে দেখিয়েছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে নামশব্দের সঙ্গে তিন ধরনের বিভক্তিরই প্রয়োগ দেখা যায়।

-এ, -তে, -য়, -য়ে বিভক্তি : সাধারণত ক্রিয়ার স্থান, কাল, ভাব বোঝাতে -এ, -এ, -তে, -য়, -য়ে বিভক্তির ব্যবহার হয়। যেমন : কনক-আসনে (কনক-আসনে বসে : অধিকরণে -এ), চারুলঙ্কে (রে চারুলঙ্কে : সম্বোধনে -এ), দাসে (এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে : অনুসর্গের বদলে -এ), ধুলায় (ধূসরিত ধুলায় : করণে -য়), বরদে (হে বরদে : সম্বোধনে -এ), বিশ্বরমে (ঊর দয়াময়ী বিশ্বরমে : অধিকরণে -এ), ভূতলে (ভূতলে অতুল সভা : অধিকরণে -এ), সম্মুখ-সমরে (সম্মুখ-সমরে পড়ি : কর্মে -এ), সেনাপতি-পদে (কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে : কর্মে -এ)। বাংলা প্রমিত গদ্যে কর্তায় বিভক্তির প্রয়োগ সাধারণত হয় না। তবে মেঘনাদবধ কাব্যে কর্তায়ও বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন : দিননাথে (ঘন আবরিলে দিননাথে : কর্তায় -এ), রাক্ষসে (রক্ষা করিল রাক্ষসে : কর্তায় -এ)। -কে, -রে বিভক্তি : গৌণকর্মের সঙ্গে সাধারণ -কে এবং -রে বিভক্তি বসে। যেমন : দাসেরে (দাসেরে, আসি, দয়া কর : কর্মে -রে), ধরারে (ধরেন আদরে ধরাও : কর্মে -রে)।

-র, -এর, -য়ের বিভক্তি : পরের শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ বোঝাতে আগের শব্দের সঙ্গে -র, -এর এবং -য়ের বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : জননীর (জননীর স্নেহ), বাল্মীকির (বাল্মীকির রসনায়)। এক্ষেত্রে আগের ও পরের দুটি শব্দই নামশব্দ হয়। কর্মপদের সাথেও -র, -এর, -য়ের বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন : সন্তানের (সন্তানের মাঝে : কর্মে -এর), সুতের (সুতের নিধন : কর্মে-র)।

৩.৬ পৌরাণিক নামশব্দ

রামায়ণকে অবলম্বন করায় মেঘনাদবধ কাব্যে পৌরাণিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। এর মধ্যে আছে : চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, বীরবাহু, মন্দোদরী, মেঘনাদ, রাবণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রমুখ। প্রায় ক্ষেত্রেই মধুসূদন দত্ত এক চরিত্রের জন্য একাধিক নামশব্দ ব্যবহার করেছেন। এসব নামশব্দ অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রের বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

একই নামশব্দের একাধিক রূপে ব্যবহারের নমুনা :

মেঘনাদ	: ইন্দ্রজিৎ, দশাননাত্মজ, বাসবত্রাস
রাবণ	: দশানন, দাশরথি-অরি, নিকষানন্দন, নৈকষেয়, রাক্ষসপতি, রাঘবারি, লঙ্কাপতি
রাম	: দশরথাত্মজ, দাশরথি, রঘুপতি, সীতাপতি
লক্ষ্মণ	: উর্মিলাবিলাসী
শিব	: উমাপতি, রুদ্রেশ্বর, শূলপাণি, শূলী, শম্ভু
সীতা	: জানকী, বৈদেহী

৩.৭ নামশব্দের মাধ্যমে গুণ ও মর্যাদার প্রকাশ

মেঘনাদবধ কাব্যে ব্যক্তির মহত্ত্ব ও বিশালতা বোঝাতে যেমন নামশব্দ তৈরি করা হয়েছে, তেমনি ব্যক্তির নীচতা বা সংকীর্ণতা কিংবা অন্যান্য ধরন বোঝাতে বিচিত্র ধরনের নামশব্দ তৈরি করা হয়েছে। নামশব্দ অনেক ক্ষেত্রেই গুণ ও মর্যাদার প্রকাশক হিসেবে কাজ করেছে। যেমন: পাষণ্ড-শিবির-দ্বার (পাণ্ডব-শিবির-দ্বারে রুদ্রেশ্বর), বীর-চূড়ামণি (বীর-চূড়ামণি বীরবাহু), ভগ্নদূত (দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত), রক্ষণচূড়ামণি (যাও তুমি তুরা করি ... রক্ষণচূড়ামণি), রাক্ষসকুলশেখর (রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে), শৃঙ্গবর (হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা)।

৩.৮ উপমায় নামশব্দের প্রয়োগ

সৈয়দ আলী আহসানের (১৯৭৬ : ৯৯) মতে, ‘চরিত্রনির্মাণে পরিপূর্ণতা প্রতিষ্ঠার জন্য কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপমার ক্রমপ্রসার এবং অবিরল ব্যঞ্জনার সুযোগ নিয়ে থাকেন।’ তিনি উদাহরণসহ দীর্ঘ আলোচনা করে দেখিয়েছেন, মেঘনাদবধ কাব্যে অবিরল ধারায় উপমার প্রয়োগ ঘটেছে। তিনি আরো বলেন, ‘হোমারে’র অনুকরণে মধুসূদন তাঁর মহাকাব্যে প্রচুর পরিমাণে গতিময় উপমা নির্মাণ করেছেন। শুধু প্রকৃতির দিক থেকেই সহধর্মী নয়, বিষয় বা উপদেশের দিক থেকে উভয়ের উপমা এক জাতীয়। হোমারের কাব্যে ‘সিংহ’ এবং ‘অগ্নি’র উপমা এসেছে অনবরত। মধুসূদন ‘হোমারে’র অনুকরণে বহুবার এ দুটি নামশব্দের উপমা ব্যবহার করেছেন (১৯৭৬ : ১০৮-১০৯)। উদাহরণ :

(ক) অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যাক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লক্ষ্য দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে!

(খ) শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরকামিনী -
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসম!

মূলত কাহিনির সূত্র ধরে এবং চরিত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগে কবি এসব উপমা প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছেন। উপমায় ভিন্ন জাতীয় নামশব্দের মধ্যে তুলনার ব্যাপারটি ঘটে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তুলনা রূপকের রূপ লাভ করেছে। উপমা ও রূপকের উদাহরণ : কালতরঙ্গ (কালকে তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে), মৃণালভুজ (কিঙ্করীর হাতকে মৃণালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে), চন্দ্রাননা (কিঙ্করীর মুখকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে), রজত-প্রাচীর (সাগরকে রূপার প্রাচীরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে), পদ্মাসন (রসনাকে পদ্মাসনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে)।

৩.৭ নামশব্দকে ভিন্ন পদ হিসেবে ব্যবহার

মেঘনাদবধ কাব্যে নামশব্দকে গুণবাচক শব্দ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : অংশুমালী (দিনমণি যেন অংশুমালী), চারুনেত্রী (উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রী দেবী চিত্রাঙ্গদা), মকরালয় (দেখিলেন দূরে সাগর - মকরালয়)।

নামশব্দ ও কাজশব্দের সমন্বয়ে মিশ্র ক্রিয়া তৈরি হয়। এ ধরনের মিশ্রক্রিয়াও মধুসূদনের হাতে নতুন রূপ লাভ করেছে। সেক্ষেত্রে নামশব্দটি সরাসরি কাজশব্দের রূপ লাভ করেছে। যেমন : আরম্ভিলা (আরম্ভ করিল), উত্তরিলি (উত্তর করিল), পশি (প্রবেশ করিয়া), প্রহারয়ে (প্রহার করিয়া), বিলাপিলা (বিলাপ করিল), যুঝিলা (যুদ্ধ করিল), স্মরিয়া (স্মরণ করিয়া)।

৪. নামশব্দ ব্যবহারে বিবেচনা

নামশব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধুসূদন দণ্ডকে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়েছে। এর মধ্যে আছে মাত্রা সমন্বয় ও অনুপ্রাস তৈরি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রে মাত্রা বলতে বোঝানো হয় প্রতি লাইনে ব্যবহৃত অক্ষর বা বর্ণ সংখ্যা। আর অনুপ্রাস বলতে বোঝানো হয় একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি।

৪.১ মাত্রা সমন্বয়

চৌদ্দ মাত্রার পঙক্তি তৈরি করতে গিয়ে মধুসূদন দণ্ড প্রয়োজন অনুযায়ী নামশব্দের ছোটো বা বড়ো রূপটি গ্রহণ করেছেন। যেমন : ‘সরোবর’ শব্দের বদলে ‘সরস’ (তাঁহে শোভে রত্নরাজি মানস-সরসে)। আবার মাত্রা সমন্বয়ের প্রয়োজনে পছন্দসই প্রতিশব্দও গ্রহণ করেছেন। যেমন :

আকাশ : অত্র, অম্বর, গগন

গাছ : তরু, বৃক্ষ

ঘোড়া : অশ্ব, তুরঙ্গম, বাজি

চাঁদ : ইন্দু, কুমুদরঞ্জন, চন্দ্র, রজনীনাথ, শশাঙ্ক, শশী

পদ্ম : কমল, কুমুদ, পঙ্কজ

পানি : অম্বু, জল, নীর, বারি

পাহাড় : অচল, ভূধর, শৃঙ্গধর

বাতাস : অনিল, পবন, প্রভঞ্জন, বায়ু

রাত : নিশা, রজনী

সাগর : অর্ণব, জলদলপতি, জলধি, নীলাম্বুস্বামী, প্রচেতঃ, বারীশ, মকরালয়, রত্নাকর, সমুদ্র, সিদ্ধ

সাপ : অহি, ককোদর, ফণী, বিষধর, ভূজগ

সূর্য : অংশুমালী, রবি, দিননাথ, দিনমণি

সোনা : কনক, স্বর্ণ

হাতি : করভ, কুঞ্জর, গজ, বারণ, যুথনাথ, হস্তি

মাত্রা ঠিক রাখতে মধুসূদন দত্ত শব্দের কোমল রূপও গ্রহণ করেছেন। যেমন : ‘প্রাণ’ শব্দের বদলে ‘পরান’ (জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরান), ‘বর্ষা’ শব্দের বদলে ‘বরিষা’ (শ্রোত-পথে জল যথা বরিষার কালে), ‘বার্তা’ শব্দের বদলে ‘বারতা’ (নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা), ‘মুক্তা’ শব্দের বদলে ‘মুকুতা’ (ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা), ‘মূর্তি’ শব্দের বদলে ‘মুরতি’ (ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মুরতি), ‘যোদ্ধা’ শব্দের বদলে ‘যোধ’ (আর যোধ যত), ‘রত্ন’ শব্দের বদলে রতন (যথা বিবিধ রতন খচিত)।

৪.২ অনুপ্রাস তৈরি

অনুপ্রাস তৈরির ব্যাপারটি পুনঃপুন ঘটেছে এই কাব্যে। এর বিশেষ কার্যকারণ রয়েছে। নতুন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গে গদ্যভাষার মিল দেখা যায়। সম্ভবত মধুসূদন গদ্যভাষা থেকে কাব্যভাষাকে আলাদা করার জন্য বারংবার অনুপ্রাসের সংযোজন ঘটিয়েছেন। নামশব্দের প্রভাবে তৈরি হওয়া অনুপ্রাসের উদাহরণ : আসন (কনক-আসনে বসে দশানন বলী), গন্ধ (মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি), ঝালর (ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা), ধরা (ধরেন আদরে ধরারে), নর (নরাধম আছিল যে নর নরকুলে), ভূতল (ভূতলে অতুল সভা), যন্ত্রী (পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে)। স্পষ্টত, নামশব্দের মাধ্যমে যমক অলংকারও তৈরি হয়েছে।

৫. উপসংহার

মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্যে শব্দপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে কাব্যভাষায় একটি ধ্রুপদী পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সংস্কৃত যেহেতু ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে গণ্য, সেহেতু এই কাব্যে প্রচুর সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে কাজটি করা হয়েছে। নামশব্দের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে বেশি ঘটেছে। তাছাড়া মধুসূদন দত্ত বাংলা মহাকাব্যের জন্য একটি ভাষারীতি তৈরি করতে চেয়েছেন। পরবর্তী সময়ে অন্য কবিদের দ্বারা রচিত

বাংলা মহাকাব্যে এই ভাষারীতির প্রভাব দেখা যায়। কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাপারেও কবির দোলাচল ছিল। তিনি অর্থালংকার ও শব্দালংকারের সমাবেশ ঘটিয়ে এই স্লথগতির ছন্দে গতি এনেছেন। ভাবপ্রকাশ ও মাত্রা-সমন্বয় বিবেচনায় থাকায় কাব্যে ব্যবহৃত নামশব্দগুলো বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ পেয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

- কুন্তল চট্টোপাধ্যায়। (২০১২)। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। রত্নাবলী, কলকাতা।
- নীলিমা ইব্রাহিম। (১৯৭০)। *বাংলার কবি মধুসূদন*। নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা
- মাহবুবুল হক। (২০১২)। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার সম্পাদিত)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। (২০০৮)। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
- মোহিতলাল মজুমদার। (১৩৫৪) *কবি শ্রীমধুসূদন*। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা।
- শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। (১৯৯১)। *কবিতার ভাষা ও মধুসূদন*। লিঙ্গুইস্টিক রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা।
- সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। (২০০১)। *মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য*। মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা।
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। (১৯৯৬)। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।
- সৈয়দ আলী আহসান। (১৯৭৬)। *মধুসূদন : কবি-কৃতি ও কাব্যাদর্শ*। মুক্তধারা, ঢাকা।
- স্বরোচিষ সরকার ও অন্যান্য। (২০২০)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিত*। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
- হানা রুথ টমসন। (২০২১)। *বাংলা ভাষার বর্ণনা : একটি বিকল্প ব্যাকরণ* (স্বরোচিষ সরকার অনূদিত)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- হুমায়ুন আজাদ। (১৯৯৯)। *অর্থবিজ্ঞান*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
- Lyons, John. (1968). *Introduction to Theoretical Linguistics*. Cambridge University Press, New York.
- Saussure, Ferdinand De. (1959). *Course in General Linguistics*. New York : Philosophical Library
- Ogden, C. K. & Richards, I. A. (1923). *The Meaning of Meaning*. A Harvest Book, New York.

মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ

সাহিত্যিক

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬ ব. ৥ ১৯৫৯ খ্রি.

ru.ac.bd/bangle/bangle-journal-shahittyki

Print : ISSN 1994-4888

বর্ষ : ৬৬ সংখ্যা : ৫৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ ৥ মে ২০২৫

প্রকাশকাল : মে ২০২৫

প্রবন্ধ জমা : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রবন্ধ গৃহীত : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পৃষ্ঠা : ২১-৪০

রাজিয়া খানের উপন্যাস : সমাজ-অস্বীকৃত প্রেম ও স্বাভাবিক জীবনবোধের বয়ান মনোরমা ইসলাম

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

ই মেইল : monoramaislam22@gmail.com

সারসংক্ষেপ

সাহিত্য ও সমাজে প্রেমের মাহাত্ম্য ও প্রেরণা অনস্বীকার্য। সমাজ-নিয়মশাসিত প্রেম-অপ্রেম বা বাধা-নিষেধ সাহিত্যে সহজাতভাবেই অন্তর্লীন থাকে। প্রথাগত বিধিনিষেধের বাইরে যা-কিছু ঘটে তা সাধারণত সমাজ-অস্বীকৃত! সেইসব অস্বীকৃত প্রেমের বয়ান রয়েছে রাজিয়া খানের উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসের প্রধান অনুষঙ্গ-নারী ও পুরুষের প্রেম ও তাদের মধ্যকার নানামাত্রিক সম্পর্ক। সমাজে বসবাসরত তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো নানা ঘটনার শিকার এবং নানাভাবে অস্বীকৃত প্রেমের কুশীলব। এই অস্বীকৃত প্রেমকে রাজিয়া খান তাঁর রচনায় কীভাবে উন্মোচন করেছেন এবং কতোটা সফল হয়েছেন- এসব অনুসন্ধান করা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মূল শব্দ

রাজিয়া খান, উপন্যাস, সমাজ, প্রেম, জীবনবোধ।

রাজিয়া খান (১৯৩৬-২০১১) প্রগতিশীল বাংলাদেশি বাঙালি সাহিত্যিক। তাঁর রচিত উপন্যাস সাতটি। সাতটি উপন্যাস যথাক্রমে : *বটতলার উপন্যাস* (১৯৫৮), *অনুকল্প* (১৯৫৯), *প্রতিচ্ছিন্ন* (১৯৭৬), *চিত্রকাব্য* (১৯৮০), *হে মহাজীবন* (১৯৮৩), *দ্রৌপদী* (১৯৯৩), *পাদবিক* (১৯৯৮)। উপন্যাসের অষ্টটি হিসেবে বরাবর সময়-সমাজ-সমকাল-ইতিহাসই প্রাধান্য পায়। কিন্তু এই সময়-সমাজ-সমকাল-উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নেয় 'ব্যক্তি'। ব্যক্তি ও সমাজ তাই একে অন্যের পরিপূরক। ব্যক্তি ছাড়া সমাজ হয় না, আবার ব্যক্তি সমাজবিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতে পারে না। সমাজে বাস করতে সমাজের নীতি মেনে চলাটা এক রকম দায়বদ্ধতার কাতারে পড়ে। যদিও এক সমাজের নীতিবোধ যা বিপজ্জনক রকমে সংক্রামক, অস্বীকৃত এবং বর্জনীয়— অন্য সমাজ তাকেই শ্রেষ্ঠ কীর্তির মুকুট পরিয়েছে। তাই সমাজ নির্ধারিত নৈতিকতার বিষয়গুলো বেজ্ঞানিক বিষয় কিংবা গাণিতিক সূত্র দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এজন্য জি. ই. ম্যুর নীতিদর্শনের জগতে মতভিন্নতার সমস্যা ও অতীতের নীতিদার্শনিকদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

If appears to me that in ethics, as in all other philosophical studies, the difficulties and disagreements, of which its history is full, are mainly due to a very simple cause: namely to the attempt to answer questions, without first discovering precisely what question it is which you desire to answer. (Moore, 1876 : 'ভূমিকা')

অন্যদিকে, সফিস্ট সম্প্রদায়ের দার্শনিক প্রটাগোরাসের দর্শনের মূলকথা হলো মানুষই সব কিছু বিচারের মানদণ্ড। ফলে সমাজে বসবাসরত প্রত্যেক ব্যক্তি তার মধ্যে দুইজন মানুষকে ধারণ করে। একদিকে সে সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিকতার সাথে তাল মিলিয়ে চলে অন্যদিকে আবেগ-অনুভূতি, প্রেম, রাগ-অভিমানে বশবর্তী হয়ে সমাজশৃঙ্খল ভেঙে সকল দায় এড়িয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চায়। এই দুই সত্তার সমন্বয় ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে কখনো কখনো মানুষ সমাজ অস্বীকৃত কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ প্রেম। সমাজের প্রচলিত নিয়মের বাইরে ব্যক্তি জীবনে প্রেম আসে, কিন্তু সমাজে তা সহজে গৃহীত হয় না।

বিশ্বের সমস্ত কথাসাহিত্য ধারার মতো বাংলা কথাসাহিত্যের পদসম্ভার পর্বেও দেখা যায়, তার জন্মের মূলে যেমন ছিলো নরনারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবি ও প্রত্যক্ষ নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ-ব্যবস্থা, তেমন ছিলো অবৈধ প্রেম। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের বিশেষ কালচেতনায় ও প্রতিবেশ প্রভাবে অবৈধ প্রেমের অন্য স্বরূপকে উদ্ঘাটন করেন, তাঁর *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *বিশ্ববৃক্ষ* (১৮৭৩), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮)র মতো উপন্যাসসমূহে। এইসব উপন্যাসে প্রেমের নতুন স্বাদ এবং সেই সঙ্গে অভিনব শৈল্পিক পরীক্ষা, তার মানবিক প্রতিবেদন, নীতি-নিয়মের সূক্ষ্ম পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেম- বক্তব্যকে সম্পূর্ণ নতুন

আধারে ভিন্নস্বাদী আধেয়রূপে সৃষ্টি করেন। প্রেমকে তিনি পরিবেশন করেন *চোখের বালি* (১৯০৩), *ঘরে বাইরে* (১৯১৬), *শেষের কবিতা* (১৯২৮), *দুইবোন* (১৯৩৩), *চার অধ্যায়* (১৯৩৪), *মালঞ্চ* (১৯৩৪) সহ একাধিক গল্পে। এসব কাহিনিতে প্রণয়কে স্থান দিতে গিয়ে তাঁরাও হয়তো উদ্বেগ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ প্রেমের সঙ্গে এখানে যেমন আছে মনোরম অনুভূতি তেমন যুক্ত হয়েছে জীবনের মূল্যবোধের ভঙ্গুরতা, অবক্ষয়িত সমাজ-বাস্তবতা, ব্যক্তিক সংশয়-সঙ্কট, হতাশাবোধ, বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতা, আবার এসবের বিপরীত প্রান্তের পরিপূর্ণ, আশ্বস্ততা, প্রত্যয়-প্রতিশ্রুতি, জীবননিষ্ঠ মানবিক বোধের সম্যক অভিনন্দন। পক্ষান্তরে এসবই বাংলা সাহিত্যের কথাকারদের হাতে নানাভাবে রূপ পেয়েছে। এক একজন লেখক প্রেমকে প্রিজমিক প্রবণতায় ধরবার চেষ্টা করেছেন। কখনো প্রাচীন আদর্শে, কখনো আদর্শহীনতায়, কখনো হতাশায়, কখনো জীবননিষ্ঠায়, কখনো পবিত্রতায়, কখনো দেহ-বিকারে। কল্লোলের লেখকরাও প্রেমকে বৈচিত্র্য দেওয়ার প্রয়াস করেছেন, আবার কল্লোল-পরবর্তী লেখকগণ প্রেমের সাথে জীবনের জটিল অভিনব স্রোত সংযোজন করেছেন। সুতরাং উপন্যাসের নানা বিচিত্র শাখাতে অবৈধ প্রেম কোনো-না-কোনোভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা কথাসাহিত্যে প্রেমের নানা রূপ ও ব্যাখ্যার উপস্থিতি পাওয়া যায়। বর্ণনার অভিনবত্বে প্রেমের স্বরূপ কখনো হয়— প্লেটনিক, কখনোবা দেহ-সর্বস্ব আবার কখনো বৈধ কিংবা অবৈধ। বিবাহিত প্রেমই বৈধ আর অন্য প্রেম অবৈধ হতে পারে জাতিভেদের কারণে, চরম রক্ষণশীলতার ধারণায়, প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে একজন বিবাহিত কিংবা দুইজনই বিবাহিত, প্রেমিকা বিধবা বা পতিতা ইত্যাদি রকমের। এসব প্রেমে হয়তো থাকে শ্রেণিচেতনার বিরোধ ও সংঘর্ষ, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, আত্মিক সংকট, সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, বিকৃতি ও অবক্ষয়, আবার থাকতে পারে ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারিত রূপও। কার্যত, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। শিল্পীর দায় থেকে এইসব সমাজ অস্বীকৃত প্রেমকে ঘিরে ব্যক্তি-স্বরূপ অন্বেষণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনবোধের সন্ধান করেছেন বাংলাদেশের কথাসাহিত্যী রাজিয়া খানও। তাঁর রচিত উল্লেখ্য সাতটি উপন্যাসেই রাজিয়া খান সমাজ অস্বীকৃত প্রেম ও স্বাভাবিক জীবনবোধের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যা অনুসন্ধান করাই এ-প্রবন্ধের অশিষ্ট।

২

রাজিয়া খান তার ‘বটতলার উপন্যাস’-এ প্রেমের বয়ান করতে গিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দুই নর-নারীকে একত্রিত করেছেন। উপন্যাসের মূল দুই চরিত্র— মঈন মুসলিম আর সুমিতা সনাতন ধর্মাবলম্বী। এ দুইজনই তাদের ভেতরের দ্বিসত্তার জটিল আবর্তে ঘুরতে থাকে— যা উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতার সাথে মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে উপস্থাপিত। কখনো কখনো তা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত। উপন্যাসে কাহিনি বর্ণনায়,

তাদের প্রেমের সূত্রপাত দেশবিভাগের আগে এবং সম্পর্কের জটিলতা সৃষ্টি দেশবিভাগের পরে। কারণ, মঙ্গল ও সুমিতার গভীর মানসিক সংযোগ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক ও ধর্মীয় ভিন্নতা তাদের একত্রিত হতে দেয় না। দুই দেশের মধ্যে সীমানা টানা বা ধর্মীয় বিভাজনের দ্বারা হৃদয়ের আবেগ নিয়ন্ত্রিত না হলেও সমাজসৃষ্টি নিয়মের সীমা লঙ্ঘন করতে পারে না। শতাব্দী ধরে বাংলার দুই প্রধান ধর্ম সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করার পর ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশ বিভাজন আর উপন্যাসটির রচনাকাল খেয়াল করলে বিষয়টি আরোও স্পষ্ট হয়। ইতিহাসেও ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে গভীর প্রণয়ের মিলন প্রতিহিংসার কারণ হতে দেখা গেছে। আলাউদ্দিন ও পদ্মিনীর প্রণয় কাহিনি সমাজ মানতে পারেনি বলে হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিলো। (ওয়াকিল, ১৯৯৭ : ৪১৪-৪১৫) এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’র জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার প্রেম সাহিত্যে সমাদর পেলেও সাম্প্রদায়িকতার কারণে সামাজিক স্বীকৃতি পাবে না এই কথা ভেবেই আয়েষা সারাজীবন অতৃপ্ত প্রেমের জ্বালায় জ্বলতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে সমাজের নৈতিক সুরক্ষা বজায় রেখেছিলেন। এই সমাজের কথা ভেবে রাজিয়া খানের সৃষ্ট সুমিতা ও মঙ্গল চরিত্রদ্বয়ও বরাবর সচেতনভাবে নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছে। স্বদেশ উন্মূলিত মঙ্গল উপমহাদেশের জটিল সমাজ-রাজনৈতিক ঘটনার শিকার। দেশভাগজনিত সংকটে ধর্মীয়চেতনা এবং সমাজচেতনার পার্থক্য এই যুগলের ব্যক্তিজীবন, প্রেমজীবন ও পারিবারিক জীবনকে জটিল ও বিপর্যস্ত করেছে। কিন্তু তবুও তারা ধর্মকে অস্বীকার করে প্রেমকে স্বীকৃতি দেয়নি। এই থেকে বোঝা যায়, সমাজবিচ্ছিন্নতা মানুষ মেনে নিতে পারে না। আধুনিক লেখক হিসেবে এমন সমাজ অস্বীকৃত প্রেমের বয়ান লেখকের রচনায় স্থান পেলেও সেখানে সেইসব প্রেমকে প্রতিষ্ঠা দানের সাহসিকতা তিনি দেখাননি। তবে তিনি পাঠকের মনে ভাবনার জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এঁকে দিয়েছেন দেহ ও মনের দুইটি স্বতন্ত্র তল— যেখানে পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ও ঘটনাপ্রবাহের প্রতিক্রিয়া শুধু দেহ ও মনকে নয় বরং সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতিকেও প্রভাবিত করেছে। এমন প্রেমের পরিণতিকে লেখক ব্যক্তি ট্র্যাজেডিতে পরিণত করেছেন, কিন্তু কখনোই সমাজকে উপেক্ষা করতে পারেননি। সমাজকে কেন্দ্র করে কখনো তিনি সুমিতার ট্র্যাজিক পরিণতি কখনো মঙ্গলের ট্র্যাজিক পরিণতি দেখিয়ে উপন্যাসকে ব্যক্তির অন্তর্দহনের মূলে পর্যবসিত করেছেন। সুমিতা সুশিক্ষিত ও রচনীল মানসিকতার হয়েও সমাজের প্রতিবন্ধকতা মেনে নিতে চেয়েছে। নিজের আত্মসম্মানকে বিসর্জন দিয়ে সুব্রতর মতো নির্বোধের স্থূল প্রেমের বাহুপাশে নিজেকে আবদ্ধ করে সমাজের কটাক্ষ এড়াতে চেয়েছে। মঙ্গলের সাথে প্রেমের বিষয়টি লুকানোর জন্য সুব্রতর সামনে সুমিতার অভিনয় যেন নারীর প্রতি নারীর অসম্মান প্রদর্শন। বংশ পরম্পরায় নারীরা পরাধীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তা ক্ষণিকের জন্য হলেও সুমিতার চরিত্রে প্রকটিত হয়। এই সবকিছুই রাজিয়া খান মানবজীবনে সমাজের প্রতিবন্ধক

দৃষ্টিকোণকেই দায়ি বলে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই উপস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নাসরীন জাহানের একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তাঁর ভাষায় :

আলোহীন-বাতাসহীন অন্ধকার পৃথিবীতে যে মেয়ে যত হলুদ ঘাসের মতো সে ততো সুন্দর, ততো প্রশংসনীয়। একজন শিক্ষিত মেয়েও যখন চলন্ত পণ্যের মতন বিবাহের বাজারে বিকোনার জন্য পাত্রপক্ষের সামনে এসে তাদের প্রশ্নের মুখে মরিয়া হয়ে নিজের কীর্তি জাহির করে, এবং এরকম অমানবিক একটি বিষয় অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে যখন এই সমাজের ঘরে ঘরে প্রচলিত, তখন আমাদের চারপাশে নারীর চরম দীনতার রূপটাই প্রকট হয়ে পড়ে। (নাসরীন, ২০০৫ : ১৩)

শুধু মঈন-সুমিতা নয়, এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রের বিচ্ছিন্নতা ও নেঃসঙ্গের মূলে সমাজ স্বীকৃত নিয়ম ও অনিয়মের সক্রিয় ভূমিকা দেখা গেছে। প্রেম-ব্যর্থতা কিংবা দাম্পত্য-সম্পর্কের অসঙ্গতি প্রতিটি ক্ষেত্রে পার্শ্ব-চরিত্রগুলো (হেনরিয়েটা, আহমদ হাসান, শামসা, শীলা, মঈন, তরু) সমাজের বেড়াজালে আড়ষ্ট। অতি আধুনিক চিন্তাশীল স্বাধীন চেতনার নারী হয়েও হেনরিয়েটাকে বিবাহবহির্ভূত সন্তানের মা হওয়ার লজ্জা লুকাতে দেখা গেছে। আহমদ হাসান পিতৃপরিচয় দিতে চায় না তার নিজস্ব সমাজের কথা ভেবে। অন্যদিকে সুমিতার প্রতি গভীর আবেগী আকর্ষণ সত্ত্বেও মঈন নিজ দেশ থেকে পেশাগত প্রয়োজনে দূরে থাকার সুবাদে শুধুমাত্র মানবিক কারণে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হেনরিয়েটা বা হেটির সন্তানকে পিতৃপরিচয় দিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই উপন্যাসে মঈনকে হেটির নিজস্ব সমাজের কাছে ছোট হওয়া থেকে বাঁচাতে হেটিকেন্দ্রিক যান্ত্রিক এক জীবনের খোলসে পড়তে হয়। জীবনবোধের এই উদারপন্থী চেতনা থেকে শুরু দাম্পত্যজীবনের এই আবেগহীন সম্পর্ক মঈনকে একসময় কঠিন একাকীত্বে ভোগায়। আবার বিবাহিত শীলার প্রেমিকের সাথে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও দাম্পত্য অসঙ্গতির কারণে আত্মহত্যাও মঈনকে পীড়িত করে। সংবেদনশীল মঈন জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও দুর্ঘটনার পক্ষে একেকটা তত্ত্ব নির্মাণ করে, যা তার আত্মজিজ্ঞাসা ও জীবনসন্ধানে আকুলতার জন্য দেয়। এই আকুলতা তার ভাবনালোকে স্বতন্ত্রবোধের সৃষ্টি করে :

সমস্ত জীবনটা আমাদের ইচ্ছার অতীত, কোনো প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত, এ ভয়ানক সত্যটা মানুষ স্বীকার করে না, বিশ্বজোড়া ট্যাজেডির ব্যাপক মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না বলেই ব্যক্তির আত্মহত্যা, আত্মপীড়নের মধ্যে ব্যক্তিগত বেদনাকে বড়ো করে তোলার প্রয়াস। এমনি করেই জন্ম হয়েছে ব্যক্তির ট্যাজেডির। (রাজিয়া, ২০০৪ : ৫৩)

মঈন আত্মবিশ্লেষণে দক্ষ, জীবন নিয়ে নিরাসক্ত। বহিজীবন ও অন্তর্জীবনের দ্বৈত ধারায় সে ট্র্যাজেডির একক দর্শক। কারণ জীবনের ব্যাখ্যাকার মঈনের নিজের জীবনও শেষপর্যন্ত শূন্যতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। ব্যক্তি ও সমাজের ক্রমবর্ধমান জটিল আবর্তে তাকে কোনো সুনিশ্চিত সমাধান দিতে পারে না। সুমিতা এই জটিল আবর্তে পড়ে মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুমিতা হেটির জীবনে মঈনের অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করে। অতিরিক্ত চিন্তার ফলে অতিবাস্তবতা বা আদিভৌতিক ঘটনার মধ্য দিয়ে জেগে জেগে অবাস্তব দৃশ্য দেখে এবং মানসিক

বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। হেটির প্রতি সুমিতার এই সহানুভূতি উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে মানবিক সম্পর্কের পটভূমিতে ভিন্নমাত্রা যোগ করে। সুমিতার এই মানসিক দহন দেখে নীলিমা ইব্রাহিমের ‘এক বাঁক দুই পথ’ (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের লিলি চরিত্রটিকে মনে পড়ে। লিলিও তাহেরের প্রথম স্ত্রী পলির আত্মহত্যার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে। সুমিতার পরিণতি দেখে মঈন নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করে এবং সমাজকে উপেক্ষা করে হেটির থেকে মুক্ত হয়ে সুমিতাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিকারগ্রস্ত সুমিতাকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলে সুমিতার বাবা ঐ সমাজের কথা ভেবে আশঙ্কা বোধ করে। সুমিতার বাবা ধীরেন বাবুর এই চিন্তা থেকেই বোঝা যায়, ব্যক্তিজীবন সমাজের নিয়মে কতোটা আড়ষ্ট। সমাজ স্বীকৃতি না দিলে শতভাগ প্রেমও ব্যক্তিমানস ও জীবনকে সুনিশ্চিত করতে পারে না। উপন্যাসে বিধৃত সামাজিক নিগড়ে পৃষ্ঠ ব্যক্তির আকৃতি ধীরেন বাবুর কণ্ঠে উচ্চারিত। প্রাসঙ্গিক উক্তিটি :

: না-না ভোলানাথ। তুমি আজকের রাতটা ভাবো। মত হলে কাল ভোরেই আমি কাজি আনতে পাঠাব। লোকে আমাকে মন্দ বলবে। আমার জাতের লোক বলবে, ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে উন্মাদ মেয়েকে একটি বিবাহিত লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। মানুষের কথার খোঁচা যে জীবনকে কত বিশী করে তুলতে পারে তাও ভেবে দেখো। তোমারও জীবনে সাধ-আত্মদ আছে, লোকে যখন বলবে তোমার স্ত্রী উন্মাদ, সহ্য করতে পারবে? (রাজিয়া, ২০০৪ : ১৩০)

মঈনের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, ঢাকায় মন্টুর স্মৃতিসঙ্গ, চট্টগ্রামে মন্টুর প্রেমিকা তরুর অন্তঃকন্দন এবং কলকাতার সুমিতার সান্নিধ্য আকাক্ষা, স্বসমাজ-বাস্তবতা ও হৃদয়ের দ্বন্দ্ব, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় ব্যবধান তাদের জীবনকে বিচলিত করেছে। এভাবে উপন্যাসটির ঘটনাবিন্যাস সহজ ও সরল থাকেনি বরং মনস্তাত্ত্বিক জটিলত্বই উন্মোচনের মধ্য দিয়ে মানব-মনের পরিচয় মেলে ধরেছে। এই উপন্যাসে মঈন-সুমিতার প্রেমের ট্রাজেডিকে রাজিয়া খান সমাজ, সময়, রাষ্ট্রের জটিল-দ্বন্দ্বময় ঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, যা তাদের সমাজ অস্বীকৃত প্রেমকে নানা অনুষঙ্গে উপন্যাসে প্রতীয়মান করার প্রয়াস মাত্র। তিনি অসাধারণ শিল্পিত দক্ষতায় তাঁর উপন্যাসে মানব-চরিত্রের মনস্তত্ত্ব প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

‘বটতলার উপন্যাস’ উপন্যাসে ভিন্ন ধর্মের দুইজন নর-নারী যেমন সমাজের অনুশাসন মানতে এক হওয়ার যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন তেমন সমাজ-সংস্কারের অনুশাসনে জর্জরিত হয়েছে লেখকের ‘অনুকল্প’ (১৯৫৯) উপন্যাসের দুই নর-নারী। এই উপন্যাসের প্রধান দুইটি চরিত্র, আশরাফ ও রেণুকা। অভিন্ন পারিবারিক পরিবেশ ও যত্নে বেড়ে ওঠা আশরাফ ও রেণুকার হৃদয়ঘটিত আদান-প্রদান অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত ও অকপট। কিন্তু তাদের সম্পর্কের কোনো পরিণতি ঘটে না। এখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় দুইজনের একই নারীর দুষ্কপান। এই জটিল প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা এক হতে চেয়েও বারবার সংশয়, উদ্বেগ, অস্থিরতা ও আত্মবিশ্বাসহীনতাই পতিত হতে থাকে। মাতৃদুষ্ক সংস্কারের নির্মম নিষেধ আশরাফ-রেণুর মধ্যে বনজ উদ্ভিদের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেড়ে-ওঠা প্রেমকে নিক্ষেপ করে মানসিক বিকার ও অসুস্থতার মধ্যে। (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ১৪৮)

রাজিয়া খান এই দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্ম-মৃত্যুর রহস্য, বিস্ময়, কৌতুহল ও অজ্ঞাত আর্তি জড়ানো নিষিদ্ধ প্রেমের জটিল আবর্তন দেখিয়েছেন। নিষিদ্ধ প্রেম হলো বাংলা মহাকাব্য *রামায়ণের* সেই মায়ামৃগ যে বারবার আকর্ষণ করে, ডাকে, মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, ক্লান্ত করে, আরও গভীর থেকে গভীরতর রহস্যের অন্ধকারে ঠেলে দেয়। কিন্তু প্রেম নামের নিষিদ্ধ ফলের সর্বশেষ মিষ্ট রূপের সাক্ষাৎ কোনোদিনই মেলে না। তাই প্রেমভাবনার আধুনিকতম যুক্তি-তর্ক আনে জটিলতা, পরস্পরবিরোধী ভাবনার দ্বন্দ্ব-সংঘাত। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ প্রেমকে নিজ নিজ শিক্ষায়, চেতনায়, ব্যক্তিত্বে, প্রয়োজনে, পরীক্ষায়, দর্শনে ধরবার চেষ্টা করে। এমন চেষ্টা থেকে দুইটি প্রধান বিরোধী মতকে স্মরণ করা যেতে পারে। প্রথম মতটি এমন :

Love is a flood which wells up from the depth of our personality. It is not a static thus-being, but moves up towards the beloved. Love is an emotional action, a warm affirmative participation with the other being for its own sake. in the depth of his being the lover feels himself unconditionally united with the object of his love, it is vital, autologic, altogetheress. (Kirekegard, 1946 : p.06)

আধুনিক অস্তিত্ববাদের অন্যতম প্রবক্তা ড্যানিশ দার্শনিক ও প্রবন্ধকার কিয়ের্কেগার্ডের এই মন্তব্যের বিরোধী আর একটি মন্তব্য হলো : ‘Love is not an emotion or a desire, but a cognitive act in which we grasp the very essence of another person, a *connaissance du coesur* as pascal calls it.’ (Eliot, 1999 : p. 129) এই দুইটি মন্তব্যের আলোকে বোঝা যায়, আশরাফ ও রেণুকার দুইজনের দুইজনের প্রতি প্রেম ও আবেগ দুর্বীর গতিতে বেড়ে উঠলেও তারা সমাজ-বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারেনি। তাই তারা দুইজনই সবসময় নিজেরা নিজেদের কাছ থেকে পালিয়ে থেকেছে। রেণুকা এই সম্পর্ক থেকে নিজেকে আড়াল করতে ফিরোজকে বিবাহ করে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সেই উষ্ণ সম্পর্কে রেণুকা বরাবরই শিথিল আচরণ করে গেছে। দাম্পত্য জীবনে ফিরোজ স্ত্রীর কাছে সর্বদা বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছে। কিন্তু রেণুকা বিবাহ-পূর্ব স্মৃতি ভুলতে না পেরে ফিরোজের এই বিশ্বস্ত আচরণে নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করে এবং চটুগ্রামে স্কুল চাকরি নিয়ে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যায়। অন্যদিকে আশরাফ দুখ বোন রেণুর প্রেমযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে রেণুকার নন্দন সুসানাকে বিয়ে করে। কিন্তু রেণুকা আশরাফের বিয়ের পরও নিজের প্রেম-যন্ত্রণাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ফিরোজকে অবলম্বন করে এই প্রেম-যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে চেয়েও রেণুকা নিজের নারীসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে বারবার আশরাফের কাছে ছুটে গেছে। নারী হিসেবে রেণুর এই আচরণ তার ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে। রেণুর এই একনিষ্ঠ প্রেম নিবেদন সম্পর্কে সমালোচকের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য। প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

[...] নারী যখন প্রেমে পড়ে, তখন সে ভুলে যায় তার অস্তিত্ব, তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব; কেননা প্রেমে পুরুষ ঈশ্বর আর নারী ভক্ত। ভক্ত যেমন নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে প্রভুর পদতলে, নারীও করে তাই; কেননা প্রভু ছাড়া নারী নিরস্তিত্ব। [...] পুরুষ নারীকে শিখিয়েছে আত্মোৎসর্গ করতে, তাকে বাধ্য করেছে আত্মসমর্পণ করতে। (হুমায়ুন, ২০০৫ : ২২৫)

আসলে রেণু তার অসংখ্য দ্বন্দ্ব ও অপরিসীম অতৃষ্টির হৃদিস আশরাফের কাছেই খুঁজে পেতে চেয়েছে। আশরাফও রেণুর এই উপলব্ধির কাছে কখনো কখনো দুর্বল হয়েছিল। উপন্যাসে তাদের কথোপকথনে বিষয়টির গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক অংশ :

: আশু ভাই, অমন করে উড়িয়ে দিও না। আমি বড্ড ক্লান্ত আজ। তোমায় ওকথা জিজ্ঞেস করলাম কেন, জান? আমার ছিলো তৃষ্ণা-স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, যা খুশি নামকরণ করতে পারো ঈঙ্গিত বস্তুকে-তা মেটানোর জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলাম। তোমাকে ডেকে পাঠালাম চাটগাঁ থেকে-

...

: তোকে তো আমিও নিতে পারতাম-কিন্তু সে যেন বলে দিল, যে নাড়ির টান জন্মেছে, তার ওপর সমাজ অনুমোদিত নৈকট্যের ভার চাপালে হৃদপতন ঘটবে। রেণু, তোকে আমি কী বলে ডাকবো, কীভাবে কাছে নেব, কিছু বুঝে উঠতে পারিনে। তুই আমার শুধু বোন নস, তুই আমার শুধু স্ত্রী হতে পারতিনে- (রাজিয়া, ২০০৪ : ১৫৮)

শেষপর্যন্ত তাদের মিলন ঘটেনি। তারা জীবনের জটিলতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করতে পারেনি। আবার সমাজের বাইরে গিয়ে নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ভাবার দুঃসাহস করেনি। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে নাটকীয়ভাবে আশরাফ রেণুর প্রতি অবৈধ আকর্ষণের তীব্রতাকে অস্বীকার করে সুশীকে বিয়ে করে। এখানে আশরাফকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বারবার স্বপ্নতড়িত ভয় ও সমূহ বিপদের আনাগোনা অস্তিত্বতাই ভুগতে দেখি ঠিক যেন ইয়ং-কথিত অবচেতন মনোজগতের প্রতীকীকরণে। কারণ, 'The dream is specifically the utterance of the unconscious' কিংবা 'dreams give information about the secrets of the inner life and reveal to the dreamer hidden factors of his personality'। (Carl G. Jung, 1984 : p. 9-16) উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক অংশ : '... আমি না হয় পাগল, তাই বলে রাত-বিরাতে এভাবে জ্বালাবি আমাকে? রনকুরে, চল, বোসদের বাগান থেকে আমড়া চুরি করে আনি-যাবি, ভবানীপুরের সেই আমড়াগাছের তলায় গেলে লোকে ভূত দেখে না? আমার আত্মাটা যে তার চারপাশের এলাকাকে আঁকড়ে আছে। হ্যাঁরে রনকু, আমি কি বেঁচে আছি? বাতাসে জানালাটা তো খুব ঝাপটাচ্ছে দেখছি- আমাকে মরতে দেখে বোধ হয়।' (রাজিয়া, ২০০৪ : ১৭২) অন্যদিকে সমাজনীতির বাস্তবতার কাছে পরাজয় মেনে রেণুকা পুনরায় স্বামীগৃহে ফিরে গেছে। এই থেকে বোঝা যায়, রাজিয়া খান সমাজ অস্বীকৃত প্রেমের বয়ান করেছেন ঠিকই, কিন্তু সমাজ-সংস্কারের উর্ধ্বে রেণুকে প্রশ্নই দেননি। তিনি বিবাহিত নারীর মনস্তাত্ত্বিক রহস্য আবিষ্কারের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই গুরুত্বের প্রয়োজন আছে। আসলে যে গভীর নীতিবোধ মানুষের মনের গোপনতম কোণায় বাস করে, যদিও তার সঙ্গে সাহিত্যবোধের সংঘর্ষ আছে তবুও লেখক এই সময় ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সামাজিক নীতির কাছে থমকে গিয়েছিলেন। টলস্টয়ের মতোই হয়তো হতাশা বোধ করেছিলেন তাই রেণু ও আশরাফের মিলন দেখাতে

পারেননি। শেষপর্যন্ত সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের নীতির একটা মোকাবিলা করতে বাধ্য হয়েছেন।

এই উপন্যাসে আরোও একটি অবৈধ বা সমাজ অস্বীকৃত প্রেমানুভূতির বয়ান রয়েছে। উপন্যাসে পার্শ্ব চরিত্র লিলি, আশরাফের সহোদরা। সুশীকে বিয়ে করায় রেণুর মতো লিলিও আঘাত পেয়েছে। লিলি আশরাফের প্রতি আলাদা এক মোহ অনুভব করে, যা সমাজ কখনোই মান্যতা দেয় না। এখানে স্মরণীয় যে, বিশ শতকের সূচনালগ্নে সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) মনোবিকলন তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। ১৮৯৯ সালে ভিয়েনায় প্রকাশিত সিগমুন্ড ফ্রয়েড রচিত গ্রন্থ ‘দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অব ড্রিমস’-এ তিনি মানুষের মনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের অবচেতন মনের অচরিতার্থ কামনা-বাসনার ফলে মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং সে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। রাজিয়া খান ‘লিলি’ চরিত্র নির্মাণে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন। মন ও সমাজের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে রাজিয়া খান জীবনবোধের এক স্বাভাবিক দিক উন্মোচন করেছেন যেখানে ফ্রয়েডীয় চেতনার সাথে ধর্মবিশ্বাসজাত সামাজিক সংস্কারের এক মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে। এখানে লেখক অনেক সাহসিকতার সাথে মানবমনের অবচেতন চাওয়ার সমাজবিরুদ্ধ রূপটি তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক অংশ :

নিজেও জানে যে তার অবচেতন মন আপন ভাইকে তার স্বপ্নের পুরুষের আসন দিয়েছে। আগ একদিন শীতে-কুকড়ে-থাকা দেহের ওপর একখানা আলোয়ান দিয়ে গিয়েছিলো; উষ্ণতার আমেজে জেগে উঠে আশুর অপসৃয়মাণ দীর্ঘ দেহের দিকে তাকিয়েই সে বালিশে মুখ গুঁজে বাকি রাতটা কেঁদে কাটাল। শালোয়ার-কামিজ পরতে তার প্রবল আপত্তি, কিন্তু পাছে সবাই টের পায় যে আশুর মনরক্ষার জন্য শাড়ি পরছে সে, সেই ভয়ে পরে। সে যেন আবছাভাবে বোঝে যে আশুর প্রতি তার তীক্ষ্ণ ভালবাসার কোথায় যেন একটা অপরাধের স্পর্শ আছে। এখন তার তেরো বছর বয়স। জ্যোৎস্না উঠলে বাগানমুখী সিঁড়ির ধাপে চূপ করে বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করে, হঠাৎ মনে হয় বারান্দার ওপর ছলকে পড়া চাঁদের আলো সহসা পুঞ্জীভূত হয়ে, উদ্বেল হয়ে দীর্ঘ এক পুরুষের, তারপর আশুর রূপ ধরল; স্পর্শাতীত এক আলিঙ্গনে তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। ভয়ে লিলির বুক কেঁপে ওঠে। (রাজিয়া, ২০০৪ : ১৭০)

রাজিয়া খান এখানে সমাজ নৈতিকতার বিরুদ্ধে গিয়ে মানব মনের ভিন্ন একটি সত্যকে উন্মোচন করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে হয় মহৎ সাহিত্যে একটি বৃহৎ অনাবরণ আছে। মানুষের মানবত্ব ও পশুত্ব কিছুই সেখানে গোপন থাকে না। মানুষ যদি দোষ-ত্রুটি মুক্ত হতো, তবে মানুষের ইতিহাস ‘অদ্ব্যসত্যে কামাচ্ছন্ন’ হতো না বা অডেনের মতে কোনো ইতিহাসই আদ্যন্ত হতো না। জীবনের যে সত্য সমাজে প্রকাশের ফল অসহিষ্ণু, জীবনের সেই বিষয় যথার্থ প্রকাশের অপরাধগুণতা সাহিত্যে বৈচিত্র্য এনেছে। সুতরাং, লিলির এই মুহূর্তের মনের দ্বন্দ্ব তার অবচেতন মনের এক প্রতীকী পরিক্রমা থেকে আগত মানসিক পরিস্থিতি। সুতরাং লিলি চরিত্রে

ফ্রেডের মনঃসমীক্ষণবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত ও তা উপন্যাসে লেখকের একটি সাহসী পদক্ষেপ বলেই বিবেচ্য।

রাজিয়া খান ‘অনুকল্প’ উপন্যাসে সমাজ অস্বীকৃত প্রেমের বয়ান করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু বাক্য ও মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন, যা দ্বারা মানবজীবন ও সমাজের শাস্ত-সত্য বার্তাটি ফুটে ওঠে। সেক্ষেত্রে লেখক যে শুধু কাহিনি বলেই দায়িত্ব শেষ করেননি বরং মানবজীবন-রহস্যের গূঢ়তম তাৎপর্য ও জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণজাত মতামত প্রকাশ করেছেন তা স্পষ্ট। এর মধ্য দিয়ে মানুষের বিচিত্র মনের বেদনা, বিস্ময়কর আকাজক্ষা ও মনোজগতের প্রবহমান ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে লেখক মানবমনের অবচেতন চাওয়ার সমাজবিরুদ্ধ রূপটি প্রকৃতঅর্থে তুলে ধরেছেন। সমাজ অস্বীকৃত প্রেমের বয়ানে নারী-পুরুষের ভূমিকায় রাজিয়া খান বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীর মনস্তত্ত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিচিত্র জীবনবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন। উপন্যাসের মূল চরিত্র হিসেবে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করা, নারীর প্রেমবোধ ও আত্মবিশ্লেষণে রাজিয়া খান একজন ব্যতিক্রমী লেখক। এই কারণে বাংলাদেশের উপন্যাসে নারীভাবমূর্তি সৃষ্টিতে আকিমুন রহমান তাঁকে প্রথম ভাগের নারী লেখকদের একজন মনে করেন। (আকিমুন, ১৯৯৫ : ১৬৫)। আবার একজন নারী লেখক হিসেবে নারীর চোখ দিয়ে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার বিচারে এইসব প্রেমকে ব্যাখ্যাভিত্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত করেছেন। কখনো নরনারীর প্রেম সমাজকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি, আবার কখনো এইসব সম্পর্ক প্রেম, সমাজ ও লিঙ্গভেদকে ছাপিয়ে অশ্লীলতাই পর্যবসিত হয়েছে।

রাজিয়া খান তাঁর উপন্যাসসমূহে নর-নারীর প্রেমকে কখনো ইতিবাচক ও কখনো নেতিবাচক হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহকে তৎকালীন দেশভাগজনিত সংকটে উপমহাদেশের বিশাল ভৌগোলিক পরিসরে এক জটিল সময়ের সাক্ষী করে তুলেছেন। ফলে নর-নারীর সমাজ স্বীকৃত ও অস্বীকৃত প্রেমের পাশাপাশি নগরজীবনের জটিলায়তন, ব্যক্তি মানুষের নৈঃসঙ্গ্য, বিচ্ছিন্নতা ও আত্মরক্তক্ষরণের শিল্পরূপায়ণ ঘটেছে তাঁর রচনায়। এই বক্তব্যের সূত্র ধরে রাজিয়া খানের ‘চিত্রকাব্য’ (১৯৮০) উপন্যাসটি প্রাসঙ্গিক। তার রচিত তৃতীয় উপন্যাস ‘প্রতিচিত্র’ (১৯৭৬) উপন্যাসের কাহিনি ‘চিত্রকাব্য’ (১৯৮০) উপন্যাসে পরিণতি পেয়েছে। ‘প্রতিচিত্র’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হামিদ-আয়েশার সরল সংসার জীবনের কাহিনি ‘চিত্রকাব্য’ উপন্যাসের কাহিনিতে এসে জটিল রূপে পরিণত হয়।

‘প্রতিচিত্র’ ও ‘চিত্রকাব্য’ উপন্যাসদ্বয়ের কাহিনি মূলত হামিদের ছোট মেয়ে বিলকিস ওরফে বুলুকে নিয়ে আবর্তিত। তবে ঘটনার প্রবাহে একাধিক নারীর গল্পের সমাহার ঘটেছে এই উপন্যাসে। কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলকিস প্রথাগত জীবনযাপনে বিশ্বাসী নয়। সে অপরিণত শরীরের খাঁচায় এক আশ্চর্য পরিণত মনকে লালন করে। স্বাধীনতা আন্দোলনকালে বাঙালি নারী-জীবনে স্বাধীনতা ও রেনেসাঁর যে প্রভাব পড়েছে এই উপন্যাসের বুলু চরিত্রের ক্ষেত্রে তা কার্যকর। বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম পরিবারের

নারীদের শিক্ষাদীক্ষা, পড়ালেখা, সাহিত্যচর্চা, চলাফেরা, পর্দাপ্রথা থেকে বেড়িয়ে আসা, পুরুষের সাথে বিনা দ্বিধায় চলাফেরা, প্রিয়জনের সাথে একান্তে সময় কাটানো, প্রেমাসক্ত কিংবা কামাসক্ত হওয়া, এক বা বহু পুরুষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা, পুরুষের সাথে নারীর সম্পর্কে সৃষ্ট সামাজিক, মানসিক জটিলতার মতো বিষয়গুলো ‘প্রতিচিত্র’ উপন্যাসে উঠে এসেছে। এই উপন্যাসে বলু চরিত্রের কার্যকলাপ ও ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে তৎকালীন মুসলিম পরিবারের মেয়ের বিবর্তনবাদের রহস্য উদ্ঘাটন, নারীমুক্তি, নারীর শিক্ষা-শিল্পসাহিত্য-সংস্কৃতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ, শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের নারীর অবস্থান ও প্রাথমিক চেষ্টাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেই বলু চরিত্রের মাধ্যমেই ‘চিত্রকাব্য’ উপন্যাসে উঠে এসেছে বিভিন্ন বয়সের মানুষের শারীরিক-মানসিক দৃন্দ ও জটিলতা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বিবর্তনশীল সামাজিক চিত্রপট। এখানে প্রাসঙ্গিক একটি উক্তি স্মরণযোগ্য :

রাজিয়া খান এগুলো নিছক বানিয়ে তোলেন নি, নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে, কার্যকারণের ভেতর দিয়ে, এক অভীক্ষায়-অকুণ্ঠতায় তুমুল ও অব্যাহতভাবে এক পথ নির্মাণ করে ফেলেন। একপাক্ষিক বা একদেশদর্শিতায়ও বলা যায়, মনোজগতের এক অনিরুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছেন তিনি, পূর্ণ ও তন্তু আধুনিকতায়। এবং খুবই তা অগ্রসর, অনতিদ্রুত বৃত্ত-যা একালেও প্রশ্নবিদ্ধ, তুমুল অসম্ভব বিষয় কিন্তু অকপটে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন, দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। সমাজকেন্দ্রিক আরোপিত কিছুই তার সমর্থন পায় নি, সেটিকে গ্রহণও করেন নি, মনেপ্রাণে তো ননই, নারী হয়ে নারীর শৃঙ্খলপাশ ছিঁড়তে চেয়েছেন, দাঁড়াতে চেয়েছেন-উদ্ধুদ্ধ করতে চেয়েছেন, পেছনে নয় সামনে এগুনোর কথা বলেছেন। (শহীদ, ২০১৪ : ১৬১-১৬২)

এই উপন্যাসে বলুর সৎমা জমিলার জীবনের ঘটনা থেকে সমাজে নারীর অবস্থানের এক করুণ চিত্রও দেখা যায়। জমিলার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, উপহাস, শোষণ, অসহায়তা ও যৌনতাজনিত নানাবিধ ভোগান্তি তাকে বিকৃত ও কুটিল মনের অধিকারী করে তোলে। সর্বোপরি তার অশিক্ষার নেতিবাচক দিকও এই উপন্যাসে প্রতীয়মান। কারণ অশিক্ষা ও নিজের পরিবার থেকে প্রাপ্ত বিরূপ আচরণের প্রভাবেই হামিদের দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়ার পর সে হামিদের সন্তানদের সাথে মাতৃসুলভ আচরণ করতে পারেনি। বিলু জমিলার এই আচরণকে কখনো মানতে পারেনি, আবার হামিদ ব্যস্ততার কারণে কখনো বিলুকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেনি। হামিদ কখনো কখনো সন্তানকে কাছে পেতে চাইলেও সেখানে জমিলা নানান অছিলায় পিতাকন্যাকে কাছে হতে দেয়নি। ফলস্বরূপ দিনের পর দিন পরিবারের এই তিনজনের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক অদৃশ্য দেয়াল। জমিলার বিবাহিত জীবনে বিলাসিতার অভাব না থাকলেও যৌনজীবনের দৈনন্দিনতা ছিলো তা উপন্যাসিকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। জমিলা পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত যুবতী হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের অবহেলার কারণে তার চেয়ে বেশি বয়স্ক বিপত্নীক হামিদ আহমদের সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের আগেই হামিদের বয়সের কথা ভেবে ভবিষ্যৎ অপূর্ণ যৌনজীবনের কথা মানতে পারেনি জমিলা। নিজের জীবন ও যৌবনের এমন পরিণতি দেখে জমিলার যুবতী নারীমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং সে বিয়ের আগেই তার খালাতো

ভাই মজনুর সাথে দৈহিকভাবে মিলিত হয়, যা অপ্রত্যাশিত ও সমাজ অস্বীকৃত। বয়স্ক হবু স্বামী সম্পর্কে জমিলার ভাবীর ইঙ্গিতপূর্ণ কথা জমিলার মনকে বিষিয়ে তোলে। উপন্যাসে বর্ণিত অংশ :

জমিলার চোখের ওপর মজনুর যৌবনমন্দির চোখ দুটো হাতের ঋজু পেশি গেঞ্জির বাইরে জেগে থাকা লোমশ বুকটা ভাসে। আর মেজ বউর সেই কথাগুলো হাজার হাজার বিচ্ছুর মতো তার চামড়াকে জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। ‘বয়সটা যা একটু বেশি। পঞ্চাশ তো হবেই।’ রাতে জমিলার ঘুম এল না। ...।

কান্নায়, দুঃখে, বিরক্তিতে সে মুখ দ্বিগুণ বিশ্রী দেখাচ্ছে। এক চাপা আক্রোশে নিজের গায়ের জামা খুলে ফেলল জমিলা। আর সঙ্গে সঙ্গে আয়নায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল— পরিপক্ব ফলের মতো দুই নিটোল স্তনের প্রতিকৃতি বহন করে। উন্মুখ, কালচে স্তন্য শিউরে উঠল।

...

সেই ঘরেরই সামনের তক্তপোষে নগ্ন বুকে ঠিক মোষের মতো নাক ডাকাচ্ছে মজনু। ... কিন্তু বেশি ভাববার অবকাশ ছিল না জমিলার। নিজের খোলা ব্লাউজের মধ্য দিয়ে উপচে পড়া কোমলতা নিয়ে সেই দৃঢ় পাটাতনের মতো বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। (রাজিয়া, ২০০৪ : ৩৫৭-৩৫৮)

জমিলা চরিত্র নিরুপণে রাজিয়া খানের যৌনতার সূচক হিসেবে দৈহিক গঠনের রগরগে বর্ণনা সত্যিই তাঁর লেখনীতে এক ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। নারী লেখক হিসেবে এমন ভাষা-প্রয়োগ ও শব্দচয়ন প্রশংসার দাবী রাখে। অন্যদিকে বুলু চরিত্র গঠনে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে উগ্রতাকে প্রকাশ না করে ভাষা প্রয়োগের পরিমিতবোধও রাজিয়া খানের ব্যতিক্রমী লেখনী শক্তির পরিচায়ক। উপন্যাসে দেখা যায় বুলু সবসময় তার চেয়ে অধিক বয়সীদের প্রতি আত্মিক বা ভালোবাসার টান অনুভব করে। অনেক ক্ষেত্রে সংসার করার আগেই বুলু ভালোবাসার সাথে যৌনতার টানও অনুভব করে। কৈশোরে যুবক সেলিম, বুলুর প্রথম যৌবনে পিতার সেক্রেটারী মধ্যবয়সী মাদানী, সমবয়সী ভিন্ন ধর্মের লক্ষণ— প্রত্যেকেই বুলুর জীবনে নানা মাত্রিক প্রেম নিয়ে আসে। লক্ষণকে সে মনেপ্রাণে ভালো না বাসলেও তার আদর সে নিঃসংকোচে-নির্দিষ্টায় গ্রহণ করে। বুলু চরিত্রের মধ্য দিয়ে রাজিয়া খান কুমারীত্ব ও নারীর বহুগামিতা নিয়ে সংস্কারের বালাই রাখেননি। আবার বুলুর যৌনজীবনের খোলামেলা আলাপ করে উপন্যাসে তাকে ছোটও করেননি। তিনি প্রকৃতঅর্থে ব্যক্তি-মানুষের বিচিত্র স্বভাবের প্রতি গুরুত্বারোপ ও আত্মনির্ভরশীল-স্বাধীন নারীর প্রতীক নির্মাণ করার প্রয়াস করেছেন। প্রেম-ভালোবাসার মতো যৌনাকাজক্ষা মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই বুলু বিশ্বাস করে। রাজিয়া খান বুলুর চিন্তাচেতনা ও বিশ্বাসের ধারণা দিতে উপন্যাসের একটি অংশে বুলুর মনের দোলাচলতার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক অংশ :

আমি মুক্তি চাই। চাই বৃহত্তর জীবন। ব্যাপক বিশাল এক ক্ষেত্র।

বৃহত্তর জীবন না পেলেই শুরু হয় সংকীর্ণ নীড়-প্রেম। ভালবাসায়, আশ্রয়ে পরিবেষ্টিত হবার কামনা। প্রতিহত হয়ে এখন চাই ঝাঁপ দিতে অন্ধকারে। সেই পুরনো আত্মনাশের পথ হাতছানি দেয়। (রাজিয়া, ২০০৪ : ৩৭৮)

বুলুর এই উক্তির মধ্য দিয়ে রাজিয়া খান নারী চরিত্রের এক স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করেছেন। কারণ নারী সবসময় কোথাও আটকাতে চায় কিংবা কাউকে জীবনে আটকে রাখতে চায়। বুলুর নিজের মা আয়েশার জীবনবোধের সাথে এই দুই নারী- জমিলা ও বুলুর জীবনযাত্রা নিয়ে দর্শন ও জীবনবোধের স্বাভাবিক পাওয়া যায়। ‘প্রতিচিহ্ন’ উপন্যাসে আয়েশার যতটুকু উপস্থিতি রয়েছে তা একেবারেই সরল-সংসারপ্রান এক নারীর গল্প। সেক্ষেত্রে বুলু ও জমিলা সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনবোধকে ধারণ করে। জমিলা অবলীলায় কুমারীত্ব বিসর্জন দেয়, বিয়ের পরও গোপনে মজনুর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। কিন্তু বুলু চরিত্রটিকে রাজিয়া খান বহু পুরুষের সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেও তাকে দুঃশ্চরিত্রা হতে দেননি। একজন নারীকে তিনি তার নিজস্ব চেতনা দিয়েই উপন্যাসে নির্মাণ করেছিলেন। তাই বুলুর অস্থির-চঞ্চল যৌনজীবনের চেয়ে তার ব্যক্তিমানুষ হিসেবে বিচিত্র স্বভাবের নানা কথা উপন্যাসে অধিক উপস্থাপিত। বুলু চরিত্রটির সাথে সেলিনা হোসেনের পদশব্দ (১৯৮৩) উপন্যাসের সালমা চরিত্রের হুবহু মিল পাওয়া যায়। সালমা চরিত্রটি রূপায়ণে সেলিনা হোসেন নারীকে পুরানো মূল্যবোধকে ভেঙে নিজস্ব স্বাধীন ও সমাজসংস্কারমুক্ত একটি শক্তিশালী মনোজগত সৃষ্টির মতো মানসিক ও চারিত্রিক বিশিষ্টতা দানের প্রয়াস করেছেন। যদিও তিনি সালমা চরিত্রের কোনো পরিণতি দেখাননি। প্রকৃতঅর্থে এই সময়ের নারী লেখকগণ ইতালির ফ্লোরেন্সে সংঘটিত সামাজিক আন্দোলন রেনেসাঁ বা নবজাগরণের মূল প্রবণতাসমূহ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তারা চেয়েছিলেন নারীকে মধ্যযুগীয় প্রবণতা থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিস্বাভাবিকবোধ ও ব্যক্তিত্বের প্রসার ঘটাতে এবং নিজেদের সৃষ্ট নারী চরিত্রে সেইসব বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে। (বদরুল, ১৯৯০ : ১-৪)

বুলুর জীবনবোধের ব্যতিক্রম চিন্তার নারীও রাজিয়া খানের উপন্যাসে উঠে এসেছে। তার ‘হে মহাজীবন’ উপন্যাসের নায়িকা আমিনা মুসলমান প্রেমিককে বিয়ে করে সংসার পেতেছে ঠিকই, কিন্তু পায়নি ভালোবাসার মর্যাদা। উপার্জনক্ষম, আত্মনির্ভরশীল শিক্ষিত নারী আমিনা হওয়া সত্ত্বেও স্বামী আনিসের অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করে বিনা প্রতিবাদে সংসার করেছে। আনিসের সংসারে সে তার প্রাপ্য সম্মানটুকু পাবে না জেনেও সে এই সংসারে একনিষ্ঠ থেকেছে তা নারী মননের এক অজ্ঞেয় রহস্য কিংবা রাজিয়া খান সমাজের এমন স্বতন্ত্র জীবনবোধের নারীকেও উপন্যাসে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের একটি বক্তব্য স্মরণযোগ্য : ‘বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অন্ধুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই ‘দাসী’ হইয়া পড়িয়াছি। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই- এবং তাহা হইলে লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না।’ (রোকেয়া, ১৯৯৩ : ১৯) আমিনা চরিত্রটি এর ব্যতিক্রম নয়। আসলে রাজিয়া খান উপন্যাসে আমিনা ও আনিসের দাম্পত্যজীবন দ্বারা প্রথাগত সমাজবাস্তবতার নিরিখে নারীর আশ্রয়ধীন সত্তা ও দুর্বিসহ দাম্পত্য জীবনের নির্মম বাস্তবতাকে চিত্রিত

করেছেন। তবে এই উপন্যাসে উপকাহিনি হিসেবে আরোও দুটো ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একটি হলো উপন্যাসের আরেক নির্ঘাতিতা নারী অনুপূর্ণা। স্বামী হীরেন্দ্র দাম্পত্যজীবনে একদিনের জন্যও তাকে দৈহিক সুখ দিতে না পারলেও সে কোনোদিন কিছু বলেনি। সে দৈহিক অভূক্তি নিয়েই সমাজবাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তার সাথে সংসার করে গেছে। অথচ সেই অক্ষম স্বামী অবলীলায় তাকে ত্যাগ করে গৃহপরিচারিকাকে নিয়ে আলাদা সংসার শুরু করেছে। স্বামীর এরূপ আচরণ নিয়েও অনুপূর্ণার তেমন কোনো মতামত পাওয়া যায় না, যতোটা সে আমিনার সাংসারিক অভূক্তি বা স্বামীর পরনারী নিয়ে মন্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করে। অনুপূর্ণার প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি : ‘তোরা এ যুগের- সারাক্ষণ এখন দেহ নিয়ে হৈ-চৈ- হীরেন্দ্র একদিনের জন্যও আমাকে দৈহিক তৃপ্তি দিতে পারে নি- তাই বলে কি আমি তাকে ত্যাগ করেছি না অন্য কারো সঙ্গে মজেছি?’ (রাজিয়া, ২০০৪ : ৫২২) এই মন্তব্যটি অনুপূর্ণার মুখে প্রকাশ করে রাজিয়া খান নারীর যৌনতা বিষয়ক অভূক্তি কিংবা যৌন চাহিদা মেটানোর স্বাধীনতা নিয়ে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বিজ্ঞানের যুগান্তকারী প্রগতি মানুষের আত্মশুদ্ধি ঘটাতে পারেনি। সমকালীন আধুনিকতার দৃষ্টিতে এখন পর্যন্ত শারীরিক সক্ষমতা সত্ত্বেও বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত নারী যৌনতার ক্ষেত্রে পরাধীন ও সংস্কারাচ্ছন্ন। অথচ প্রাচীনকাল থেকেই সামাজিক কিংবা ধর্মীয়ভাবে পুরুষকে সেই স্বাধীনতা দেওয়া আছে। বন্য যুগ থেকে দৈহিক কারণে নারীর তুলনায় পুরুষ শক্তিশালী হওয়ায় তারা নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রমবিভাগের মাধ্যমে নারীকে ক্ষমতা ও সম্পত্তি ভোগের ক্ষেত্রে অপাত্তেয় করে তোলে। পিতৃসত্তার যুগে গৃহকর্ম নারীর ও পশুশিকার পুরুষের কাজ বলে গণ্য হয় এবং পুরুষের কাজের কাছে নারীর কাজকে নগণ্য চোখে দেখা শুরু হয়। (রাহুল, ২০১২ : ৪৩) ফলে প্রথাগত সমাজে নারীর চেয়ে পুরুষকে সবসময় শক্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হুমায়ূন আজাদের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

পুরুষতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে নারীকে ভূমি আর ভূমিকে নারী রূপে দেখে আসছে; পৃথিবীকে মাতৃদেবীরূপে পূজোও করছে; কিন্তু তার শক্তিকে করছে অস্বীকার। এক্সিলুস, আরিস্ততল, হিপপোক্রেটিস ঘোষণা করেছেন অলিম্পাস থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সবখানে প্রধান পুরুষ; পুরুষই সৃষ্টিশীল, নারী নয়। নারী ভূমি, নারী উর্বর; তবে ওই উর্বরতা সৃষ্টিশীল নয়, তাকে সৃষ্টিশীল করে পুরুষের বীৰ্য। নারী মৃত্তিকা, পুরুষ বীজ; পুরুষ অগ্নি, নারী জল। (হুমায়ূন, ২০০৫ : ৫৩)

অতএব রাজিয়া খান সচেতনভাবে উপন্যাসে এইসব ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করে নারী-পুরুষের প্রেম ও যৌনতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো স্পষ্ট করেছেন। উপন্যাসে উপস্থাপিত আরোও একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে রাজিয়া খান সমাজ অস্বীকৃত প্রেম ও স্বাভাবিক জীবনবোধের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। সেটি হলো- আমিনা ও গৌতম-এর পুরানো সম্পর্ক ও একত্রে কাটানো সময়ের কথোপকথন। গৌতম আমিনার কলেজ জীবনের বন্ধু এবং পুরানো প্রেমিক। দেশবিভাগের পূর্বে ঢাকার মেয়ে আমিনা পড়ালেখার সুবাদে কলকাতার মামা বাড়িতে থাকাকালীন কলকাতার ছেলে গৌতমের

সাথে প্রেম ও গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। গৌতম আমিনাকে বারবার বিয়ে করতে চাইলেও আমিনা ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ধর্মের কথা ভেবে বিয়ের বিষয়ে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এইসব অশ্চর্যতার মধ্যে গৌতমের সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটে এবং দীর্ঘ কুড়ি বছর পর ভারতের আজমীরের এক ক্যাফেতে গৌতমের সাথে তার দেখা হয়। গৌতমের সাথে দেখা হওয়ার পর তারা আবার ঘনিষ্ঠ হয়। সেইসময় আমিনার চিন্তার সূত্র ধরে বোঝা যায়, গৌতমকে বিয়ে না করে আনিসকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত তার কতোটা ভুল ছিলো। উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক অংশ :

...তার ভয় সে হিন্দুবাড়িতে খাপ খাইয়ে গৌতমের ঘরনি হতে পারবে কি-না। তার বাবা ঢাকায়। সে কোথায় থাকবে স্থির করতে পারছে না। বড় মামার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে ভেবেছিল ঢাকায়ই শেষ পর্যন্ত যেতে হবে তাকে। সেদিন কোলনে গৌতমের কথায় রাজি না হয়ে করেছিল দ্বিতীয় ভুল। প্রথম ভুল তার দোদুল্যমান সিদ্ধান্তহীনতা। গৌতমকে গ্রহণ করে সব অনিশ্চয়তার মীমাংসা হতে পারত।... কেন তার মনে হয়েছিল ঢাকাতেই থাকতে হবে? দেশবিভাগের পর ভারতে মুসলমানদের অবস্থান অনিশ্চিত? সেই অনিশ্চিতির ভয়ে সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রেমকে ভাসিয়ে দিল! (রাজিয়া, ২০০৪ : ৫৩৭)

আসলে তখন মুসলিম মেয়ে হিসেবে আমিনার মনে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার কাজ করেছিলো। কুড়ি বছর পরে গৌতমের সাথে দেখা হওয়ার পরে আবারও সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের কারণে আমিনা নিজেই আবার আনিসের অসুখী সংসারে ফিরতে চায়। কারণ সে জানে তাদের এই সম্পর্ক ধর্মীয়ভাবে বিরোধাত্মক। প্রেম ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত না দেখে হলেও ভিন্ন ধর্মের বিয়ে কখনো সামাজিক স্বীকৃতি পাবে না। প্রকৃতঅর্থে উনিশ-বিশ শতকে এমনকি একুশ শতকের আধুনিক সমাজেও হিন্দু-মুসলিম বিয়ে সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া অসম্ভব। বিশ শতকে বাংলা জনপদে পাশাপাশি বসবাসরত হিন্দু-মুসলিম এই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ের ঘটনা সম্বন্ধে গোলাম মুরশিদ লিখেছেন :

[...] বিশ শতকে এসে এ রকমের বিয়ের খবর জানা যায়। যেমন, এ ধরনের প্রথম ব্যাপক প্রচারিত বিবাহ হয় কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে প্রমীলা ওরফে আশালতা সেনের। কয়েক বছর পরে হুমায়ূন কবির বিয়ে করেন শান্তি দাসকে। এছাড়া প্রথমদিকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক বিয়ে হয়েছে, তার সবগুলোর পাত্র মুসলমান, পাত্রী হিন্দু। এমন কি, বিশ শতকের শেষেও হিন্দু পাত্রের সঙ্গে মুসলমান পাত্রীর বিয়ে খুব বেশি হচ্ছে না। কিন্তু মুসলমান পাত্রের সঙ্গে হিন্দু পাত্রীর বিবাহ খুব অসাধারণ নয়। (গোলাম, ২০০৬ : ২২৫)

পরশুরামের মতে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক আকাঙ্ক্ষা আর সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষা কখনো এক হতে পারে না। অর্থাৎ, সাহিত্যে চাইলে অস্বীকৃত বিষয়কে পরিণতি দেওয়ার ক্ষমতা লেখকের থাকে। কিন্তু ‘সাহিত্যসমাজ মানুষের আর পাঁচরকম সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নয়। সাহিত্যসমাজেও দলাদলি আছে, বকাবকি আছে, যুদ্ধবিগ্রহ আছে, জয়পরাজয় আছে। ইংরেজরা বলে Fight is the salt of existence। সাহিত্যের হাতে এই নুনের কারবার আমরা সবাই করি।’ (প্রমথ, ১৯৯৯ : ১৯৭) রাজিয়া খান নিজেও এই সাহিত্যসমাজ ও সমাজবাস্তবতাকে অতিক্রম করতে চাননি। তাই তিনি সমাজ ও

ধর্মের এই প্রথাগত সংস্কারের নিরিখে উপন্যাসে সমাজ অস্বীকৃত প্রেমের বয়ান করেছেন একদম বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা প্রতিটি চরিত্রকে জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্যে ভিন্নমাত্রা দান করেছে। এই উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ব্যক্তি মানুষ যেমন স্বতন্ত্র, তেমন তাদের জীবনবোধও স্বতন্ত্র। সমালোচকের ভাষায় :

ইনটেরিয়র ডেকোরেশানে রাজিয়া খান তেমন গুরুত্বপূর্ণ হন না কিন্তু কাব্যকৌশলে বুদ্ধির প্রয়োগটি নির্ধারিত গদ্যে ধরা পড়েছে। লেখক বিবরণে তার ছাপ স্পষ্ট। এজন্য একটি শ্রোতের বিপরীতে চলেছেন তিনি। সেটি নিছক আরোপ করে নয়, দার্শনিক সঙ্কল্পনে নন্দিত তার 'syntactive pattern'— যেখানে অপরূপ বাঙময়তা যেমন পেয়েছে তেমনি নিজস্বতাও পেয়েছে। (শহীদ, ২০১৪ : ১৭১)

রাজিয়া খানের 'দ্রৌপদী' উপন্যাসটিও নারী-পুরুষের ভিন্ন জীবনবোধের এক সমাহার। পুরুষবাদী চেতনা ও নারীর জীবন-বাস্তবতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায় এই উপন্যাসে। পুরাণের এক উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রকে এখানে নামকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। দ্রৌপদী, পুরাণের এই নারী চরিত্রটি পাঁচ স্বামীর এক স্ত্রী। যা নারীর বহুগামী যৌনতার ইঙ্গিত করে। কিন্তু রাজিয়া খান এই উপন্যাসে তার সৃষ্ট প্রধান নারী চরিত্র নাজনীন ওরফে নয়নকে আদর্শিক বাঙালি নারীর বিশেষত্বে চিত্রিত করেছেন। একইসাথে এই উপন্যাসে পুরুষের চোখে নারীর মূল্যায়ন ও নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে রয়েছে বিস্তার আলোকপাত। এই উপন্যাসে সমাজস্থিত নারীকে দুই রূপে দেখানো হয়েছে। একদল নিজেদের উগ্র যৌন-বাসনা ও ভোগের বস্তু হিসেবে তুলে ধরে এবং নিজেদের নির্দিধায় পুরুষের শয্যা-সঙ্গিনী হয়ে তাদের যৌনাকাঙ্ক্ষা নিবারণ করে। অন্যদল সমাজে নারী-পুরুষের যৌথ অবস্থানের মধ্য দিয়ে রুচিশীল, মার্জিত পারস্পরিক মর্যাদাপূর্ণ যৌথজীবনে বিশ্বাসী। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর পরিচয় কাম-সামগ্রী রূপে, নারীকে ভোগ্যরূপে পেতে পুরুষ বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এটা স্বীকার্য যে, যৌনতা মানব সমাজের অন্তর্নিহিত মৌলিক সাহজিক প্রবৃত্তি। এই সাহজিক প্রবৃত্তি মানবস্বভাবের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সাথে জড়িত। পরিণত দেহমনের আকাঙ্ক্ষা এই অভীক্ষায় চরিতার্থতা পায়। যৌনতার সুস্থ স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের সূত্রে মানব সমাজের বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারা রক্ষিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যৌনতা সদর্থক। তবুও বিবাহপূর্ব, বিবাহ-পরবর্তী কিংবা বহুগামী যৌনজীবন সমাজ ও ধর্ম স্বীকৃতি দেয় না। সেইসব সমাজ ও ধর্ম অস্বীকৃত যৌনজীবনের অবতারণা ও পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করে রাজিয়া খান এই উপন্যাসে সমাজের এক স্বাভাবিক সত্য তুলে ধরেছেন।

দুইজন পুরুষ চরিত্র ও একজন নারী চরিত্রকে ঘিরে উপন্যাসটির মূল কাহিনি, যেখানে নানা ঘটনা ও পারস্পরিক আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে স্বাতন্ত্র্য জীবনবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তবে আরোও একটি বিষয় এখানে উপস্থাপিত, তা হলো— যৌনতা বিষয়ক বিশ্বাস, সংস্কার ও মতভেদ। নায়িকা চরিত্র নয়ন আধুনিক, শিক্ষিত এবং মার্জিত রুচিশীল বাঙালি নারী, সে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে বসবাসরত। ইংল্যান্ডে বাস

করেও সে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হতে পারেনি। তার বাবা বাঙালি ও মা পাঞ্জাবি; কিন্তু সে নিজেকে সম্পূর্ণ বাঙালি ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তার দুই বন্ধু সোহরাব ও মিহির। দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিদেশে গিয়ে নানান অসিলায় তাদের দেখা ও একসঙ্গে বহু সময় কেটেছে। কিন্তু নয়নকে দুইজন বন্ধু গভীর ভালোবাসার পরও হৃদয়ের কথা বা গোপন চাহিদার কথা বলতে পারেনি। নয়নাকে ঘিরে দুই বন্ধুর এমন অনুভূতি নয়না অনুমান করলেও তা সে কখনো কাউকে প্রশ্ন দেয়নি। অন্যদিকে সোহরাব ও মিহিরের নারী বিষয়ে অতি স্থূল ধারণা থাকা সত্ত্বেও নয়নকে অমর্যাদা বা তার সিদ্ধান্তের কাছে নিজেদের আবেগ প্রকাশ করতে পারেনি। তার একমাত্র কারণ নয়ন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, শালীনতায় বিশ্বাসী, মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন একজন আদর্শ নারী। রাজিয়া খান তাকে আপাদমস্তক এক বাঙালি, সংসারি, পুরুষ শাসিত সমাজের অনুগত আদর্শ নারী হিসেবে নির্মাণ করেছেন। সে স্বাধীনতার সাথে বাইরের জগত ও জীবনের সাথে যুক্ত হয়েছেন যথেষ্ট রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে। তার এই সীমানাবলয়ের কারণেই হয়তো সোহরাব ও মিহিরের তার প্রতি এতো আকর্ষণ। রাজিয়া খান নয়নের জীবনবোধের পরিচয় অনেক যত্নসহকারে করেছেন। তিনি এই চরিত্রের মাধ্যমে যৌনতাকে সুখৈষণার মাধ্যম বিবেচনা করেছেন, কিন্তু একে মানুষের শ্রেয়োনীতি বা সমাজসভ্যতার পরিপোষক মূল্যমানের পরিপন্থী হতে দেননি। তিনি সবসময়ই স্থান-কাল ও পাত্রকে বিবেচনা করেছেন আপন চিন্তার আলোকে।

আবার উপন্যাসিক সোহরাব ও মিহিরের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে এক নারকীয় চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসে নয়নের বিপরীত চরিত্রের একটি চরিত্র হলো শাহানা চরিত্র, সে নারীর সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ। এই চরিত্রটির মাধ্যমেই সমাজের অস্বীকৃত, অথচ অবশ্যম্ভাবী যৌনাচারে লিপ্ত নারীপুরুষের জীবনচিত্র ও পুরুষবাদী চেতনার আত্মসন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শাহানার বহুগামী যৌন-জীবনের কথা ব্যক্ত করে রাজিয়া খান কতিপয় পতিত নারীর জীবনসত্য ব্যক্ত করেছেন। শাহানার নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার সুযোগে ভোগবাদী সোহরাব নিজেকে নির্দেশ ভাবার অজুহাত তৈরি করে। কারণ সমাজে পুরুষ বহুগামী হওয়ার স্বীকৃতি পেলেও নারীর ক্ষেত্রে তা দৃষণীয়। সোহরাবের উক্তিহে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সোহরাবের মন্তব্য :

কী বাঁঝালো, ঝাল আর লোভনীয় ঐসব নারকীয় মেয়েমানুষ। একবার ঐ ধানী লক্ষাগুলোর সংস্পর্শে এলে পবিত্র অল্প মনে হয় বিশ্বাস। অনিরুদ্ধ, অলংঘনীয় তাদের আকর্ষণ-রাজ্য-পদলজ্জাভয়স্বাস্থ্যসুখ সব এক লহমায় কেড়ে নিতে পারে।— নইলে আমি একুশ বছরের ন্যাক্যা বাঙালি সোহরাব খান সেদিন কেমন অবলীলাক্রমে সেই নিশাচর পিশাচিনীর কোমর ধরে বেরিয়ে গেলাম অতগুলো লোকের সামনে দিয়ে— নর্দমার জল নিয়ে তুললাম আমার পরিচ্ছন্ন শয্যায়— তারপর তার অধোত অশ্লীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কড়া দুর্গন্ধে অস্থির হয়েও আমি রতির সাগরে ডুবে রইলাম। অপরিষ্কার কলুষ একটি মুখগহ্বর আর ততোধিক পঙ্কিল, দুর্গন্ধময় আরেকটি সুড়ঙ্গ আমার সমস্ত চৈতন্য ন্যায়-অন্যায়বোধ, সুকুমার বৃত্তি, সৌন্দর্যের উপাসনা— সবকিছু গিলে খেল। (রাজিয়া, ২০০৪ : ৬০১)

ঔপন্যাসিক এই মন্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে কামকাতর পুরুষের কুরুচিপূর্ণ চিন্তা, যৌনরুচিবোধ, নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজে পুরুষ ও নারীর অবস্থানের তারতম্য চিত্রিত করেছেন। ঔপন্যাসিক সামাজিক বিধানের মানদণ্ডে পুরুষ-নারীকে বিচার করে নারী-পুরুষের নৈতিক অবস্থান ও ব্যবধান সম্পর্কেও ধারণা দেন। উপন্যাসে বিধৃত সোহরাবের আরোও একটি মন্তব্য : ‘এই যে আমি অসংখ্য নারীদেহ চষেও এখন বিয়ের বাজারে সুপাত্র- কিন্তু নয়ন এক সন্তানের মা হয়েই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে।’ (রাজিয়া খান, ২০০৪ : ৬০১) অর্থাৎ, সোহরাবের এই মন্তব্যের মধ্যে সমাজের অলিখিত বিধান ও নারীকে অবমাননা করার নানা কৌশল নিহিত। এইসব বিধান সমাজের নামে পুরুষের পুরুষতান্ত্রিক চেতনার ফল ও নারীকে অবদমিত রাখার প্রয়াস। কারণ পুরুষ একাধারে নারীকে ভোগ করতে চায়, অন্যদিকে নারীর দৈহিক পবিত্রতার খোঁজ করে।

শুধু পুরুষ নয়, নারীর দৈহিক পবিত্রতা নিয়ে নারীর নিজের মনেও নানা রক্ষণশীল মনোভাব বিদ্যমান। নারীর মানসিক ও সামাজিক সংস্কার নিয়ে একটি মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য : ‘আমাদের নারীদের জীবনে সবচেয়ে বড় সঙ্কট সামাজিক সংস্কার। সব রকমের অনুশাসনের মধ্যে থেকে তাদের প্রমাণ করতে হয় যে তারা যে-কোনও অবস্থাতেই ঘুণে ধরা দাম্পত্য, বৈধব্য, সমাজের সকল বাতিল নিয়মের গণ্ডিতে থেকেও নিজের সতীত্ব বজায় রেখেছে।’ (মিনা, ২০০৫ : ৩২) বিশেষকরে মধ্যবিত্ত বাঙালির পারিবারিক রক্ষণশীলতার আরেকটি অভিব্যক্তি হলো নারীকে সেবিকারূপে দেখা। (সুমিতা, ২০১০ : ১১৫) রাজিয়া খানের ‘পাদবিক’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রওশন অকাল বিধবা এবং সে বিবাহিত জীবনে ও বৈধব্যজীবনে তার সতীত্ব রক্ষার বিষয়ে সচেতন থেকেছে। কারণ সে জানে স্বামীহীন বৈধব্যজীবনে স্বামীর দুইটি সন্তানের ভবিষ্যৎ তার সতীত্বের কঠিন ব্রত পালনের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া সে জানে নর-নারীর যৌনমিলনের অনিবার্য দায় দৈহিক কারণে নারীকেই বহন করতে হয়। প্রকৃত অর্থে রওশন প্রথাগত পুরুষতন্ত্রে সমর্পিত নারীসত্তা। রওশনের এই জীবনচেতনাকে সমর্থন করেন রাজিয়া খান। তার মতে, সামাজিক দায়বদ্ধতা ছাড়া নর-নারীর যৌনজীবনের পরিণাম ভয়াবহ। এক্ষেত্রে রাখীর একটি মন্তব্য : ‘যৌনব্যাপি, সন্তানসম্ভবা, কেলেকারি, দুর্নাম- এগুলো কিনে আমার কী এমন সুখটা হবে বলতে পার? তাই স্বামী নিয়ে ঘর করা না হলে চুপচাপ একা থাকা ভাল। নিয়মানুসারের মধ্যে থাকলে, আত্ম-সম্মানবোধ থাকলে ফাঁসবার আশঙ্কা খুব কম।’ (রাজিয়া, ২০০৪ : ৬৯৩) রওশন ও রাখীর জীবনচেতনার এই উপলব্ধি থেকে বোঝা যায়, বিকৃত যৌনজীবনের থেকে নারীদের নিজেদের রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রেম নামক প্রবঞ্চনার অন্তরালে পুরুষের ভোগের বস্তু হয়ে যৌনজীবন কখনো সমাজস্বীকৃত নয়। তবে সমাজের সকলের জীবনবোধ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক হবে না, এটাই স্বাভাবিক। তাই সাহিত্যে

সমাজস্বীকৃত বা অস্বীকৃত জীবনবোধের বয়ান নারী ও পুরুষের জীবনযাপনের সীমানা সমাজে ভিন্ন রূপে প্রবাহিত। যৌনতার প্রকাশ ও যৌন স্বাধীনতার চর্চা সমাজস্বীকৃত নয়, তবে সাহিত্যে তা নানাভাবে উপস্থাপিত। এইক্ষেত্রে অমর্ত্য সেনের একটি তত্ত্বের কথা স্মরণযোগ্য, যা ‘অসম্ভব তত্ত্ব’ নামে পরিচিত। অমর্ত্য সেনের তত্ত্বানুযায়ী তিনি একটি সমাজের কথা ভেবেছেন যেখানে জনাব ক (অতিশয় সাধু) একজন নীতিবাহী মানুষ যে চান না যে খ (কামুক মনোভাবসম্পন্ন) এর মতো ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির *লেডি চের্টালিজ লাবার* পড়ে গোল্লায় যাক। অন্যদিকে খ এতই দুর্নীতিপরায়ণ যে সে আনন্দলাভের চেয়ে অন্যের কামপ্রবৃত্তি উস্কে দিতে বেশি আগ্রহী। আর তাই তিনি ক এবং খ কেবল নিজ নিজ অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবে এমন অবস্থার চেয়ে দু’জনের নাক-গলানোর ওপর জোর দিয়েছেন। (মনজুরুল, ১৯৯৯ : ২০৭) রাজিয়া খানের ‘পাদবিক’ উপন্যাসের চরিত্রগুলো এই দুই জীবনবোধের বলে মনে হয়।

রাজিয়া খান কাহিনি-নির্মাণে ঘটনার চেয়ে ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় গুরুত্ব দিয়েছেন অধিক। তাঁর আখ্যান বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক হলেও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ পদ্ধতির প্রয়োগ বিদ্যমান। সংলাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আধুনিকমনস্কতার ছাপ স্পষ্ট ও যথেষ্ট নিরীক্ষামূলক। ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তিনি পাঠকের কাছে যে বার্তাটি দেন তা লেখক হিসেবে রাজিয়া খানকে অনন্য করে তোলে। তিনি তাঁর চরিত্রকে অসীম সাহসে সংস্কারমুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কোনোভাবে অগ্রহণযোগ্য করে তোলেননি। সর্বজন দৃষ্টিকোণের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার চরিত্রলোকের বহুকৌণিক সংকট উন্মোচনের সহায়ক হয়েছে। সমালোচকের ভাষায় :

রাজিয়া খান জীবনের চেতনা-প্রতীতির সঙ্গে বিশ্লেষণের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন এর প্রক্ষেপে। ঘটনা এবং প্রতিক্রিয়ার ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে জীবনের বাস্তব প্রচ্ছদকে স্বীকার করেছেন। রাজিয়া খান বিশ্লেষণমূলক। উপন্যাসবিধৃত বিমূর্ত চেতনাপুঞ্জকে বিমূর্ত অবয়বে প্রকাশের পরিবর্তে চেতনার মূর্ত রূপায়ণের প্রতি তাঁর আগ্রহ সমধিক। (আকরম, ১৯৮৮ : ২৬)

আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে বলা যায়, রাজিয়া খানের উপন্যাসবিধৃত পাত্র-পাত্রীরা প্রেম ও শুশ্রূষা সন্ধানী। কিন্তু পরিণামে বিকার ও অসুস্থতায় নিমজ্জিত। বিভাগান্তরকালের জটিল সমাজগঠন, দেশবিভাগজনিত সংকট, প্রচলিত মূল্যবোধের বিপর্যয়, নবমূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধা-সংশয়-অস্থিরতা তাঁর উপন্যাসের চরিত্র চেতনায় ক্রিয়াশীল। বস্তুজগতের সমাজসংস্কারের অনিবার্য সংঘাতে রাজিয়া খানের সৃষ্ট চরিত্রগুলো পারস্পরিক নৈকট্য স্থাপনে ব্যর্থ। প্রেম বা প্রাপ্তির মূলকেন্দ্রে আবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও আধুনিককালে এসেও তারা অস্তিত্বসংকটের গোলকবঁধায় নানারূপ জটিলতার শিকার হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির বিশেষ স্তরে এসে আধুনিকমনস্ক হয়েও তিনি যৌনতা সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত হতে পারেননি।

যৌনতা মানবস্বভাবের মৌলিক অংশ এবং জীবনের বাস্তবতার সাথে একসূত্রে গাঁথা। যৌন অভিজ্ঞাকে একেবারে প্রচ্ছন্ন অপ্রকাশিত রেখে বাস্তবধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়।

কিন্তু তার উন্মোচনে শিল্পবিবেকী লেখকের মাত্রাজ্ঞান, শিল্পবোধ ও রসবোধ বাঞ্ছিত। যৌন-অভিজ্ঞতার প্রকাশ যখন সামগ্রিক জীবনছবির ক্যানভাসের অনিবার্য খণ্ডচিত্র হয় তখন তা নূতন কোনো বোধ ও উপলব্ধির উন্মোচ ঘটায়। তাই হয়তো অস্বীকৃত প্রেমের বয়ানে তিনি যৌনতাকে প্রকাশ করেছেন কিন্তু বৈধতা দেননি। আবার স্বাতন্ত্র্য জীবনবোধের বৈশিষ্ট্যকে বিশিষ্টতা দানেও রাজিয়া খান বারবার সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের মূলকে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। তিনি মূলত স্ব-সমাজের বাস্তবতাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। সুতরাং, তার উপন্যাসে আক্ষরিকঅর্থেই সমাজ অস্বীকৃত প্রেম ও স্বাতন্ত্র্য জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটেছে।

সহায়কপঞ্জি

- আকিমুন রহমান (১৯৯৫)। ‘আমাদের উপন্যাসে নারীভাবমূর্তি’, *একুশের প্রবন্ধ* ’৯৫। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- ওয়াকিল আহমদ (১৯৯৭)। *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- গোলাম মুরশিদ (২০০৬)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ১ম মুদ্রণ, অবসর, ঢাকা।
- নাসরীন জাহান (২০০৫)। *নারীর প্রেম : তার বিচিত্র অনুভব*। ২য় মুদ্রণ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।
- প্রমথ চৌধুরী (১৯৯৯)। ‘কাব্যে অশ্লীলতা ও আলংকারিক মত’, *শিল্প সাহিত্যে নগ্নতা যৌনতা অশ্লীলতা* [সম্পা. ফয়জুল লতিফ চৌধুরী]। দিব্য প্রকাশ, ঢাকা।
- বদরুল হাসান (১৯৯০)। *উনিশ শতক: নব জাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস*। জগৎমাতা পাবলিশার্স, কলকাতা।
- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৯৯৩)। ‘স্বীজাতির অবনতি’, *রোকেয়া-রচনাবলী* [আবদুল কাদির সম্পাদিত]। ১ম মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- মিনা ফারাহ (২০০৫)। *মধ্য বয়সের সঙ্কট*। ২য় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
- রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- রাজিয়া খান (২০০৪)। *উপন্যাসসমগ্র*। ১ম প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
- রাহুল সাংকৃত্যায়ন (২০১২)। *মানব সমাজ*। হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।
- শহীদ ইকবাল (২০১৪)। *কথাশিল্প : ঈষৎ-বীক্ষণ*। অক্ষর প্রকাশনী, ঢাকা।
- সুমিতা চক্রবর্তী (২০১০)। *উপন্যাস বহুরূপে*। অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।
- সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৮৮)। ‘স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ প্রসঙ্গ উপন্যাস’, *একুশের প্রবন্ধ* ৮৮। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (১৯৯৯)। ‘সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা’, *শিল্প সাহিত্যে নগ্নতা যৌনতা অশ্লীলতা* [সম্পা. ফয়জুল লতিফ চৌধুরী]। দিব্য প্রকাশ, ঢাকা।
- হুমায়ুন আজাদ (২০০৫)। *নারী*। ৩য় সংস্করণ, ১১শ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
- Carl G. Jung (1984), *Dream Interpretation and the Relevance of Dreams*, “Modern Man in Search of a Soul”. (<https://www.cambridge.org/core/journal/philosophy/article>)
- G. E. Moore (1876), *Principia ethica*, Cambridge University Press. London.
- Sorn Aalye Kirekegaard (1946), “Works of love”, Translated by D. F. Swenson & L. M. Swenson, C.A. Reitzel, Denmark.
- T. S. Eliot (1999), *Selected Essays (1917-1932)*, Faber, London.

মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ

মাহিত্যিক

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬ ব. ৥ ১৯৫৯ খ্রি.

ru.ac.bd/bangle/bangle-journal-shahittyki

Print : ISSN 1994-4888

বর্ষ : ৬৬ সংখ্যা : ৫৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ ৥ মে ২০২৫

প্রকাশকাল : মে ২০২৫

প্রবন্ধ জমা : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রবন্ধ গৃহীত : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পৃষ্ঠা : ৪১-৫৭

সানাউল হকের শিশুসাহিত্য

মো. সুজা উদ্-দৌলা

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

ই মেইল : suza.rubd@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বিভাগান্তর বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের ধারায় সানাউল হক উল্লেখযোগ্য নাম। কবিতা ও অন্যান্য গদ্য-রচনার পাশাপাশি তিনটি শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ এবং একটি শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। এসব রচনার মধ্য দিয়ে তিনি যেমন শিশু-মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছেন তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। জীবনঘনিষ্ঠ এসব বিষয় সানাউল হকের শিশুসাহিত্যে কতোটা এবং কীভাবে উঠে এসেছে তা এ-প্রবন্ধে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল শব্দ

সানাউল হক, শিশুসাহিত্য, শিশুতোষ ছড়া, শিশুতোষ গল্প।

মানুষ জন্মগ্রহণের পর যে-জীবনপ্রাপ্ত হয় সেটি শৈশবকাল। জন্মকাল থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শৈশবকাল। তারপর থেকে ষোল কিংবা সতের পর্যন্ত কিশোরকাল— যার ভিত্তি রচিত হয় শৈশবে। যে কোনো মানুষের জীবনে এটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। কেননা সারাজীবন মানুষ হিসেবে সে কেমন হবে এ-সময় তার ভিত্তি রচিত হয়। আর এক্ষেত্রে তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করে থাকে পরিবার ও চারপাশের পরিবেশ। ‘বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ তার মানুষ আর সে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই পড়ে শিশুর পর্যায়ে।’ (তৈয়বা, ১৩৯০ : ১১) শিশুরাই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কর্ণধার। একদিন তাদের হাতেই থাকবে বাংলাদেশ সুন্দরভাবে পরিচালনার দায়িত্ব। তাই এদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে সবার আগে শিশুদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য তার অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির মধ্যে তাদের বিষয়-আশয়কে গুরুত্ব দেওয়া অনিবার্য। এক্ষেত্রে শিশুসাহিত্য হয়ে উঠতে পারে শিশুর জীবন ও জীবনের প্রকাশ-বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। শিশুসাহিত্য হচ্ছে সেই সাহিত্য যেখানে শিশুর জীবন ও তার ভালো লাগা-মন্দ লাগার বিষয়গুলো সুন্দর ও সুচারুরূপে পাঠকের সামনে উঠে আসতে সক্ষম। কিন্তু ‘বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্র বড়ই নাজুক।’ (শহীদ, ২০০৮ : ৪৯৯) দীর্ঘ যাত্রাপথ অতিক্রম করে বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা সমৃদ্ধি লাভ করলেও শিশুসাহিত্যের প্রসার ঘটেছে সে তুলনায় সামান্য। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল শৈশব সাধনা।’ (মনিরা, ২০০৫ : ৪০৭) তাঁর অনেক ছড়া, কবিতা, গল্প উপন্যাসে শিশুদের জীবনাচার ও অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) এবং পরবর্তী সময়ে ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), জসীম উদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬) ও অন্য অনেক লেখক শিশুসাহিত্যে তাঁদের অবদান রেখেছেন। তাঁদের কারো কারো লেখায় শিশুমনের আবেদন প্রাধান্য পেলেও অধিকাংশ লেখকই এ-বিষয় উপেক্ষা করেছেন। সানাউল হক (১৯২৪-১৯৯৩) এ-সময়পর্বের শিশুসাহিত্যের ধারায় অন্যতম লেখক। তাঁর যে অনবদ্য সৃষ্টিসম্ভার সেখানে নির্মল শিশুসাহিত্যের অন্তর্লীন সাক্ষাৎ মেলে।

২

সানাউল হক চল্লিশের দশকের লেখক হলেও তাঁর শিশুসাহিত্য রচনার সময়কাল আরও বিলম্বে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তিনি যখন শিশুসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন তার অনেক পূর্বেই বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনে তাঁর উদ্ভাসন ঘটে। শিশুসাহিত্য রচনার পূর্বেই লেখকের একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সানাউল হক রচিত শিশুসাহিত্য সংখ্যা চারটি। সেখানে শিশুর মনোরঞ্জনমূলক তিনটি ছড়াগ্রন্থ ও একটি গল্প-সংকলন আছে। ছোট্ট পরিসরের এ ধারায় তাঁর তিনটি গ্রন্থে মোট ছড়ার সংখ্যা ৬২ টি। তাছাড়া তাঁর গল্প-সংকলনে সাতটি গল্প আছে। বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের ধারায় সানাউল হক

খুব একটা পরিচিত নাম না-হলেও এক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে সানাউল হক বাংলাদেশের ঐতিহ্যের প্রতি এক ধরনের দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে তাঁর এ জাতীয় রচনার মধ্যে গভীর জীবনবোধের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আর তাই বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের প্রবহমান ধারায় সানাউল হককে একজন নিষ্ঠাবান ও শক্তিশালী লেখক হিসেবে অভিহিত করা হয়। অন্য সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি তাঁর শিশুসাহিত্য রচনার একটিই কারণ- তা হলো শিশুদের প্রতি অপরিস্রব ভালোবাসাবোধ। সেই ভালোবাসা দিয়ে সানাউল হক যেসব শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন তা শুধু শিশুমনের খোরাক নিবারণই করে না, পাশাপাশি এগুলো শিশুদের সত্য ও সুন্দরের পথে চলার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পরিমাণ ও সংখ্যায় সীমিত হলেও রুচি ও উৎকর্ষের বিচারে সানাউল হকের শিশুসাহিত্য শিশু-মনস্তত্ত্ব গ্রন্থে অনন্য। যথার্থ জ্ঞান ও বোধকে কাজে লাগিয়ে তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে তিনি শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন। সানাউল হকের চিরায়ত লেখক ও ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়ে উঠেছে শিশুসাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে। শিশু-মনস্তত্ত্বের সার্থক ও সুন্দর প্রতিফলন লক্ষ করা যায় লেখকের “রং বেরং” নামক ছড়ায়। এটি ‘ছেলে বুড়োর ছড়া’ গ্রন্থের অন্যতম একটি ছড়া। পৃথিবীর যে সৌন্দর্য সে সৌন্দর্যকে আরো বেশি বিকশিত করে রঙ। রঙয়ের ব্যবহারের ফলে যে কোনো কিছুই বেড়ে যায় সৌন্দর্য; হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়। তাছাড়া নিসর্গের বর্ণবহুলতা মানুষের মধ্যে ক্রমাগত এক ধরনের আকর্ষণ-আবহ ছড়িয়ে পড়ে। মেঘলা দিনে রংধনুর সাত-রং দেখে সবাই মুগ্ধ হয়। সানাউল হক শিশুসাহিত্যিক হিসেবে জীবনের এই সত্য ও সুন্দরের কথা ছড়ায় ছড়ায় প্রকাশ করেছেন। গ্রামীণ জীবনঘনিষ্ঠ নানা বিষয়ের সঙ্গে রঙয়ের সম্পর্ক কেমন, রঙ কীভাবে জীবনকে আরো রঙিন করে তোলে তা জানাতে সানাউল হক লিখেছেন :

রং বেরংয়ের লুকোচুরি, নানান রংয়ের খেলা
সাত সকালে নদীর চরে রং ফানুসের মেলা
রংয়ে রংয়ে কত ছবি, গল্প পাশাপাশি
মেঘের মুখে দেখেছো নাকি রামধনুকের হাসি।
কালো রাতের বুকের মানিক নীল আকাশের তারা
জোনাক-জ্বলা বাঁশের বনে ওৎ পেতে রয় কারা।

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৪৯৯)

আধুনিক মানুষের জীবনে যোগ হয়েছে নানা ধরনের উৎসব আমেজ। জন্মদিন পালন করা সে ক্ষেত্রে অন্যতম একটি উৎসব হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের মানুষ জন্মদিনের উৎসবকে বেশ ঘটা করে পালন করে থাকে। এ দিনটি শিশু কিশোরদের মনে একটি ভিন্ন আনন্দবোধের সঞ্চার করে। আধুনিক সময়ের শিশুরা তাদের জন্মদিনকে উপভোগ করতে চায়। বন্ধু ও পরিজনকে নিয়ে এ দিনটি তারা পালন করতে চায়। বর্তমানকালে সব বয়সের মানুষ জন্মদিন পালন করলেও শিশুরা এক্ষেত্রে অনেক

এগিয়ে। শিশুর অভিভাবকগণ তাদের সন্তান-সন্ততিকে এদিনে সর্বোচ্চ আনন্দদান করতে চায়। আবেগ-আপ্ত হয়ে তারা আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুমহলের পাশাপাশি প্রকৃতির উপাদানকেও যেন আমন্ত্রণ করতে চায়। “আমন্ত্রণ” নামক ছড়ায় তারই প্রমাণ দিতে চেয়ে কবি বলেন :

খোকামনির জন্মদিনে আমরা তাদের ডাকি:
আয়রে চাঁদ আয়রে ফুল লক্ষীবনের পাখি।
দেখ না এসে একটু চুপি উঠোনে ক্ষণিক নেমে
একটি মুখে কেমন করে সব আলো যায় থেমে।
দূর আকাশের হে অতিথি, তাদের আলোর থেকে
খোকার মুখে আদর করে একটুকু দিস মেখে।

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫৪৮)

মানুষ তার কর্মব্যস্ততার কারণে অবসর গ্রহণের খুব একটা সুযোগ পায় না। ব্যস্ত মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে কাজের মধ্যে নিয়োজিত থাকে। ফলে অনেক সময় অনেকে প্রাণ খুলে কথা বলার অবসরও পায় না। এই কর্মময় ব্যস্ত এবং একঘেয়েমি পরিস্থিতির মধ্যেও মানুষের জীবনে অনেক সময় হাস্যরসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু পৃথিবীর সব হাসির অর্থ এক নয় এবং সবার হাসিও একরকম নয়। বহু বিচিত্র হাসির ধারণা দিতে গিয়ে সানাউল হক তাঁর “হাসির কুঠি” নামক ছড়ায় লিখেছেন :

অট্টহাসি হাসলে পরে সবাই ওঠে চমকে
বিকট হাসি মধ্য পথে হঠাৎ যায় থমকে
চাঁদের হাসি বাঁধ মানে না, কনের হাসি মিষ্টি
রোদের হাসি পালায় ছুটে যেম্নি শুরু বিষ্টি।
দরাজ হাসি সস্তা দরে বিকোয় যারা ধনি
হাসির বারুদ কারো চোখে গুমরে ওঠা বহি
বক্র হাসি কষ্ট করে বিলোয় যার মুষ্টি
মুচকি হাসি শীতের রোদ কে রাখে তার কুঠি।

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫৫৪)

সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল বন্ধন ও কোলাহলকে উপেক্ষা করে শিশুরা তাদের আপন ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। শিশুরা সবসময় দুরন্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাদের দুরন্তপনার কাছে পৃথিবীর সব কিছুই তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়। জীবনের চারপাশের নিয়মের শৃঙ্খল ভেঙ্গে তারা আপন ভুবনে ডানা মেলে উড়তে চায়। এই বৈশিষ্ট্য সব শিশুরই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। চঞ্চল ও দুরন্ত বালক বালিকারা ছুটে যেতে চায় অজানার উদ্দেশ্যে যেখানে পড়ালেখার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। এটি শিশুর কোনো দোষ নয়, বরং এ এক সহজাত প্রবৃত্তি। শিশুদের এই চঞ্চল্য মানুষকে একটু আধটু বিরক্ত করলেও অধিকাংশ সময়ই মানুষ তা সহজভাবে মেনে নেয়। কেননা শিশুর কোমলতা ও দুরন্তপনা দেখে মানুষের ভেতরে এক ধরনের আনন্দ সঞ্চারিত হয়। তাছাড়া শিশুদের হাসিমুখে পৃথিবীর অপার সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। সানাউল হক

শিশুর সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখের ছবি এঁকেছেন “একটি মেয়ে” নামক ছড়ায়। এখানে তিনি লিখেছেন :

দুধের মেয়ে, সরের মেয়ে
রাঙা মাড়ির ফাঁকে
মানিক জোড় লুকিয়ে রেখে
হাসতে শুধু থাকে।

হাসির মেয়ে বাঁশির মেয়ে
ছোট্ট মেয়ে কাঁচা
দুষ্ট মেয়ে কাঠবেড়ালি
দেখবে এসো নাচ।

কুড়ির মেয়ে ফুলের মেয়ে
পাপড়ি মোড়া প্রাণ
মিষ্টি মেয়ে দৃষ্টি মেলে
মুখটি তুলে চান।

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫০২)

সানাউল হক “একটি মেয়ে” ছড়ায় ছোট্ট শিশুর হাসির মধ্যে লুকিয়ে থাকা পৃথিবীর অপার সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। আবার “আজব ব্যামো” নামক ছড়ায় এসে মানুষের রোগমুক্তির মহৌষধ হিসেবে অভিহিত করেছেন হাসিকে। একজন জাপানি মানুষের হঠাৎ অসুস্থ হওয়া এবং তাঁর সুস্থতা নিয়ে আসার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে হাসির মন্ত্র দিয়ে হাসানোর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক লিখেছেন :

দুষ্ট ছেলে কোথায় ছিলো
মন্ত্র জানে কি জানি
পিচকারিতে ঢাললো নাকে
ড্রেনের থেকে কি পানি।

সুড়সুড়িতে পালায় ব্যামো
অগ্নি গুরু লাফানি
কোথায় তুমি, কোথায় আমি
হাসছে শুধু জাপানি ॥

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫০৫)

‘ছেলে বুড়োর ছড়া’ গ্রন্থের ছড়াগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির প্রতি সানাউল হকের গভীর আগ্রহ ও উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে। সানাউল হকের শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলোর ব্যক্তি অভিজ্ঞতার সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর এসব ছড়ার মধ্যে দিয়ে। বর্ষাকালে বাংলার আকাশ নতুন একরূপ লাভ করে। সানাউল হকের চোখে দেখা সেই বর্ষাশ্রুত দিনের কথা উঠে আসে তাঁর “আষাঢ়ে ছড়া” নামক ছড়ায়। এখানে লেখকের উচ্চারণ :

টুপ্ টাপ টুপ্ টাপ
রাতদিন বারে কি

আষাঢ়ের জরিমানা
জলে শোধ হবে কি।
বির বির মিন মিন
কেন এই কান্না
ইলিশের ভাজা ডিম
হয় নি কি রান্না।
ঝুপ ঝুপ দাড় টেনে
মল্লার গায় কে
সপ্ সপ্ ভিজে মাঠে
ঠ্যাং তুলে ধায় কে!

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫০১)

সানাউল হক ছড়ার মাধ্যমে শিশুদের বাস্তবসম্মত জীবনের কাছাকাছি রাখার প্রচেষ্টা করেছেন। কল্পনা বিলাস এড়িয়ে তিনি সব সময় শিশুদের জীবন সচেতন করে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতিপ্রেমী লেখক ছড়ার মধ্য দিয়ে চৈত্রের দাবদাহ সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দিয়েছেন। চৈত্রের দাবদাহে জনজীবন হয়ে ওঠে বিপর্যস্ত। প্রকৃতির এই অবস্থা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। গাছের পাতা কিংবা পশু-পাখি থেকে শুরু করে সজীব প্রতিটি প্রাণিই এসময় দুর্ভোগে পড়ে। এমনকি মাটিও ফেটে চৌচির হয়ে পড়ে। কিন্তু জীবন তো গতিময়, আর সেই চলমান জীবনকে চালিত করতে দরকার ফসল ফলিয়ে খাদ্য উৎপাদন করা। যার কারণে এমন সময়ে রোদের আবহেও ফসলের মাঠে কাজ থেমে যায় না। এ রকম দৃশ্য উপস্থাপনে তাই লেখকের উক্তি :

কাঠফাটা খুনি রোদ মাঠ চষে লাঙ্গলে
খানখান পোড়া মাটি ভয়ে ঢোকে ফাটলে
লেলিহান শিখা রোদ তেড়ে আসে তরাসে
ঢকঢক পানি খায় পুকুরের গেলাসে
চড়ারোদ কড়ারোদ বড়ো পাজি মাইরি
টের পাবে যদি পড়ো সাহারার ডাইরি।

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫০৬)

কবি চৈত্রের দাবদাহ অতিক্রম করে পৌছে যান বৈশাখের দারপ্রান্তে। তবে এখানে তাঁর প্রকৃতি প্রীতি ও ফুল-ফলের প্রতি উৎসুক আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির প্রতি কবির প্রেম চিরন্তন। তাঁর কাব্য কবিতার নানা জায়গা জুড়ে সে প্রকৃতি প্রেমের চিত্র ছড়িয়ে রয়েছে। শিশুসাহিত্যের অসাধারণ সৃষ্টি ছড়াগ্রন্থে কবির প্রকৃতিপ্রেম আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিশুর মনোরঞ্জনের জন্যও কবি কখনো কখনো প্রকৃতির কোলে আশ্রয় খুঁজেছেন, লিখেছেন মৌসুমী ফুল-ফলের কথা। ফলের দেশ, ফুলের দেশ বাংলাদেশে মৌসুমী ফলের সমারোহে মানুষের জীবনে একটি ভিন্ন আমেজ তৈরি হয়। ফলের মৌসুমে এখানে নানা ধরনের ফল দেখা যায়। শিশুরা ফলের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। এদেশের নানা ধরনের ফলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখা সানাউল হকের “বৈশাখী” ছড়াটি

শিশুমনে একটি ভিন্ন বোধের সৃষ্টি করে। বৈশাখ মাস ও তার পরবর্তী সময়ের ফলফলাদীর কথা উঠে আসে লেখকের এ ছড়ায় :

বোশেখের শেষাশেষি এলো ঝড় বিষ্টি
নদী খাল ভর ভর জল ভরা দিষ্টি।
মাঠ ভরা ধান পাট সবুজের গালিচা,
ঘাস ফুলে ছেয়ে গেলো ফুলঝড়া বাগিচা।
গাছে-গাছে পাকা আম টুকটুকে সিঁদুরে
টসটসে লিচুগুলো রাতে খায় ইঁদুরে।

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫০৯)

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ হওয়ায় ছয়টি ঋতুর বৈচিত্র্যে এ দেশের প্রকৃতি বৈচিত্র্যময় রূপ ধারণ করে আছে। ঋতুর এই বৈচিত্র্যময়তাকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে গ্রীষ্মকাল (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)। বৈশাখী হাওয়ার ফলে এ সময় প্রকৃতির রূপ হয়ে ওঠে রুম্ম, সৃষ্টি হয় ঝড়ো হাওয়ার। সেই ঝড়ো হাওয়ার কারণে চারপাশ হয়ে ওঠে প্রকম্পিত। গাছ, লতা, ঘাস, পাখি, এমনকি মানুষের জীবনেও এক ধরনের আন্দোলন সৃষ্টি হয়। হাওয়ার সেই কাণ্ড নিয়ে সানাউল হক ছবি এঁকেছেন “হাওয়ার কাণ্ড” নামক ছড়ায়। যা শিশুমনে গভীর আনন্দের সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। কবি লেখেন :

বন থেকে বন ঝড়ো হাওয়ার
চপল দাপাদাপি,
একটুকু রেশ চম্পাবনে
উঠলো মিহি কাঁপি।
চম্পাবেগম চটুল মেয়ে
এক ফুঁয়েতে হেসে
অগ্নি ধপাস টলে
জুঁইয়ের গায়ে এসে।
ছোট্ট মেয়ে পাপড়ি-ফ্রকে
আটকে গেল হাসি,
দুঃস্থ হাওয়ার মন্দ গতি
বল্লে, তবে আসি।

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫১৩)

ঋতু পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন চরমভাবে প্রভাবিত হয়। প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য যেমন ঋতু পরিবর্তনের কারণে বদলে যায়, তেমনি করে মানুষের শরীরের স্বাভাবিক অবস্থারও অনেক পরিবর্তন ঘটে। যার ফলে সাধারণ রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় অনেক মানুষ জীবন। ঠাণ্ডাজনিত রোগ এক্ষেত্রে অন্যতম। সানাউল হক জীবনসচেতন লেখক হিসেবে এ দৃশ্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। লিখেছেন “সর্দি” নামক ছড়া। লেখক এ ছড়ার মাধ্যমে ঠাণ্ডা-লাগা বা সর্দিতে আসলে মানুষের শরীরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। ছড়াংশ হতে :

সর্দিতে নাকে যেই সুড়সুড়ি লাগে
খিলু বলে, রাখ রাখ ভেবে নিই আগে।
হাঁচি বলে, সেকি কথা ওগো মহারাজ
ছেড়ে দিন দুনিয়াটা দেখে আসি আজ।

আপনার মাথাব্যথা রাজ্যের কাজে
অধমের গতিবিধি সেকি রোখা সাজে?
এই বলে হাঁচি যেই দিলো মাথানাড়া-
মহারাজ টলমলো, বলে, শোন দাঁড়া।

অনুন্নে কন তিনি, ওহে ভাই হাঁচি
তুই যদি ছেড়ে যাস আমি কিরে বাঁচি
রাজধানী বানচাল বিলকুল ফাঁকা

এক ফুয়ে থেমে যায় শাসনের চাকা।

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫১৭)

সানাউল হকের জীবন ছিল বহুবর্ণিল অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। গ্রাম থেকে শহর, দেশ থেকে বিদেশ সব পরিবেশ হতে সানাউল হকের মন ও মানস সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের গ্রামের জীবন উপভোগ করেছেন, শৈশবের সোনালি দিনগুলো গ্রামে অতিবাহিত করেছেন। গ্রামে বসবাস করার ফলেই তিনি দেখেছেন গ্রামীণ শিশুদের জীবন কত বেশি কোলাহলপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় হয়ে থাকে। গ্রামীণ দুরন্ত ছেলেমেয়ের জীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সানাউল হকের ধারণা থাকায় তিনি জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন বিদেশি ছেলেমেয়েদের জীবনও এমনতর হয় কি-না। তাই কবির জিজ্ঞাসা :

দেশ বিদেশের ছেলে মেয়ে বলো কেমন ওরা
ছতোম দেখে তাদেরও কি চোখটি ছানাবড়া?
যেদিন ঘোর বাদলা দিনে সময় নাহি কাটে
ব্যাঙের ছাতা মাথায় দিয়ে ওরা কি যায় মাঠে?
লাটিম যেই ঘুরতে থাকে উপড় করে চোখ
ঘুর ঘুর ঘুর তাদেরও কি মাথায় চাপে ঝাঁক?
রঙিন ঘুড়ি নীল আকাশে উড়িয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
আকাশমুখী তারাও কিরে লাটাই ধরে থাকে?

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫০৯)

অজানাকে জানা এবং অচেনাকে চেনার আগ্রহ শিশুদের স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য। তাই তারা মুক্তমনে অনেক কিছু জানতে চায়, বন্ধনহীন জীবন কামনা করে। কিন্তু এ দেশের শিশুদের প্রতি অভিভাবকদের অধিক যত্নবান ও শাসন পরিচালনার দৃশ্য কবির চোখে পড়ে। এর কিছু ভালো দিক থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে অতিরিক্ত শাসন করায় তাদের ভেতরে এক ধরনের ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আমাদের চারপাশের পরিবারগুলোতে শিশুদের এমন শাসন পদ্ধতি দেখে কবির অভিযুক্তি :

মায়ের কাছে থাকলে বলো কুনো
মা-বেড়িয়ে আসলে বলে বুনো।

থাকলে ঘরে বাইরে বলো যেতে
নামলে পথে অমনি ওঠো তেতে
লক্ষীছাড়া নষ্ট ছেলে বলে,
কখনো বা ভয় দেখানোর ছলে
একলা ঘরে দাও যে এটে খিল!
কি মুস্কিল! কি মুস্কিল!

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫১১)

বাংলাদেশ নামটির সঙ্গে মিশে আছে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের এক জীবন্ত ইতিহাস। দেশভাগের পর থেকে একটা বৈষম্যময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সূচিত হয় বাংলাদেশের পথযাত্রা। সে যাত্রা ক্রমাগত ব্যাহত হতে থাকে শাসক নামধারী শোষকের বৈষম্যমূলক আচরণে। ফলে এদেশের মানুষ ক্রমাগত সংগ্রামী হয়ে ওঠে। আর সেই সংগ্রামের চরম পরিণতি ঘটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের ইতিকথা নিয়ে এদেশে নানা ধরনের সাহিত্য রচিত হয়েছে। কাব্য-কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্য ধারার মাধ্যমে এদেশের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে থাকে। সচেতন লেখকের দক্ষতার মধ্যে দিয়ে এ কাজটি সম্পন্ন হয়। ‘মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যে ব্যাপক রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়।’ (বিশ্বজিৎ, ২০০৯ : ৩৪০) অনেকের মতো করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ছড়ার মাধ্যমে শিশুদের সামনে তুলে ধরার কাজটি করেছেন সানাউল হক। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সানাউল হকের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। অর্থাৎ লেখকের পরিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র সচেতনতাকালে এদেশে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তাই যুদ্ধের দামামা তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আর সেই জীবনী অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বর্বরোচিত হত্যায়ত্ত ও নির্মমতার ছবি এঁকেছেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ‘ছড়া ঘরে ঘরে’ গ্রন্থে।

উনিশশো একাত্তর সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে লেখা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছড়ায় লেখক শিশুদেরকে এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী অনেকটা আচমকায় এদেশের নিরীহ জনগোষ্ঠীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি খানসেনাদের এরকম দস্যুময় উপস্থিতিতে বাঙালির জীবনে চরম বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তারা এদেশের সাধারণ মানুষের জান-মাল সবকিছু বিপন্ন করে তোলে। কবি এদেশের নিরীহ মানুষের জীবনের সেই পরিস্থিতি তুলে ধরে লেখেন :

আমার মেয়ের হাতের বাস্ত্র
আমার দলিল রশিদ ট্যাক্স
ড্রয়ার আলনা পানদান মা'র
গোপন-আপন সব ছারখার

আমার বাড়িতে খানতল্লাশি
খানসেনা আলবৎ
দিন-দুপুরে ইয়া কেরামতি
সিমারের হিম্মৎ॥

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫২৩)

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা বিশ্ব-ইতিহাসের অনেক নৃশংসতাকে ছাড়িয়ে গেছে। তাদের সেই নির্যাতন ও গণহত্যার কথা মনে করে আজকের দিনেও মানুষ আতকে ওঠে। পাকবাহিনী শুধু মানুষকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা এদেশের অনেক নারীর সম্মম ছিনিয়ে নিয়েছে। তাদের সেই অত্যাচারের নির্মমতার কথা শিশুদের অবহিতকরণের মানসে সানাউল হক ছড়ার শব্দে শব্দে বলেন :

ধর্ষিতা নারী আমার স্বদেশ
যেখানে রূপের নেই অবশেষ
তুলসী মঞ্চঃ নেভানো প্রদীপ
সিঁথির সিঁদুরে মুছে গেছে টিপ
সোনার বাংলায় ওরা হানাদার
হার্মাদ বদখৎ
ওরা নিল কেড়ে আমার পরম
ভগ্নির ইজ্জৎ॥

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫২৪)

হানাদারদের অত্যাচারের ফলে নিরীহ বাঙালির মুখের হাসি আড়াল হয়ে গেছে চোখের জলে। তারা বাংলাদেশকে জনশূন্য করতে চেয়েছিল। শোষকদের সেই করাল গ্রাস থেকে বাঙালির মুক্তির পথ রচিত হয় দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধ-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। পাকসেনারা যে বাংলাকে জনশূন্য করতে চেয়েছিল তার বাস্তব দৃশ্য শিশুদের প্রত্যক্ষগোচর করতে চেয়েছেন কবি। একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাসে বাংলাদেশ গ্রাম গ্রামান্তর পথ-ঘাট-মাঠ এক ধরনের ধ্বংসস্তম্ভে পরিণত হয়। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি গ্রাম, নগরে ধ্বংসের চিহ্ন অঙ্কিত হতে থাকে। অসংখ্য জায়গায় মানুষের লাশ ও রক্তের চিহ্ন দেখা যায়। সেই দৃশ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সানাউল হকের ছড়ার ভাষায় :

মন্দির-মাঠ গঞ্জ-বাজার
ছিন্ন ভিন্ন কুঞ্জ খামার
রক্ত ছোপানো আবাস-নিবাস
পথে-প্রান্তরে বাংলার লাশ
স্বদেশ আমার ওদের প্রবেশ
ব্যভিচার বদখৎ
আমাকে পোতবে, তোমাকে গাঁথবে
সাঁড়াশির মরহত ॥

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫২৬)

দেশভাগের পর থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার নির্যাতন শোষণ বঞ্চনার মধ্যে দিনযাপন করতে করতে বাঙালিরা এক সময় প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। মুক্তির নেশায় বাংলাদেশের মানুষ পথে নেমে আসে। সমস্ত ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে তারা দেশকে স্বাধীন করার আকাঙ্ক্ষায় আত্মনিয়োগ করে। বাংলাদেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ দেশকে স্বাধীন করার আহ্বানে একমত ধারণ করে। বাংলাদেশের শ্যামল মাটিতে যুদ্ধ-সংক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে কবি এক সময় হতাশ হয়ে উঠেন। স্বাধীনতার সূর্যের দেখা পাবেন কিনা এ ভাবনায় তাঁর মনে সৃষ্টি হয় অন্যরকম এক আশঙ্কার। তবে কবির সে আশঙ্কা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, বরং হতাশার কালোমেঘ মুহূর্তেই কেটে যায়। জীবনের এ চরম অভিজ্ঞতার কথা সানাউল হক সরল অভিব্যক্তিতে শিশুদের জানাতে চেয়েছেন। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দিনে এদেশের মানুষ যে প্রতিরোধ-প্রতিশোধমুখর হয়ে ওঠে তার মধ্যেই বিজয়ের আশাবাদ পরিলক্ষিত হয়। বাংলার দামাল ছেলেদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাবোধ ও সংগ্রামের মধ্যে কবি একটা শুভ ভবিষ্যতের হাতছানি দেখতে পান। কবির আশাবাদ নিষ্ফল হয়ে যায়নি। এদেশের মুক্তিকামী মানুষের মুক্তি আকাঙ্ক্ষার ফলে ও তাদের সাহসী প্রতিরোধের কারণে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা পিছু হটতে বাধ্য হয়। দেশ সম্ভাবনাময় স্বাধীনতার কাছাকাছি পৌছতে থাকে। পাক-হানাদারদের সেই আত্মগোপনের কথা ব্যক্ত করে ছড়ায় সানাউল হকের উক্তি :

লুকানো-হারানো বাংলার মন
মটরের ফুলে মধু গুঞ্জন
মরণার্থীরা ফিরে পেল প্রাণ
হেমন্তে পাকা ধান আত্মাণ
সোনার বাংলা আমার স্বদেশে
উদ্যত জয়রথ
কোথায় বর্গি কোথায় দালাল
পতাকার পতপত ॥

(সানাউল, ১৯৯৮ : ৫৪০)

‘শিশু কিশোরদের জন্য সানাউল হক লিখেছেন একগুচ্ছ ছড়া, যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে, শিশুসাহিত্যের আপাত সারল্যের অন্তরালে তাঁর প্রগত সমাজ চিন্তার পরিচয়।’ (বিশ্বজিৎ, ১৯৯৬ : ৮১) তাছাড়া লেখকের ছড়াসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজব্যবস্থা, প্রকৃতি, মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে অনেক বিষয়ই উঠে এসেছে। যা একজন ছড়াকার হিসেবে সানাউল হককে বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের ধারায় স্বমহিমায় আত্মপ্রতিষ্ঠা দান করেছে।

গল্প জীবনের কথা বলে, প্রকাশ করে জীবনের ছোট ছোট অনুভূতি। গল্পের মধ্যে দিয়েই মানুষ তার আপন ভাবনাগুলো অন্যের কাছে খুব দ্রুত ও সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারে। মানুষ প্রতিদিন অন্যের কাছে আপন ভাবনার ভাগাভাগি করে থাকে। দুজন

মানুষ এক সঙ্গে একটু সময় নিয়ে কথা বললেই আমরা বলি গল্প করছে। এই অনুভব ভাগাভাগিই কারো কারো হাতে শিল্পের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়ে গল্প হয়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত বাংলা সাহিত্যেও নানান ধরনের গল্পের দেখা পাওয়া যায়। গল্পের ধরন ও শৈলীবিচার করে আমরা গল্পগুলোকে বিভাজিত করে থাকি। শিশুতোষ গল্প সেদিক বিবেচনায় গল্পের একটি ক্ষুদ্র বিভাগ মাত্র। বাংলাদেশের সাহিত্যে অনেকে গল্প লিখলেও সে সব গল্পকারের মধ্যে মাত্র কয়েকজন গল্পকারকে আমরা পাই যারা বিশেষত শিশুদের জীবনবোধ এবং তাদের ভালোলাগা ও মন্দলাগার বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে গল্প লিখেছেন। এক্ষেত্রে সানাউল হক ছিলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। কেননা অনেক গল্পকারের গল্পেই শিশু-কিশোররা গল্পের অংশ হয়েছে তবে তা অনেক ক্ষেত্রে চরিত্র ও ঘটনার প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু সানাউল হকের গল্পে শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জনকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সেদিক বিবেচনায় গল্পকার হিসেবে সানাউল হক সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ভাবনায় নিমজ্জিত। রূপকথার ঢঙে তিনি তাঁর গল্পগুলো লিখেছেন। ‘রূপকথায় থাকে বলাহীন কল্পনা।’ (অনীক, ২০১৪ : ১৬৮) তিনি তাঁর গল্পগ্রন্থের নাম দিয়েছেন ‘পুতুল সৈনিক’। এখানকার গল্পগুলোর মধ্যে কৌতুক রসের সঙ্গে সূক্ষ্ম সমাজচেতনার অপূর্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

সানাউল হকের একমাত্র শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ ‘পুতুল সৈনিক’-এ মোট সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে। লেখকের গল্পগুলোর মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন লক্ষ করা যায়। ডেনমার্কের শিশুতোষ গল্পের লেখক হ্যাস অ্যান্ডারসনের (১৮০৫-১৮৭৫) গল্পের আদলে সানাউল হক গল্পগুলো রচনা করেছেন। তাঁর ভেতরে নিহীত ছিল একটি শিশুমন। ফলে তিনি বুঝতে পারেন শিশুদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। সানাউল হক উপলব্ধি করেছিলেন, শিশুরা রূপকথার গল্প শুনতে পছন্দ করে। তাই তিনি শিশুদের জন্য রূপকথার গল্প লিখেছেন। এখানকার- ‘গল্পগুলোর মধ্যে রূপকথার অন্তরালেও ধ্বনিত হয় লেখকের সামাজিক অস্তিত্বের সুর।’ (বিশ্বজিৎ, ১৯৯৮ : ৫৫১)

‘পুতুল সৈনিক’ গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্পের নাম “পুতুল সৈনিক”। নাম-ভূমিকার এ গল্প থেকেই সানাউল হকের গল্পবোধের একটি বার্তা পাওয়া যায়। মানুষের সমাজে নিত্যদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাকে ভিন্ন মাত্রায় অনুধ্যয়ন করে গল্পকার অসাধারণ এ গল্পটির প্লট নির্মাণ করেছেন। প্রণয়ী আবেগের সুর লেপন করে গল্পকার পুতুলদের এক একটি জীবন্ত আবেগী মানবের কাতারে টেনে তুলেছেন। মানুষ যেমন তার চারপাশ থেকে সম্পর্খায়ের একজন মানুষকে নিজের প্রেম-ভালোবাসা বিলিয়ে দেয়ার জন্য সন্ধান করে। তেমনি গল্পের এক পা-বিশিষ্ট পুতুলও গল্পকারের সৃষ্টি মাধুর্যে প্রেমিকে পরিণত হয়ে উঠেছে। প্রণয়-আগ্রহে কাগজের তৈরি অন্য একটি নারী পুতুলকে নিয়ে টিনের তৈরি এক পা-বিশিষ্ট পুতুল সৈনিক হয়ে ওঠে স্বাপ্নিক। শিশুরা যেহেতু পুতুল নিয়ে খেলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, গল্পকার তাই জীবন সংশ্লিষ্ট এ বিষয়কে পুতুলের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। গল্পকারের বর্ণনায় :

মোমের রাজহাঁসরা হ্রদের পানিতে সাঁতার কাটছে। আলো বলমল পরিবেশ। বারবারে সুন্দর সবকিছু। দুর্গের দোরগোড়ায় যে মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর কিন্তু তুলনা নেই। কাগজের তৈরি তিনি। পরনে তাঁর মসলিনের শাড়ি জরির সরু পাড় বোনা। ব্লাউজের নীল হাতটা স্পষ্ট দেখা যায়। গলায় মতির মালা। কানে হীরের দুল। তাঁর মুখের উপর নুয়ে আছে ইয়া বড় একটি গোলাপ, প্রায় মহিলার মুখের সমান। (সানাউল, ২০০২ : ৪৯৫)

রূপকথার আদলে লেখা এ গল্পে সানাউল হক পুতুল সৈনিকের মধ্যে প্রাণসম্বলন করতে চেয়েছেন। পুতুল সৈনিক আপন আবেগে নিমজ্জিত হয়ে নারী পুতুলটিকেও তারই মত এক পা বিশিষ্ট ভাবতে থাকে। শুধু তাই নয় সে মনে মনে ভাবতে থাকে এ নারী পুতুলটিই তার স্ত্রী হওয়ার যোগ্য। গল্প অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আরো দেখা যায়, পুতুল সৈনিকের জীবনে নেমে আসে এক অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়। দুর্যোগ-দুর্দিনের মধ্যে পড়ে হারিয়ে যায় জীবনের আবেগ, ঘর বাঁধার স্বপ্ন হয়ে যায় ফিকে। ফলে আত্মরক্ষাই হয়ে যায় পুতুল সৈনিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। হতাশায় নিপতিত পুতুল সৈনিকের দুর্দশার চিত্র হয়ে যায় এ রকম :

নৌকাটি বার তিন ডিগবাজি খেয়ে ডুবে গেলো। পুতুল সৈন্যের গলা অবধি পানি। পায়ের নীচে নৌকাটি

তখন চুপসে তলিয়ে গেছে। সে থৈ খুঁজে পেলো না। হাবুডুবু খাওয়ার সময় সেই নর্তকী মহিলার কথা

তার মনে পড়লো। তাকে আর কোনোদিন দেখবে না সে! আর কখনো না।

(সানাউল, ২০০২ : ৪৯৭)

“জুঁই” লেখকের দ্বিতীয় গল্প। এ গল্পের সূচনায় দেখা যায় একটি বাগানবাড়ি, সে বাগানে বাহারি রঙের অসংখ্য ফুলের সমাহার ঘটেছে। লেখক সমস্ত ফুলের মধ্যে থেকে ছোট্ট একটি ফুল জুঁইকে বেছে নিয়েছেন গল্পের উপজীব্য হিসেবে। জুঁই ফুলের বর্ণনা করতে গিয়ে সানাউল হক লিখেছেন :

বাগানের এক কোণে মাথা গজিয়ে আছে একটি ফুটফুটে সাদা জুঁই। হোমরা চোমরা ফুলদের মতো সূর্য রোজ ভোরে এসে তাকেও ঘুম ভাঙায়, স্নেহোন্মত্ত হাত বুলায়। সে চোখ খুলেই তার ফুরফুরে পাপড়িগুলো মেলে দেয় ফুলের ভিড়ে রাঙা ভাঙা চাঁদের কণার মতো। বাগানের সবচেয়ে ছোট বলে তার কোন খেদ নেই। বরং এ জন্য সে ভারী খুশি। ছোট্টো হলেও সে সূর্যের দিকে মুখ তুলে নীল আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কান পেতে পাখি-পাখালির গান শোনে। (সানাউল, ২০০২ : ৪৯৮)

শিশুরা ফুল ভালোবাসে এবং প্রতিটি শিশু এক-একটি ফুলের মতো সজীব ও পবিত্র। সানাউল হক নিসর্গের রূপ-রস গন্ধ মিশিয়ে তাঁর শিশুসাহিত্যের ভুবনকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন এবং গল্পের নামকরণ করেছেন একটি ফুলের নামে। সাধারণ মেজাজে নির্মিত অসাধারণ এ গল্পে দেখা যায়, অনেক ফুলের ভিড়ে ছোট্ট ফুল জুঁই কারো চোখে পড়ে না। অথচ তার-ই প্রাণ কাঁদে বাগানে গান গাওয়া দোয়েল পাখিটির জন্য। যাকে বন্দি করেছে বাড়ির ছেলেরা। অসহায় দোয়েলের চিৎকারে ব্যথিত হয় ছোট্ট জুঁই ফুল। আমাদের সমাজ জীবনের সত্যটাও ঠিক এরকমই। বন্দির অসহায় চিৎকার আছে শোষকের বিরুদ্ধে, কিন্তু সে চিৎকার কারো কান পর্যন্ত পৌঁছে না। সে চিৎকারে ব্যথিত

হয় সমাজের সাধারণ-অতিসাধারণ মানুষ। গল্পকার জীবনঘনিষ্ঠ এই চরম সত্যের মধ্যে দিয়ে শিশু কিশোরদের আনন্দ সঞ্চর করতে চেয়েছেন। পশু-পাখি ও প্রকৃতির ফুলের প্রতি প্রেম সানাউল হকের জীবনের অনেক বড় একটি দিক। তিতাস পাড়ের লেখকের সেই জীবনচেতনা আরো বেশি গাঢ় হয়ে ওঠে তখনই, যখন জুঁই ফুলকে গল্পের ছেলেরা রাস্তার নর্দমায় ফেলে দেয়।

সানাউল হকের শিশুসাহিত্যের তৃতীয় গল্পের নাম “রাস্তার বাতি”। এ গল্পের মধ্যে গল্পকার নাগরিক জীবনের বিস্তৃত-বৈভবের পাশে আলো-জ্বালানো একটি বাতিকে গল্পের প্রধান অবলম্বন করেছেন। বাতি আলো দেয়, রাস্তাকে করে আলোকিত। তিল তিল করে আলো জ্বালানো বাতি জীবনের অস্তিমলগ্নে উপনীত হয়ে অনেকটা স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। ৪৬ বছরের অভিজ্ঞতায় সে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করে। কারণ পরদিন তার স্থলাভিষিক্ত হবে অন্য কেউ। নগরের পাহারাদারদের থেকে তাকে আলাদা করে অবসর দেয়া হবে। মানবজীবনও ঠিক এরকম। কারো জন্য কোনো জায়গা শূন্য পড়ে থাকে না। শেষ পর্যন্ত শুধু থেকে যায় মানুষের কাজ। সানাউল হক মূলত শিশু-কিশোরদের এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন “রাস্তার বাতি” নামক শিশুতোষ গল্পের মধ্যে দিয়ে। রূপকথার ঢঙে লেখা গল্পের নায়ক রাস্তার বাতির বিষণ্ণ রূপ প্রকাশে সানাউল হক লিখেছেন :

ভালো করে চোখ মেলে তাকাতে পারছিলো না সে। মিট মিট করে উদাসভাবে চেয়ে আবেল তাবোল নানা কথা ভাবছিলো সে। কতো লোক সে দেখেছে, পথ দেখিয়েছে কতো না লোককে। চেয়ারম্যান ও কমিশনারেরা সবাই মিলে এত লোক জীবনে দেখেনি। এসব কথা মুখ ফুটে সে কখনো বলেনি। কাউকে খোঁচা দেয়া তার স্বভাব নয়, উপরওয়ালাদের তো নয়ই। (সানাউল, ২০০২ : ৫০১)

গল্পটির মধ্যে যে বাতির কথা সানাউল হক তুলে ধরেছেন তা শুধু একটি আলোক স্তম্ভ নয়, এটি জীবনের প্রতীক। গল্পটি শিশুমনে যেমন আনন্দ সৃষ্টি করে তেমনি তাদের কোমল হৃদয়ে একটি নীরব ভাবনারও উদয় করে। শিশুতোষ গল্পকার হিসেবে সানাউল হকের কৃতিত্ব এখানেই। কেননা জীবন যৌবন সব হারিয়ে মানুষও একসময় বার্ধক্যে উপনীত হয়। কর্মময় জীবন শেষে মানুষকে যেতে হয় অবসরে। পুরনো-কর্মী মানুষের জায়গায় আসে নতুন নতুন কর্মী। তখন অনায়াসে তাকে দীর্ঘ অতীত জীবনের দিকে চোখ ফেরাতে হয়। এই বাস্তবতার কথা একটি রাস্তার বাতির মধ্যে দিয়ে সহজ করে ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন সানাউল হক।

প্রকৃতির রূপময়তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সানাউল হকের সৃষ্টিকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। তাঁর শিশু-কিশোর গল্পের মধ্যে ঘুরে ফিরে এসেছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতীক ফুলের কথা। লেখকের পরের গল্প “বিয়ে পাগলা”। এ গল্পে গল্পকার সানাউল হক বিয়ে পাগলা এক প্রজাপতি আর অসংখ্য ফুলের মিলনোৎসব সৃষ্টি করেছেন। যা সহসায় শিশু মনকে পুলকিত করে। শিশুদের নির্মল আনন্দদানের অভিপ্রায়ে লেখা গল্পটিতে দেখা যায় বিয়ের জন্য প্রজাপতি নানা

রঙের ফুলের কাছে যায়। কিন্তু কোনো ফুলকেই সে কনে হিসেবে সম্পূর্ণরূপে পছন্দ করতে পারে না। এভাবে অসংখ্য ফুলের মধ্যেও বিয়ের যোগ্য কাউকে বিবেচিত না করতে করতে তার নিজের বয়স পেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তুলসীকে প্রস্তাব করলেও তুলসীও আর প্রজাপতির সঙ্গে বিয়ে করতে রাজি হয় না। গল্পাংশ হতে :

তুলসী কেবলি হাসে, কোনো জবাব দেয় না। শেষে বেশ স্পষ্ট গলায় বললো, বিয়ে নয় বন্ধুত্ব।
বাস্ ঐ টুকু, তার বেশি নয়। আমি এখন বুড়ো, তোমারও সেই দশা। এ বয়েসে বিয়ে ফিয়ার
হাস্যকর কথা মুখে এনো না। (সানাউল, ২০০২ : ৫০৬)

সানাউল হকের “বিয়ে পাগলা” গল্পটি শিশুদের মধ্যে চরম আনন্দবোধ ও হাস্যরসের সৃষ্টি করলেও এখানে তিনি সমাজের খুঁতখুঁতে প্রকৃতির মানুষদের দীক্ষা দিয়েছেন। কেননা এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজের চেহারাটা একবার আয়না নয় না দেখে শুধু অন্যের সৌন্দর্য অন্বেষণ করতে ব্যস্ত থাকেন। ফলে তাদের পরিণতি হয় বিয়ে পাগলা প্রজাপতির মতো।

“বাবুর্চিখানার নায়ক” সানাউল হকের পঞ্চম গল্প। গল্পটি বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি অনন্য সংযোজন। গল্পকারের এ গল্পে প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি দেশলাইর বাকস্; যে বংশ মর্যাদা ও আভিজাত্যের নিরঙ্কুশ অহংকারের প্রতীক। সানাউল হক এখানে একটি দেশলাইয়ের বাকস্ দিয়ে আমাদের সামাজিক জীবনের চরম সত্যকে তুলে ধরেছেন। কেননা কিছু মানুষ চিরদিনই তার অতীত বংশগৌরব ও ঐতিহ্যের অহংকারে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। আশেপাশের অন্য সবকিছুকে চিরকালই সে ক্ষুদ্র ভাবে। সানাউল হকের “বাবুর্চিখানার নায়ক” গল্পের শুরুতে সেই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। লেখকের গল্পবয়ান হতে :

দেশলাইর বাকস্।

বংশ মর্যাদার জ্ঞান তার টনটনে। তার বংশবৃক্ষ যার কাঠ দিয়ে তৈরি-একদা নাকি খুব উঁচু ছিল।
বনের সব গাছ ছাড়িয়ে মাথা তুলে সে দাঁড়িয়েছিলো। পাশের গাছগাছড়ারা কেউ তার হাট পর্যন্ত
পৌছতে পারতো না। তৃণের মতো তার পায়ের নিচে পড়ে থাকতো। এহেন গাছের বংশধর
দেশলাই। মেজাজখানা তার বেশ খনখনে। কথায় কথায় ফস করে জ্বলে ওঠে। কালো হাড়ি আর
মুখপোড়া সসপেন এর সমাজে তাকে বাস করতে হচ্ছে বলে তার আপশোসের শেষ নাই। শুধু
সান্ত্বনা সে ওদের জাতের নয় উঁচু বংশীয়। (সানাউল, ২০০২ : ৫০৬)

“বাবুর্চিখানার নায়ক” গল্পটি মূলত পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের নানা উপকরণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সাংসারিক জীবনে মানুষের রান্নাঘরে যে সব উপকরণ থাকে তা এ গল্পের এক একজন সংলাপকারীতে পরিণত হয়েছে। তাদের পারস্পারিক কথোপকথন, সহমর্মিতা টিপ্পনী হৈ-হুল্লোর প্রভৃতির অভিব্যক্তি যেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অভিব্যক্তি। সানাউল হক খুব সচেতন মেজাজে এসব দৃশ্য-উপদৃশ্য গল্পের অঙ্গীভূত করেছেন। যা বাংলাদেশের শিশুমনের গল্পখোঁরাক নিবারণ করতে সক্ষম হয়।

“বাবুর্চিখানার নায়ক” গল্পের শেষে গল্পকার একটি চমৎকার মেসেজ দিয়েছেন। তা হলো অহংকারীর পতন হয় হঠাৎ করে; দ্রুততম সময়ে। এ গল্পে দেশলাই-র বাকস্‌র

যে যে অহংবোধ তা ছিল দীর্ঘ সময়ের। অন্যকে সে সব সময় ছোট করে দেখেছে। কিন্তু একদিন হঠাৎ করে তার সমস্ত ক্ষমতা ও সৌন্দর্য ফুরিয়ে গেছে, সে হয়ে গেছে ছোটদেরও ছোট। গল্পভাষা হতে :

দেশলাই মনে মনে বললো, এবার দেখে নে ব্যাটারা কার কি দাম। দেখ, গা থেকে কেমন রোশানি ঠিকরে বেরোয় আমার, ঠিক যেন তারার ঝিলিক। আমার আলোতেই তোদের পোড়া মুখ হয় উজ্জ্বল- মনের কথা ফুরোবার আগেই দেশলাইটি ধপ করে নিবে যায়। (সানাউল, ২০০২ : ৫০৯)

ফুলের প্রতি মানুষের আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা সব যুগের সব সময়ের। ফুলকে ভালোবাসে না এমন মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া মুশকিল। ফুল সৃষ্টির এক অপার সৌন্দর্যের প্রতীক। সানাউল হক ফুলের প্রতি ছিলেন গভীরভাবে আকৃষ্ট। যা তাঁর “জুঁই” নামক শিশুতোষ গল্প থেকে স্পষ্ট হয়েছে। লেখকের ফুলের প্রতি আকৃষ্টতার পরিচয় আরো বেশি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর “ফুল সংসদ” নামক গল্পে। গল্পটিতে সানাউল হক অসংখ্য ফুলের কথা বলেছেন। নানা মৌসুমে ফোটা এসব ফুল মানুষকে মুগ্ধ করে। তবে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে ফুলের সজীবতা, বেঁচে থাকা ও প্রয়াণ গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সানাউল হকের শিশুতোষ গল্পে সেই ঋতু সম্পৃক্ততার বিষয়টি উঠে আসে। কেননা ঋতুর পরিবর্তনে খুব দ্রুতই ফুলের জীবনে পরিবর্তন নেমে আসে। “ফুল সংসদ” গল্পের সূচনাতেই রানা ও বাবুলের সংলাপে তা ধরা পড়ে। গল্পাংশ হতে :

এ দেখ, আমার ফুলগুলো, রানা আঙ্গুল উঠিয়ে সংগীকে দেখায়। বেচারারা শুকিয়ে যাচ্ছে। কাল সকালে ওরা ছিলো রাস্তা ঝলমলে। এক দিনেই ওদের চেহারা এমন চূপসে গেলো কেনো? (সানাউল, ২০০২ : ৫০৯)

“যেমন বুড়ো তেমন বুড়ি” গল্পটি সানাউল হকের শিশুসাহিত্যের জগতে আরও একটি অনন্য-অসাধারণ সংযোজন। এ গল্পটিতে গল্পকারের সৃষ্টি নৈপুণ্যে উঠে আসে সমাজের সহজ সরল ভাববিলাসী মানুষের কথা। একটি দম্পতির পারস্পারিক ভালোবাসা ও তাদের সেই ভালোবাসার কারণে বোকা বনে যাওয়ার কাহিনী “যেমন বুড়ো তেমন বুড়ি” গল্পটি। গল্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখা যায় গ্রামীণ পরিবেশে বসবাস করে একজন অতি সাধারণ কৃষক ও তার স্ত্রী। একটি কুঁড়ে ঘরে বসবাসকারী এই দম্পতির কোনো অর্থ-বিত্ত ছিলনা। তাদের সম্বল বলতে ছিল একটি মাত্র ঘোড়া। ঘোড়াকে ঘিরে তাদের স্বপ্ন ও ভবিষ্যত ভাবনা, যেখানে গভীরভাবে নিয়োজিত রয়েছে পরস্পরের প্রতি তাদের অপরিমেয় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাই স্ত্রীর ভালোবাসার মূল্য দিতে গিয়ে কৃষক তার স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করে ঘোড়াকে বিক্রি করতে মনস্থির করেন। এরপর পথে বের হয়ে ঘোড়া বদলিয়ে গরু তারপর একাদিক্রমে বদলাতে থাকে তার অর্জিত প্রাণীকে। এভাবে শেষ পর্যন্ত বদলিয়ে কৃষক গ্রহণ করে পঁচা আলু। কৃষকের এই বদলানোর চিন্তা সবসময়ই তাঁর স্ত্রীকে খুশি করার মনোবাসনা থেকে আহৃত। সানাউল হক মূলত গল্পটির মধ্যে দিয়ে একটি বিষয়ের দ্বারপ্রান্তে পাঠককে উপনীত করতে চেয়েছেন তা হলো যেখানে ভালোবাসা থাকে সেখানে ভুলটাও ঠিক এবং ঠিকটাও ভুল বলে মেনে নেওয়া

যায়। গল্পটি শেষ পর্যন্ত এই সত্যকেই উজ্জীবিত করেছে— সবকিছুর উর্ধ্বে মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। যা শিশুদের ছোট মনে একটি নতুন বোধের সম্ভার করে।

৩

সানাউল হকের শিশুসাহিত্যের মধ্যে জীবনের নানা দিক বিভাসিত হয়েছে। একজন দক্ষ সমাজ সচেতন লেখক হিসেবে তিনি তাঁর এ সাহিত্যবোধকে নির্মিতি দিয়েছেন। ছোট ছোট শব্দ ও চরণকে আশ্রয় করে লেখক তাঁর শিশুসাহিত্যের গল্প ও ছড়াগুলোকে শিশুপাঠ্য করে তুলতে চেয়েছেন। তবে তাঁর এ সৃষ্টিকর্ম কতটা শিশুর অনুকূল তা বিবেচনাশ্রুত। কেননা নামে এগুলো শিশুসাহিত্য হলেও আঙ্গিক বিশ্লেষণে দেখা যায় অধিকাংশ জায়গায় শিশুরা উপেক্ষিত হয়েছে। একজন প্রগতিপন্থী লেখক হিসেবে অন্য সাহিত্যের মত এক্ষেত্রেও তিনি সমাজ ও সমাজের বিষয়-আশয়কে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। শিশুসাহিত্য হিসেবে সানাউল হকের এসব রচনায় শিশু-চরিত্রের সাক্ষাৎ ততটা পাওয়া যায় না। বিশেষত তাঁর গল্পগ্রন্থ ‘পুতুল সৈনিকে’ যেসব গল্পের দেখা মেলে তা রূপকথার আদলে লেখা। ‘পুতুল সৈনিকের’ গল্পগুলোর বর্ণনাতত্ত্ব শিশুদের উপলব্ধির ক্ষেত্রে বেশ দুর্বল ও জটিল। তাছাড়া সানাউল হকের ছড়ায় গ্রাম-বাংলার রূপময়তা, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধিকার আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বাঙালির জীবনের যাবতীয় বিষয় তিনি স্বল্পসংখ্যক ছড়ার মধ্যে তুলে ধরেছেন। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের চালচিহ্নও এখানে উপেক্ষিত হয়নি। গ্রামে জন্ম ও বেড়ে ওঠার ফলে লেখকের এ সাহিত্যবোধ তাঁর ঐতিহ্য প্রীতিরই নিদর্শন। সংখ্যার দিক থেকে কম হলেও তাঁর শিশুসাহিত্যে জীবনের নানা দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের ধারায় সানাউল হককে একজন শিল্পোত্তীর্ণ লেখক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সহায়কপঞ্জি

অনীক মাহমুদ (২০১৪)। অনীক মাহমুদ প্রবন্ধ সংগ্রহ-১। সূচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা।

তৈয়বাহক (১৩৯০)। শিশুজীবনের ক্রমবিকাশ। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পা. (১৯৯৮)। সানাউল হক রচনাবলী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

——— (২০০৯)। বাংলাদেশের সাহিত্য। আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

——— সম্পা. (১৯৯৬)। জীবনী গ্রন্থমালা-সানাউল হক। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মনিরা কায়স (২০০৫)। ‘বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য’। সুবর্ণমনন, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শহীদ ইকবাল (২০০৮)। বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস। আলোয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

মাহিতিক

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬ ব. ৥ ১৯৫৯ খ্রি.

ru.ac.bd/bangle/bangle-journal-shahittyki

Print : ISSN 1994-4888

বর্ষ : ৬৬ সংখ্যা : ৫৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ ৥ মে ২০২৫

প্রকাশকাল : মে ২০২৫

প্রবন্ধ জমা : ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রবন্ধ গৃহীত : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পৃষ্ঠা : ৫৯-৮১

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় উপনিবেশায়ন

মো. আবুল ফজল

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

ই মেইল : usapurusk@gmail.com

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকীয় যুগমানসের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-উজ্জীবনের দায় এবং রোমান্টিক উদাসীনতার ‘দ্বিচারিতা’ নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রায় সমস্ত কাব্যের বিস্তার। ভারতবর্ষের নিজস্ব রূপের সংশ্লেষণের নামে ভারতীয় পুরাণাশ্রিত তাঁর কাব্যসমূহ তাই বাংলায় সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের বিস্তার রোধে সক্রিয়তা প্রদর্শন করেনি। অর্থাৎ বাংলা নাটকে উপনিবেশিক আঙ্গিকের ট্র্যাজেডি কমেডি ও প্রহসন প্রবর্তন, বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য নন্দনজারিত মহাকাব্য রচনা এবং অন্যান্য কবিতায় ইউরোপীয় রুচিসিদ্ধিগত ভাব সম্বলিত পাশাপাশি উপনিবেশিত মননপুঙ্খ পত্রকাব্য পদাবলি ও চতুর্দশপদী কবিতা রচনার মাধ্যমে তিনি মূলত বাংলা কবিতার উপনিবেশিত ভবিষ্যৎই নির্মাণ করেছেন। পাশ্চাত্যের ভাবসম্পদের কাছে দীনরূপে দ্বারস্ত হওয়ার ফলে তাঁর অনিষ্ট কাব্যপ্রয়াস বিষয় ও ভাবে, উদ্দেশ্য ও প্রেরণায় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বরং ইউরোপীয় কাব্যের ধ্রুপদী যুগের মূল্যবোধকে তাদের দ্বারা অধিকৃত এই দেশে তিনি যেভাবে আরোপ করেছেন, সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের একটি গুরুতর লক্ষণ হিসেবেই তাকে শনাক্ত করা যায়।

মূল শব্দ

মধুসূদন দত্ত, আধুনিকতা, কাব্যভাষা, প্রভাব, উপনিবেশায়ন।

যশোরের সাগরদাঁড়ি থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) যখন কলকাতায় যান (১৮৩৪) বাঙালি ততদিনে অর্ধ-শতাব্দিক বছর ধরে ইংরেজ বেনিয়া, শিক্ষক ও খ্রিষ্টান পাদ্রিদের ছোঁয়াচ পাওয়া ‘নতুন মানুষ’। গ্রাম থেকে নগরে নিষ্ক্ষেপিত তাঁর কৈশোরক কল্পনাকে তাই বিভাষা ও বিজাতীয় আদর্শে গড়ে তোলা আচার, প্রথা ও পাণ্ডিত্যময় প্রতিবেশ বেশ কিছু দিন বিচলিত রেখেছে। সেই অবস্থায় প্রায় ১৪ বছর তিনি অধ্যয়ন করেছেন কলকাতার বিখ্যাত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে। ক্যালকাটা গ্রামার স্কুলে শিখেছেন ইংরেজি ভাষা, হিন্দু কলেজে নিয়েছেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পাঠ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বুঝেছেন বাংলা ভাষার বৈয়াকরণিক প্রকৃতি আর বিশপ কলেজে গ্রহণ করেছেন গ্রিক-ল্যাটিন ভাষা-সাহিত্যের আশ্বাদ। এই শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে তাঁর মনন ও মনোবীজে উপনিবেশায়নের ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজের ভূমিকা সবচেয়ে প্রবল। ভারতবর্ষের বাইরের বিভিন্ন উৎসজাত সাহিত্যের পাঠ অনুবাদ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করে, তুলনামূলক সাহিত্যবোধের উন্মেষ ঘটানোর মাধ্যমে, এই প্রতিষ্ঠানটিই মূলত বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের উপনিবেশিত বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। তার ফলে গড়ে উঠেছিল উপনিবেশিত মননের যে প্রজন্ম, বাংলা গদ্যের আঞ্চলিক চারিত্র্য মুক্তির পাশাপাশি উনিশ শতকের অপরাধে ‘আধুনিক’ হিসেবে স্বীকৃত বাংলা কবিতারও গোড়াপত্তনও তাঁদের হাতেই। বিদ্যায়-বুদ্ধির পাশাপাশি আচার-আচরণ ও বিলাস-ব্যসনেও তাঁরা ছিলেন প্রচণ্ড; চিরন্তন বলে কিছুকেই তাঁরা বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ করেননি, প্রচলিত সবকিছুকে যুক্তির নিজিতে পরিমাপ করে দেখেছেন; ফলে তাঁদের মানস-জগতে চলছে অবিরাম সংগ্রাম: বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির, প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের। বিভবান পরিবার থেকে আসা শিক্ষিত সেই যুব-সমাজের মধ্য থেকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উপনিবেশিত যে ‘বিপ্লবী বাংলার’ উদ্ভব, মধুসূদন দত্ত ক্রমশ হয়ে উঠেছেন তার মধ্যে প্রধানতম নাম।

হিন্দু কলেজে ভর্তির সময় মধুসূদনের বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। ১৮৩৭ সাল। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর চার বছর পরে। সশরীরে না থাকলেও কলকাতার নাগরিক মানসে তখনও রামমোহনের প্রবল উপস্থিতি, প্রভূত চর্চা। সনাতনী কৌলীন্য আর তার হীন এক প্রথাকে উৎখাত করে তিনি তখন বাংলার বিদ্বৎসমাজে সবচেয়ে প্রণম্য নাম’। যুবক মধুসূদনের মনেও পড়েছিল তাঁর প্রভাব। ‘ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটি’ ততদিনে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, আর হিন্দু কলেজে তখন স্মরণীয় তিন শিক্ষক : ডেভিড ড্রামন্ড (১৭৯৭-১৮৬৪), ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন (১৮০১-১৮৬৫) ও হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)। মধুসূদন শিক্ষক হিসেবে ডিরোজিওকে সরাসরি পাননি, কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের সভ্যরা তাঁদের জীবনাচার ও ‘ভাবাদর্শবাহী ধারণার’ মধ্যে এমনভাবে তাঁকে জগ্নত রেখেছিলেন যে, তারই প্রভাবে তিনি ইয়ং বেঙ্গলের অনুসারী হন (যোগীন্দ্রনাথ, ১৯০৫ : ৫৮); আর উচ্চাভিলাসী স্বপ্নকল্পের প্রাবল্যে সর্বান্তঃকরণে অভিবাসিত হন পশ্চিমের ভাব-সম্পদের দুনিয়ায়। সেখান থেকে আহরিত বিবিধ

করণসমূহের দ্বারা তিনি বদলে দিয়েছেন বাংলা কবিতার গতিপথ। বাংলা নাটকে উপনিবেশিক আঙ্গিকের 'ট্রাজেডি' 'কমেডি' ও 'প্রহসন' প্রবর্তন, বাংলা ভাষায় গ্রিক ল্যাটিন রোমান ও ইতালীয় নন্দনপ্রসূত 'মহাকাব্য' রচনা এবং অন্যান্য কবিতায় ইউরোপীয় রুচিসম্মিত ভাব ভাষা ও ছন্দ সংযোজনের পাশাপাশি পাশ্চাত্য মননপুষ্টি 'পত্রকাব্য', 'পদাবলি' ও 'চতুর্দশপদী' রচনার মাধ্যমে তাঁর উত্তরকালের বাংলা কবিতার উপনিবেশিত ভবিতব্য গড়ে দিয়েছেন তিনিই।

২

হিন্দু কলেজের সিলেবাসেই মধুসূদন পড়েছেন পাশ্চাত্যের রোমান্টিক কাব্যগুলি। ইংরেজ কবি জিওফ্রে চসার (১৩৪০-১৪০০) থেকে চার্লস সুইনবার্ন (১৮৩৭-১৯০৯) এবং মহাকবি হোমার (খ্রি. পূ. অষ্টম শতক), সাফো (খ্রি. পূ. ৬৩০-৫৭০), ভার্জিল (খ্রি. পূ. ৭০-১৯), হোরেস (খ্রি. পূ. ৬৫-০৮) থেকে দান্তে আলিগিয়েরি (১২৬৫-১৩২১), টরকোয়াটো টাসো (১৫৪৪-১৫৯৯), ইয়োহান ফন গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) পর্যন্ত বিভিন্ন লেখক তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাঁদের কাব্যরীতি অনুসরণেই তিনি নিজের কবিতার রূপ-নির্মাণ করেছেন। মাত্র ১৪ বছর বয়স থেকে তাঁর ইংরেজি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার *The Oriental Magazine* (১৭৮৫), *Literary Gazette* (১৮১৭), *The Comet* (১৮৩৬), *The Bengali Harold* (১২২৯), *The Literary Gleaner* (১৮৪৩) পত্রিকায়। লর্ড বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪) তখন তাঁর স্বপ্নের কবি, তাঁর অনুকরণে কিছু কবিতা লিখে তিনি পাঠিয়েছেন লন্ডনের বিখ্যাত *Bentley's Miscellany* (১৮৩৬) পত্রিকায় এবং অচিরেই বুঝেছেন, ইংরেজি ভাষায় বড় কবি হতে গেলে যেতে হবে ওই ভাষার দেশে। তাঁর সেই সময়ের অনেক কবিতায় দেখা যায় সেই তাড়না: সুদূর অ্যালবিয়নের তীরে সুউচ্চ পর্বত আর শ্যামল উপত্যকা দেখার আকুলিবিকুলি, স্বজনহীন প্রবাসে নামহীন এক সমাধির জন্য দীর্ঘশ্বাস। এ-সময় হাতে লেখা একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন তিনি (১৮৪১)। মাত্র চার মাস টিকে থাকা সেই পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি নজরে পড়েন বিখ্যাত শিক্ষক ও সমাজ সংস্কারক রামতনু লাহিড়ীর (১৮১৩-১৮৯৮)। মধুসূদনসহ অন্য ছাত্ররা নিয়মিত যাতায়াত করতেন তাঁর বাড়িতে। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, সেই আড্ডাতেই তিনি অনর্গল আবৃত্তি করতেন জন মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪) আর উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) থেকে। (যোগীন্দ্রনাথ, ১৯০৫ : ৩৯)

মধুসূদনের মননে এই রুচি সঞ্চার করেছিলেন রিচার্ডসন। ডিরোজিওর বিকল্প হিসেবে পাওয়া সাহিত্যের এই অধ্যাপকের 'ব্রিটিশ রোমান্টিক পোয়েট্রির' ক্লাস মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। তাঁরই প্রভাবে পরিবারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম বিদ্রোহ, ইংরেজি ভালো করে শিখেও উকিল হওয়ার চেষ্টা না-করে কবি হওয়ার চেষ্টায়। সেই লক্ষ্যেই 'এপিকিউরান' রাজনারায়ণের সমস্ত কৌলিক-আচার তিনি নিঃশব্দে অগ্রাহ্য করেছেন। বাংলা ভাষা

পড়া ও শেখার ব্যাপারেও তাঁর ছিল অপরিসীম অনগ্রহ; যে ভাষা ‘জগৎময় কবিখ্যাতি এনে দিতে পারে না’, সে ভাষা চর্চা করে হবে কী; বাংলা ভাষার প্রতি এমনই ছিল তাঁর মনোভাব। হিন্দু কলেজের আরেক শিক্ষক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮১৩-১৮৮৫) সংস্পর্শে এসে মধুসূদন খ্রিষ্টধর্মে অন্তরিত হন (১৯৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি)। তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পিতা অর্থ-জোগানো বন্ধ করলে, পড়ালেখা শেষ না-করেই তাঁকে পাড়ি জমাতে হয় মাদ্রাজে (১৮৪৮)। অল্পদিনের মধ্যেই কাজ পান সাংবাদিকতার। *Eurasian* (১৮২০) ও *Madras Hindu Chronicle* (১৮২২) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিছুদিন; বছরখানেক পর সহকারী সম্পাদক হন *Madras Spectator* (১৮৪৮-১৮৫৬) পত্রিকার। সেখানে লিখতেন সাহিত্য বিষয়ে, সম্পাদকীয়, এমনকি খবরও। ইউরেশিয়ানেই প্রকাশিত হয় নাটক *জরুরধ* (১৮৪৯)। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্য তিনি অবিস্মরণীয়, *জরুরধ* সেই ছন্দেই লেখা। এ-সব কাজের ফাঁকে তিনি রুটিন মেনে অধ্যয়ন করেছেন গ্রিক ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষা এবং সাহিত্য^৪; আর *Madras Circular* পত্রিকার জন্য রচনা করেছেন *The Captive Ladie* (১৮৪৯)।

The Captive Ladie গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে। ধার করে বই ছেপে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন মধুসূদন। ভেবেছিলেন, কলকাতার লেখক শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী সমাজ কাব্যটিকে সমাদরে গ্রহণ করবে; তাঁকে স্বীকৃতি দেবে কবি হিসেবে। বইটি বিক্রি হয়েছিল মাত্র ১৮ কপি। কাব্যটি সম্বন্ধে বন্ধু গৌরদাস বসাককে মধুসূদন লিখেছেন: ‘বন্ধুদের মধ্যেই কয়েকজন যদি দুটাকা দিয়ে বইটি কেনেন, আর গৌরদাস যদি আরও জনা চল্লিশেক গ্রাহক জোগাড় করতে পারেন, তাহলে বই ছাপার খরচটুকু উঠে আসে’। (ক্ষেত্র, ১৯৬৩ : ১২২) বইটির ইতিবাচক ‘রিভিউ’ হোক, মধুসূদন তা মনেপ্রাণে প্রত্যাশা করেছিলেন। বই পাঠিয়েছিলেন *দ্য অ্যাথেনিয়াম* ও কলকাতার *বেঙ্গল হরকরা* পত্রিকায়। *অ্যাথেনিয়াম* প্রশংসাসূচক সমালোচনা করে কিন্তু নেতিবাচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে *বেঙ্গল হরকরা*। এলিয়ট বেথুনকেও (১৮০১-১৮৫১) বই পাঠিয়েছিলেন মধুসূদন। তাঁরও ভালো লাগেনি। তিনি বলেন, ‘ইংরেজি চর্চার মাধ্যমে কবি যে রুচি ও মেধা অর্জন করেছেন, তা নিজের ভাষার মানোন্নয়ন এবং কাব্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার কাজে ব্যয় করলে ভাল হয়’। (গোলাম, ২০১৩ : ৩৩২) সেই সমালোচনা পড়ে মন ভাঙে মধুসূদনের, বাংলা সাহিত্যের লাভ হয় তাতে— এর পরে ইংরেজিতে আর একটি কবিতাও তিনি লেখেননি; তাঁর জীবন ভরে এসেছে বাংলা নাটক, কাব্য, মহাকাব্য।

৩

মাদ্রাজ থেকে মধুসূদন কলকাতায় আসেন ১৮৫৬ সালে। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয় *শর্মিষ্ঠা নাটক* (১৮৫৯); বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম রচনা এটিই। শর্মিষ্ঠা জনপ্রিয় হওয়ায় বেশ আত্মবিশ্বাস পান; তারপরই রচনা করেন তাঁর প্রথম বাংলা কবিতার বই

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য^১ (১৮৬০)। পুরো-কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, আর ব্রজাঙ্গনা কাব্য ছাড়া মধুসূদনের সকল কাব্য এই ছন্দেই প্রণীত। কাব্যটি রচনার সময়ই চলছিল মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১) রচনার প্রস্তুতি। গ্রিক পুরাণ ততদিনে আয়ত্তে এসে গেছে; ‘তিলোত্তমাসম্ভবে’ও পড়েছে সেই প্রভাব। ‘ব্রহ্মার’ ভূমিকায় সেখানে তাই দেখা যায় গ্রিক দেবপতি জিউসকে। তাঁর ব্রহ্মা জিউসের মতোই স্বেচ্ছাচারী, দেবতার তাঁর প্রজা। মধুসূদনের ‘বিশ্বকর্মাও’ হোমারের (খ্রি. পূ. অষ্টম শতক) ‘হেফাইস্টোসের’ মতো সূক্ষ্ম শিল্পী, ‘নিদ্রা’ ও ‘স্বপ্নদেবীও’ গ্রিক ছাচে গড়া। তাদেরই অনুসরণে ‘ভক্তি’ ও ‘আরাধনার’ দেবীর কল্পনা। এই কাব্যের ‘বায়ুপতি’ গ্রিক দেবতা এওলাস, দেবদূতী এবং দেববাণীও গ্রিক পুরাণ অনুসরণে। পার্থক্য শুধু এই: বিধির নির্বন্ধ যে অখণ্ডনীয়, গ্রিক সেই বিশ্বাসটি কাব্যটিতে শোনা গেছে ভারতীয় দেবতাদের মুখে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি এমন অনুরাগ মধুসূদনের সারা জীবনব্যাপী। যার সবচেয়ে বেশি প্রকাশ ঘটেছে ১৮৬১ সালে প্রকাশিত ব্রজাঙ্গনা কাব্যে। ‘মেঘনাদবধের’ দ্বিতীয় সর্গ প্রকাশের আগেই কাব্যটি প্রকাশিত হয়। কাব্যটিকে তিনি বলেছেন ‘উফবৎ’। প্রশস্তিমূলক এমন অসমচরণের কবিতার উদাহরণ বাংলা কাব্যে ছিল না; তাই মিল্টন ও শেকসপিয়র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, বাংলা কবিতার ধ্বনি-সৌন্দর্য ও ছন্দসংগতি বজায় রেখেও কীভাবে বিদেশি কবিতার ভাব-গ্রহণ করা যায়।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধা; মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে যার প্রেম আধ্যাত্মিক রূপসহ প্রকাশিত। রাধার মানবিক দেহ থেকে আধ্যাত্মিক সেই আবরণটি খুলে নিয়ে এই কাব্যে মধুসূদন তাঁকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিনির্মাণ করেছেন। বৈষ্ণব পদকর্তাদের মতো ভক্তি বা নিষ্ঠা না থাকলেও রাধার বিরহ প্রকাশে তাঁর গভীর আন্তরিকতা ছিল; সে-কারণেই বংশীধ্বনি জলধর যমুনাতট ময়ূরী প্রতিধ্বনি উষা কুসুম মলয়-মারুত গোধূলি গোবর্দ্ধন-গিরি সারিকা কৃষ্ণচূড়ার মতো অনুষঙ্গলিকে আশ্রয় করেই ব্যক্ত করেছেন বিরহী রাধার মনোবেদনা। রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে এমন মানবিক রূপে প্রকাশের পদ্ধতিটি সেই যুগ-প্রতিবেশের ফল, যার মাধ্যমে বিদেশি সাহিত্যরসিক কবির বয়ানে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে পদাবলির মানবিক রস।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের পরের বছর প্রকাশিত হয় বীরঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য এটি। কাব্যটি রচনার প্রস্তুতি চলছিল আগে থেকেই : হিন্দু কলেজের সিলেবাসেই মধুসূদন পড়েছিলেন ওভিডের (খ্রি. পূ. ৪৩-১৭/১৮ খ্রি.) *Heroides*; যেখানে গ্রিক পুরাণের নারীরা আবেগে-আশ্রয়ে চিঠি লিখেছেন প্রেমিকদের; ‘এমন কাব্য তো বাংলায় নেই’—সেই সময়ই মনে হয়েছিল তাঁর! তখনই ভেবেছিলেন, *Heroides*-এর অনুকরণে এমন কাব্য লিখতে হবে, ভারতীয় পুরাণের নারী যেখানে প্রশ্ন অভিযোগ আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখবেন প্রিয়জনকে। পত্রের আদল হবে পৌরাণিক কিন্তু অন্তরে থাকবে সমকালের স্বর। সে-কথা তখনই তিনি জানিয়েছিলেন গৌরদাস

বসাককে। শকুন্তলা, তারা, রুক্মিণী, কৈকেয়ী, শূৰ্পণখা, ভানুমতী, দ্রৌপদী, দুঃশলা, জাহ্নবী, উর্বশী, জনা; এই এগারো জন পৌরাণিক চরিত্র *বীরাঙ্গনা কাব্যে* তাঁদের প্রেমিক অথবা স্বামীকে পত্র লিখেছেন। সে-কালের বিবেচনায় অভিনব সে-সব পত্র: তার মেজাজ কোথাও অনুনয়ের, কোথাও-বা প্রশ্ন আর অভিযোগে তীক্ষ্ণ।

নারীদের মনোভাব প্রকাশে ওভিদের মতো মধুসূদনও এখানে ‘লিরিক উচ্ছ্বাসের’ সুযোগ নিয়েছেন কিন্তু বর্ণনাভঙ্গিতে দুই কবির পার্থক্য লক্ষণীয়; উদাহরণ হিসেবে *Heroides* থেকে কয়েকটি চিঠির প্রারম্ভিক অংশের উদ্ধৃতি :

- ক. I, your Phyllis, who welcomed you to Rhodope, Demophoon, complain that the promised day is past, and you not here. (Hall, 2023 : 10)
- খ. From stolen Briseis is the writing you read, scarce charactered in Greek by her barbarian hand. Whatever blots you shall see her tears have made; but tears too have none the less the weight of words. (Hall, 2023 : 20)
- গ. All fearful, I read what you wrote without so much as a murmur, lest my tongue unwittingly might swear by some divinity. (Hall, 2023 : 242)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে প্রতীয়মান যে, ওভিদের পত্রের প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তিগুলো একেবারেই নাটকীয় নয়, এমনকি তার পরের ঘটনা-সংঘটন বা ভাব বিস্তারেও দেখা যায় নিরুক্তাপ ভাব। এই পত্রগুলির সঙ্গে পার্থক্য প্রতিপাদনকল্পে *বীরাঙ্গনা কাব্যে* অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি পত্রের প্রারম্ভিক কিছু পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি :

- ক. কি বলিয়া সম্বোধিব, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা? গুরুপত্নী আমি
তোমার... (মোহিতলাল, ১৯৬৫ : ২৫৭)
- খ. একি কথা শুনি আজ মম্বরার মুখে,
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ববে! (মোহিতলাল, ১৯৬৫ : ২৬২)
- গ. বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি
ত্রে যে অশ্ব, গর্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজকেতু; মুহুর্মুহঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য; কিন্তু কোন হেতু? (মোহিতলাল, ১৯৬৫ : ২৭৬)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের তুলনার মাধ্যমে বোঝা যায়, ওভিদের পত্রগুলি বেশ সরল, তার তুলনায় মধুসূদনের পত্রগুলি ‘dramatic monologue’। যার মাধ্যমে ‘Inmedias-res’-এ কাহিনির মধ্যভাগ থেকে একটি চরিত্রকে তুলে ধরে, স্বগতোক্তির মাধ্যমে তার মনোবেদনা, সামাজিক সম্পর্ক বা পরিবেশের বর্ণনা উপস্থাপন করাই মধুসূদনের লক্ষ্য। তবে পত্রের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য চরিত্রের উপস্থিতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং উক্তিও পত্রলেখকের বক্তব্যের মধ্যেই ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে মধুসূদন ওভিদের রচনাপদ্ধতিকে অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ *বীরাঙ্গনা কাব্যের* পত্রগুলির রচনাভঙ্গি ওভিদের রচনারীতির দ্বারা প্রভাবিত। যেমন, শকুন্তলা তাঁর পত্রের শেষের দিকে

লিখেছে: ‘কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে/ তুণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে!/
জীবনের আশা হয়, কে ত্যজে সহজে!’ (মাইকেল, ২০১৭ : ১৩৫) আর ওভিদের
কাব্যে Demophoon-কে Phyllis বলেছে : ‘Hope, too, has been slow to leave me; we
are tardz in believing, when belief brings hurt. Even my love is loath to let me think
you wrong me’। (Hall, ২০২৩ : ১৩) তারপরের একটি অংশে Phyllis যেমন বলেছে
: ‘Oft have I been false to myself in my defence of you; oft have I thought the gusty
breezes of the South were bringing back your white sails’। (Hall, ২০২৩ : ১৬)
বীরাজনা কাব্যে মধুসূদনের শকুন্তলাও তেমনিভাবে প্রতারিত হয়ে উচ্চারণ করেছে :
‘হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে;/ পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে;/ অমনি চমকি
ভাবি, —পূরবাসী যত/ আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে’। (মাইকেল, ২০১৭ :
১৩৩) ওভিদের পত্রে Phyllis অভিমানভরে বলেছে : ‘After all these, under your
own image let be inscribed these words; This is he whose wiles betrayed the
hostess that loved him’। (Hall, ২০২৩ : ১৪) প্রায় একই অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে
গিয়ে দশরথের উদ্দেশ্যে কৈকেয়ী বলেছে : ‘লিখিব গাছের ছালে নিবিড় কাননে,/ পরম
অধর্মচারী রঘুকুল পতি’। (মাইকেল, ২০১৭ : ১৪১) Briseis বলেছে : ‘Whatever
blots you shall see, her tears have made, but tears too, have none the less the
weight of words’। (Hall, ২০২৩ : ১৪) আর ভারতীয় পুরাণের ভাগ্যবিড়ম্বিত নারী
তারার মুখ দিয়ে মধুসূদন বলিয়েছেন : ‘লয়ে ফুলবৃত্ত, কান্ত, নয়ন কাজলে/ লিখি’।
(মাইকেল, ২০১৭ : ১৩৭) অনুপস্থিত Hippolytus-কে বিচলিত করতে Phaedra
কৌশল করেছে : ‘I mingle with these prayers my tears as well. The words of
her who prays, you are reading; her tears, imagine you behold!’; (Hall,
২০২৩ : ৩১) মধুসূদনের তারা এবং সূৰ্পণখাও করেছে প্রায় একই কাজ। Briseis তার
বিরহক্লিন্ন অবস্থার কথা জানিয়েছে Achilles-কে, শকুন্তলা এখানে দুঃস্বস্তকে। Briseis
বলেছে : ‘Gone is my flesh, and gone my colour, what spirit I still have is but
sustained by hope in vain,’ (Hall, ২০২৩ : ২৪) শকুন্তলা বলেছে : ‘মলিন বাকলে/
আবরি মলিন দেহ; নাহি অল্পে রুচি;/ না জানি কি কহি কারে, হয়, শূন্যমনে!’
(মাইকেল, ২০১৭ : ১৩৪) ওভিদের নায়িকারা যেমন স্বপ্ন দেখেছে এবং তার বিবরণ
জানিয়ে মিলনেচ্ছাকে করে তুলেছে তীব্রতর, মধুসূদনও তেমনি শকুন্তলা ও রুক্মিণীর
মিলনেচ্ছাকে একই কৌশলে চিত্রাপিত করেছেন।

ওভিদের দীক্ষাকে আশ্রয় করে এই কাব্যে মধুসূদন পুরাণের প্রচলিত অভিমুখ পাণ্টে
তাকে প্রবাহিত করেছেন নতুন খাতে। কৈশোর-যৌবনে সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণ,
দান্তের *Divine Comedy* বা ভার্জিলের *Aeneid* পাঠ করা কবি এই কাব্যে এমন এক
সমাজের ছবি আঁকতে চেয়েছেন, যেখানে নারী প্রশ্ন তুলবে, বুঝে নিতে চাইবে
অধিকার। উনিশ শতকীয় সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে অসম্ভব হলেও বীরাজনা কাব্যে

কথা দিয়ে কথা না-রাখা স্বামীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন কৈকেয়ী। রুক্মিণী স্বেচ্ছায় অপহৃত হতে চেয়ে পত্র পাঠিয়েছেন দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের কাছে। তাঁদের মতো মধুসূদনের এই কাব্যের অন্য বীরাঙ্গনারাও নিছক সংস্কার-বশে মেনে নেননি স্বামী বা প্রেমিকের প্রবঞ্চনা, বরং কুষ্ঠা কাটিয়ে জগৎকে জানিয়েছেন নিজের অভিজ্ঞতা।

বীরাঙ্গনা কাব্যের এগারোটি পত্রের মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত ‘সোমের প্রতি তারা’। প্রত্যেক পত্রের শুরুতে মধুসূদন কাহিনিসূত্র দিয়েছেন। সেখানে বলা আছে, কোন পরিস্থিতিতে পৌরাণিক সেই নারীরা পত্রগুলি লিখেছেন। তারার পত্রের মুখবন্ধ থেকে জানা যায়, দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বিদ্যালভের জন্য এসেছিলেন সোমদেব। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন গুরুপত্নী তারা। শিক্ষা শেষে শিষ্য ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে তারা পত্র লেখেন সোমদেবকে। সেখানেই প্রকাশ পায় তাঁর সুপ্ত ভাব, অনুক্ত কামনা। মধুসূদন লিখছেন : ‘সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাট্রেই তাহা অবগত আছেন।’ (মোহিতলাল, ১৯৬৫ : ২৫৭) প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে বীরাঙ্গনা কাব্যের আখ্যানভাগের দ্বন্দ্ব ঠিক এখানেই। কবির অনুক্ত সেই ক্ষেত্রটিতে আসলে কী করেছিলেন সোমদেব? হিন্দু কলেজ প্রভাবিত মূল্যবোধের আলোকে তারার মুখে তাঁর অনুভব প্রকাশ করে মধুসূদন মনোযোগ ফিরিয়েছেন ভারতীয় পুরাণের দিকে; কেননা ভারতীয় পুরাণের চেনা আখ্যান পাণ্ডে গেছে বীরাঙ্গনা কাব্যের এই পত্রটিতে।^৮ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সোমদেব কামোন্মত্ত হয়ে অপহরণ করেছিলেন গুরুপত্নী তারাকে, আর এখানে দেবী তারাই কামনা করেছেন চন্দ্রদেবকে। সোমদেবের উদ্দেশ্যে তারা লিখেছেন : ‘তুষেছ গুরুর মন সুদক্ষিণাদানে,/ গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা, দেহ ভিক্ষা তারে।’ (মোহিতলাল, ১৯৬৫ : ২৬১) কবিতাটি দীর্ঘ। তার ছত্রে ছত্রে পুরাণ ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সংরাগরক্তিম অদম্য শরীরী আহ্বান; যেখানে সুস্পষ্ট এক নারীর যৌন স্বাধিকারের কথা।

মধুসূদন এই কাব্যে পুরাণের এমন বদল ঘটান কেনো? তার উত্তর পাওয়া যায় মহাভারতে। সেখানে বলা হয়েছে, দেবগুরু বৃহস্পতির ‘বিকৃতকাম-কর্মকাণ্ডের’ কারণে অভিশপ্ত হয়েছিলেন তারা^৯। শিকার হয়েছিলেন নারীত্বের জন্য সবচেয়ে অবমাননাকর পরিস্থিতির। মধুসূদন এখানে পুরাণকে সেই ‘অশ্লীলতার’ প্রায়শ্চিত্ত করাতে চেয়েছেন। সেই অভিপ্রায়েই মূল-গল্পের অভিমুখ পাণ্ডে দিয়ে, মূল-পুরাণে উল্লিখিত সোমদেবের লাম্পট্যের গল্পের চালিকার আসনে বসিয়েছেন তারাকে। সে-কারণে ধর্মগ্রন্থের বয়ান গেছে পাণ্ডে, অবগুষ্ঠিতা নারী অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সরাসরি। এ-সব কারণে উনিশ শতকীয় সামাজিক পরিসর থেকে সমালোচনার ঝড় ওঠার কথা; অথচ আঙ্গিকের অভিনবত্বে কাব্যটি সে-সময় এতটাই আলোড়ন তোলে যে, বীরাঙ্গনাদের চিঠির উত্তর

লেখার প্রবণতা দেখা যায় পরের প্রায় পাঁচ দশক জুড়ে।^৮ মননে উপনিবেশিক অসহায়তায় ক্লিষ্ট সে-কালের বাঙালি কবিগণ কতটা আঁকড়ে ধরেছিলেন মধুসূদনকে, তারই প্রমাণ উত্তর-বীরাঙ্গনা সেই পত্রকাব্যগুলো।

৪

মধুসূদনের জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি *মেঘনাদবধ কাব্য*। যার মাধ্যমে ভারতবর্ষের প্রথম মহাকাব্যের প্রথম বিনির্মাণ ঘটেছে তাঁর হাতে। বিনির্মাণের জন্য *রামায়ণ*কে বেছে নেওয়ার যে ‘বৈপ্লবিক চেতনা’, তার এষণা সুদূরপ্রসারী। তাঁর আগেও নানা ভাষায় *রামায়ণের* সংশ্লেষ (Adaptation) ঘটেছে কিন্তু কোথাও তার মূলভাব ও চরিত্রগুলি খুব পরিবর্তিত হয়নি। অথচ মূলের এষণা পাল্টে দিয়ে, প্রতিষ্ঠিত ও প্রামাণ্যকে প্রান্তিক করে এবং প্রান্তবর্তীকেই কেন্দ্রে নিয়ে আসায় মধুসূদনের যে প্রাণনা, ‘রামকে’ দূরবর্তী রেখে ‘রাবণকে’ আপন জ্ঞান করে তাঁর যে ভাব ও রূপকল্পের নির্মাণ, সেই সময় তা ছিল অকল্পনীয়। তবুও ‘ভারতাত্মার প্রতীক’ দুটি মহাকাব্যের একটিকে বিনির্মাণের মাধ্যমে, ভারতবর্ষেরই নিজস্ব এক সম্পদকে আশ্রয় করে মধুসূদন প্রকাশ করেছেন তাঁর দৃষ্টিকোণ। সেখানে মহৎ চরিত্রের ‘কুৎসা’ না করেও মহান অবতার বলে বর্ণিত চরিত্রেও যে মানবিক দুর্বলতা থাকতে পারে, সেটিই বিধৃত করেছেন তিনি।

এমন কর্ম-সংঘটনে মধুসূদনের অন্যতম সহায় মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝা (১৩৮১-১৪৬১)। কেননা, মহাকবি বাল্মীকির কাব্যের সংশ্লেষণের কালে ‘আদিকবির মাল্যের পুষ্পসমূহের সঙ্গে কৃত্তিবাস ওঝা নিজেও যুক্ত করেছেন নিজস্ব কিছু কুসুম।’ (যোগীন্দ্রনাথ, ১৯০৫ : ৭৮) নিজের যুগমানসের উপযোগী কাব্য রচনা করতে গিয়ে বাঙালির কবি মধুসূদনও খুঁজে নিয়েছেন নতুন পথ। সে-কারণে *মেঘনাদবধ কাব্যে* যে পরিবর্তনসমূহ ছিল তাঁর অভিপ্রায়, তা সংঘটনের জন্য পূর্বজ মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝার স্মরণ নিয়েছেন তিনি।^৯ *মেঘনাদবধ কাব্যের* চতুর্থ সর্গে বলেছেন :

কীর্তিবাস^{১০}, কীর্তিবাস কবি,

এ বঙ্গের অলঙ্কার!—হে পিতঃ, কেমনে,

কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে

মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি?

গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে

তব কাব্যোদ্যানে ফুল, ইচ্ছা সাজাইতে

বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব

(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,

রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে। (মাইকেল, ২০১৭ : ৬৩)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে মধুসূদন মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝার অবিসংবাদিত কীর্তির কথা নিজে যেমন স্মরণ করেছেন তেমনি স্মরণ করাতে চেয়েছেন *মেঘনাদবধ কাব্যের* পাঠকদেরও। এই কাব্যে তাঁর নিজের সংযোজন যেটুকু (নতুন বয়ান), অন্যকবির হাতে সে-রকম যে আগেও সাধিত হয়েছে, তৎকালীন কলকাতায় গ্রাহ্য হওয়ার জন্য এই

দোহাইটুকু তাঁর প্রয়োজন ছিল। কেননা, প্রচলিত আখ্যানের নায়ক এই কাব্যে পর্যবসিত হয়েছেন প্রতিনায়কে, প্রতিনায়ক হয়ে উঠেছেন নায়ক। যদিও মূল-কাব্যের কাহিনি থেকে কবি বিচ্যুত হননি; তবুও বেদব্যাস যেমন ‘ব্যাসকূট’ রেখেছেন মহাভারতের প্রতিপদে, যার রহস্য-উন্মোচনের মাধ্যমে আদিকবির বক্তব্যকে নতুন যুগের আলোয় নতুন করে চেনা যায়, *রামায়ণের* আখ্যানের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কূটরহস্য উদ্ঘাটন করে তেমনই তার চরিত্রসমূহের আড়ালে লুকিয়ে থাকা দেবোপম চরিত্রগুলির দুর্বলতা দৃশ্যগোচর করেছেন মধুসূদন। যেমন : প্রমীলা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করতে চলেছেন। সঙ্গে সখীদল। পবনপুত্র হনুমান আছেন প্রহরায়। প্রবেশে বাধা দেন তিনি। উত্তরে প্রমীলা জানান, ‘তিনি রামের সঙ্গে কথা বলতে চান, নরেন্দ্রের বানরের সঙ্গে নয়।’ প্রমীলাকে রাম বিনা-বাধায় লঙ্কায় প্রবেশ করতে দিতে সম্মত ছিলেন না, আবডালে হনুমানকে বলেছেন, ‘তোমার কি মাথা খারাপ? প্রমীলার সঙ্গে রণে আমার জয় আশা করো?’ (হায়াত, ২০১৮ : ৪৪) অবতারের মুখে এমন কথাও শোনাবেন মধুসূদন, তাই এভাবে কৃত্তিবাস ওঝার দোহাই দেওয়া। এছাড়া লক্ষ্মণ যখন মায়ার প্রভাবে অদৃশ্য হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করেছেন, লঙ্কাপুরীর স্বর্ণশোভা মুগ্ধ করেছে তাঁকে। লোভের বশে বিভীষণকে সে-কথা তিনি জানিয়েছেন। নিরস্ত্র মেঘনাদকে রামের অনুজ লক্ষ্মণ যে আক্রমণ করেছিলেন, সেটি *বাণীকি রামায়ণে*ও আছে। অথচ ক্ষত্রিয়-ধর্মে নিরস্ত্রকে যুদ্ধে আহ্বান ধর্মবিরুদ্ধ। (মানবেন্দু, ২০০৪ : ৪৫৮) মধুসূদন এই অন্যায়কেও তুলে ধরেছেন জনসমক্ষে। দেখিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধজয়ের জন্য মহামান্য অবতারও এমন অন্যায়কে আশ্রয় করেছেন। কিন্তু কেনো লক্ষ্মণের এই ছল? প্রতিপক্ষ হিসেবে মেঘনাদ ছিলেন প্রবল; সম্মুখ সমরে তাঁকে পরাস্ত করা অসম্ভব। এই বিজয়ের মাধ্যমে তাই অবতার হয়েও দেবতা স্বীকার করেছেন মানবিক দুর্বলতা। অন্যদিকে ভীষণ নিন্দিত রাক্ষসরাজ রাবণ ক্ষাত্রধর্ম মেনেই প্রজাপালনার্থে যুদ্ধ করেছেন। তাঁকে বধ করতে রাম যখন দুর্গাদেবীর অকালবোধন করেন, ব্রাহ্মণ হিসেবে রাবণই করেছেন সেই পূজার পৌরহিত্য।^{২০} রামের পক্ষ থেকে, রামেরই অভিপ্রায় অনুসারে যজমান রাবণ নিজেরই বধের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেছেন : ‘রাবণস্য বধার্থায় রামস্য অনুগ্রহায় চ, অকালে ব্রাহ্মণ বোধো দেব্যাঃ ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।’ (ভগবতীচরণ, ১৯১৫ : ৬৪) অর্থাৎ প্রতিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও রাবণের চরিত্রে দেখা গেছে দেবোপম গুণ। এমনকি, মেঘনাদ চরিত্রে যে পরিমাণ পিতৃভক্তি দেখিয়েছেন মধুসূদন, *বাণীকি রামায়ণের* রামচন্দ্রও ততটা পিতৃভক্ত নন। তারপরও *মেঘনাদবধ কাব্যের* অশ্বিষ্ট কাব্যবীজ যেহেতু *রামায়ণেই* নিহিত, কেউ তার যথার্থ্য অস্বীকার করতে পারেন না। সেটুকু স্বীকার করেই মধুসূদন দেখিয়েছেন, *রামায়ণ* মূলত রাবণ নামক এক প্রজাপ্রিয় ও সমরকুশল সম্রাটের ‘অন্যায় যুদ্ধে’ পরাজয়ের কাহিনি; যে-পরাজয় মূলত তাঁর নৈতিক জয়েরই চিহ্ন বহন করে। পার্থিব বৈভব, মৃত্যু ও মৃত্যুজনিত শোক, প্রকৃতপক্ষে কোনো পরাজয়ই নয়; প্রকৃত পরাজয় হলো : মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ‘মারি অরি পারি যে কৌশলে’ (মোহিতলাল, ১৯৬৫ :

২৩৬) বলে এইভাবে পরের সম্পদ হস্তগত করা। তাছাড়া মিথ্যা তো এমনই নৈতিক দ্রুটি যে, কোনো ঋষিপ্রবচনই তাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। মধুসূদনের কালে একথা স্বীকার করেছেন অন্যরাও। যেমন, কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)। তিনি লিখেছেন : ‘দত্তকবি রামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়াই মেঘনাদবধ কাব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহার নায়কগণ এমনই যথাযোগ্য গুণে বিভূষিত যে, তাহাতে রামায়ণ প্রচারয়িতা বাল্মীকিকেও লজ্জিত হইতে হইয়াছে।’ (কালীপ্রসন্ন, ১৯০৮ : ২৬)

মেঘনাদবধ কাব্যে এমনভাবে রাবণ চরিত্র অংকন করেছেন মধুসূদন, তাতে মনে হয়, শক্তিশালী হয়েও রাবণ যেন ভাগ্যবিড়ম্বিত, কোনো এক নিষ্ঠুরতম ষড়যন্ত্রের শিকার। প্রভূত চারিত্রিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁকে মনে হয়, প্রজাপ্রিয় সম্রাট এবং স্নেহময় পিতা ও স্বামী। ভাগ্যবিড়ম্বিত মধুসূদন সহজেই রাবণের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পেরেছেন বলেই এই কাব্যের প্রথম সর্গের মাঝামাঝি এসে ট্রাজিক-পিতা রাবণের মুখে জুড়ে দিয়েছেন তাঁর স্ব-উদ্ভাবিত বাংলা ছন্দ অমিত্রাক্ষরের এই সংলাপ : ‘এ বজ্র আঘাতে/ কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন/ অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।/ হে বিবিধ, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;/ পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি/ হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী/ তুমি হে জগত পিতা, এ কি রীতি তব?’ (মাইকেল, ২০১৭ : ৩৯)

অর্থাৎ প্রভূত চারিত্রিক দুর্বলতা সত্ত্বেও ‘সিংহহৃদয় রাবণ’ তাঁর কাছে জগতে পরাজিত মহান এক সম্রাট। কিন্তু মেঘনাদ? রাবণের প্রিয়তম সন্তান? তাঁর চরিত্রে তো কলঙ্ক নেই! ক্ষাত্রধর্ম পালন, প্রেমিক হৃদয় আর মাতা-পিতার প্রতি নিঃশর্ত ভক্তি তাঁকে রেখেছে সব-রকম কালিমার উর্ধ্বে। মেঘনাদ তাই মধুসূদনের মানস-সন্তান। কাব্যটির নামকরণ থেকেও সেটি বোঝা যায়। বাল্মীকির অভিলক্ষ্য ‘রাম’, তার সঙ্গে বিশিষ্টতাবাচক ‘আয়ন’ প্রত্যয় যুক্ত করে তাঁর কাব্যের নামকরণ; আর মধুসূদনের মনোযোগ ‘মেঘনাদের’ দিকে। তাঁর আপত্তি অমন দেবোপম ছেলের অক্ষাত্রচিত হত্যাকাণ্ড নিয়ে। সে-কারণেই বন্ধু গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা চিঠিতে মেঘনাদকে তিনি সম্বোধন করেছেন ‘মাই ফেভারিট ইন্ড্রজিৎ’ (ক্ষেত্র, ১৯৬৩ : ১২৭) বলে। এ-প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র মৈত্র ‘মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন :

এ কাব্যের নায়ক সর্ববিধ সুস্থতার প্রতীক। সে দক্ষ সেনানী, প্রেমময় স্বামী, স্নেহকাতর পিতা, জনপ্রিয় শাসক এবং সূতনু নর। মধ্যবিত্ত সমাজে যা কিছু অভিপ্রেত সকল গুণের অধিকারী। তাঁর প্রতাপে স্বর্গমর্ত্য কম্পমান কিন্তু রাজ্যচ্যুত বনচর সামান্য দুই যুবক তার সৈন্যদলকে পর্যদস্ত করে দিচ্ছে। তবে কি শক্তি শক্তিমত্তার পরিচায়ক নয়? বীর্য নয় বীর্যশালিতার ভিত্তি? (সুরেশচন্দ্র, ২০২০ : ৮৩)

উদ্ধৃতিটি সাক্ষ্য দেয়, রামায়ণ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে মধুসূদনের যে এষণা, তা মূলত প্রাচীন মহাকাব্যকে নতুন যুগের নব-উদ্ভাষিত আলোয় দেখা। এই দর্শন কবির জীবনের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। যে-জীবনে তিনি শক্তিমত্তা হওয়া সত্ত্বেও বহুতর অপমান ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। শক্তি তাঁর শক্তিমত্তার পরিচায়ক হয়ে ওঠেনি, সমাজের বাধা প্রতিপদে তাঁকে

পর্যবসিত করেছে নায়ক থেকে প্রতিনায়কে; সেই স্মৃতি প্রতিভার আশ্রয়ে এসে জন্ম দিয়েছে *মেঘনাদবধ কাব্য*। তাই অবতার রামচন্দ্র বা রাক্ষস রাবণের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ থেকে নয় বরং নিজের অভিজ্ঞতাজাত পরিবীক্ষণ থেকেই সনাতন নৈতিকতা নামক খড়্গহস্ত নতুন রামচন্দ্রের সামনে দাঁড়ানো প্রতিস্পর্ষী রাবণকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এভাবেই সৃষ্টিশীলতার পরাকাষ্ঠা নিয়ে সে-সময়ের হিন্দুধর্ম ও সামন্ততান্ত্রিক রুদ্ধশ্বাস আধিপত্যের বাইরে বিহার করেছেন মধুসূদন; ফিরেও এসেছেন : ধর্মে নয়, বাংলা ভাষা ও বাঙালি চেতনার আত্মপরিসরে। সেই চেতনা ও ভাষায় নতুন বন্ধনে রচনা করেছেন ‘ভিন্নতর রামকথা’। যেখানে বিষ্ণু-অবতার ‘রাম’ নন, বড় হয়ে উঠেছেন ‘ইন্দ্রজিৎ’। এ-প্রসঙ্গে কাব্যটি প্রকাশের সময়ই রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে মধুসূদন বলেছেন : ‘People here grumble and say that the heart of the poet in Meghanad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble; but the idea of Ravan elevates and kindles my imagination.’ (ক্ষেত্র, ১৯৬৩ : ১৭৮) অর্থাৎ রামচন্দ্র এবং তাঁর ‘সাক্ষোপাক্ষোদের’ আমি পছন্দ করি না; কিন্তু রাবণের ভাবনায় আমার কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়! সেই চিঠিতে কেবল এটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি তিনি; রাবণকে বলেছেন ‘গ্রেট ফেলো’, মেঘনাদকে ‘ফেভারিট ফেলো’! মেঘনাদের হত্যার বর্ণনা লেখার সময়ে অশ্রুতে ভাসার কথাও তিনি জানিয়েছেন।

৫

প্রামাণ্য ও প্রাপ্তিকের স্থান বদল করে পরিবীক্ষণের এই প্রাণনা মধুসূদন লাভ করেছিলেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যাপনসূত্রে। সে-কারণে তাঁর অনুভূতিতে কোনো দ্বিধা নেই, *মেঘনাদবধ কাব্যে* সেই অনুভূতির প্রকাশ তাই এতটা স্বতঃস্ফূর্ত। তার জন্য ইউরোপের উনিশ শতককে, এমনকি শেক্সপিয়র ও মিল্টনকেও অতিক্রম করে আরও আদি ও অকৃত্রিম উৎসের প্রেরণা দ্বারা নিজের প্রাণপাত্র তিনি পূর্ণ করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হোমারকে তিনি ভুলতে পারেননি। বাংলা গদ্যে হোমারের মূল মহাকাব্যের অসমাপ্ত অনুবাদই তাই তাঁর শেষ সাহিত্যকর্ম। অর্থাৎ ইউনানীর প্রাচীন সেই কবির আদি কাব্যপ্রেরণার মধ্যেই মধুসূদন পেয়েছিলেন তাঁর আপন প্রাণের প্রতিধ্বনি। সে-কারণে, *মেঘনাদবধ কাব্য* রচনার সময় নিজেই রাজনারায়ণকে লিখেছেন (১৮৬০, তারিখ নেই), এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ পড়তে পড়তে ইলিয়ডের চতুর্দশ সর্গের কথা অবশ্যই মনে পড়বে : ‘I have intentionally imitated it - Juno's Visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible ... I fancy the versification.’ (ক্ষেত্র, ১৯৬৩ : ১৭৯) পরের চিঠিতে জানিয়েছেন : *মেঘনাদবধ কাব্যের* অষ্টম সর্গে হাত দিয়েছেন; *Iliad*-র ‘ইনিয়াসের’ মতো রামকেও তিনি নরকের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে দশরথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। হোমারের এমন প্রভাবের কারণেই কাব্যটির প্রথম দুটি ও চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে ‘বীণাপাণির’ সমনাম হিসেবে প্রযুক্ত ‘শ্বেতভুজা’ শব্দটি গ্রিক

‘লেউকালেনোসের’ অনুবাদ। এছাড়া কয়েকটি উৎপ্রেক্ষাও হোমার থেকে গৃহীত। যেমন : ‘ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,/ মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি/ গগনে।’ (মাইকেল, ২০১৭ : ৩৭) এই উৎপ্রেক্ষাটি *Iliad*-এর যে অংশ থেকে নেওয়া, সেখানে বলা হয়েছে : ‘As the dust, when it liesthick in the roadways on a stormy day, is caught up by the blustering wind and rolled into a great and solid cloud.’ (Kline, ২০১৪ : ৬৮৮)

মেঘনাদবধ কাব্য রচনার সময় দেখা যায়, শেক্সপিয়রের বই আদান-প্রদান চলছে গৌরদাসের সঙ্গে। বায়রনের কাব্য ফেরত দিচ্ছেন; *Blackwood's Magazine*-এ কবিতা পাঠাচ্ছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থকে উৎসর্গ করে। এরই মধ্যে এক সময় ল্যাটিনে লেখা রোমান ইতিহাসের বই *Eutropius* পাঠাতে বলেছেন। জর্জ ক্র্যাবের (১৮৫৪-১৮৩২) কাব্য ফেরত পাঠানোর খবর দিচ্ছেন যে চিঠিতে সেখানেই যুক্ত করেছেন উইলিয়াম বার্নেসের (১৮০১-১৮৮৬) উদ্ধৃতি। থমাস ক্যাম্পবেল (১৭৭৭-১৮৪৪) পড়েছেন বলে জানিয়েছেন, ঠাঠা করেছেন ‘মিউজ’ বা কাব্য-সরস্বতীকে নিয়ে। টমাস মুরের (১৭৭৯-১৮৫২) লেখা তাঁর প্রিয় কবি বায়রনের জীবনী পড়েছেন এবং *Othello* ও *Hamlet* পড়ার কথা বলেছেন বারবার। এর আগে *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* রচনাকালে (১৮৬০ সালের ২৪ এপ্রিল) বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক চিঠিতে ‘অমিত্রাক্ষর’ ছন্দের কথা বলতে গিয়ে জন মিল্টন, ভার্জিল ও হোমারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ১৫ মে ১৮৬০ সালের এক চিঠিতে বলেছেন, বিশ্বনাথ কবিরাজের (১৩০০-১৩৮০) *সাহিত্যদর্পণ* নয় বরং নিজের রচনায় ইউরোপীয় নাট্যাদর্শ অনুসরণ করবেন। পাশ্চাত্যের ‘ধ্রুপদী’ সাহিত্যাদর্শ নিয়েও অনেক কথা হয়েছে। বারবার বলেছেন অ্যারিস্টটল (খ্রি. পূ. ৩৮৪-খ্রি. পূ. ৩২২), লুঙ্গিনুস (খ্রিষ্টীয় ১ম শতক), মার্কোস কুইন্টিলিয়ান (৩৫-১০০), জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০), জোসেফ অ্যাডিসন (১৬৭২-১৭১৯), লর্ড কামেস (১৬৯৬-১৭৮২), রবার্ট ব্লেয়ার (১৬৯৯-১৭৪৬), অ্যালিসন ককবার্ন (১৭১২-১৭৯৪), এডমন্ড বার্কের (১৭২৯-১৭৯৭) লেখমালার কথা। ফ্রেডরিখ শ্লেগেলের (১৭৭২-১৮২৯) রচনাবলি পাঠের পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি জোর দিয়ে বলেছেন : অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বরূপ বুঝতে *Paradise Lost* বারবার পড়তে হবে। আরেকটি চিঠিতে (১৪ জুলাই ১৮৬০) লিখছেন, ইতালিয়ান ‘Ottava Rima’র মতো স্তবকে একটি ‘রোমান্টিক গাথাকাব্য’ রচনার দৃঢ় অভিপ্রায় আছে তাঁর। ওই চিঠিতেই *মেঘনাদবধ কাব্য* সম্বন্ধে বলেছেন, রামের যদি মানুষ সঙ্গী থাকত, মেঘনাদের মৃত্যুর ওপর তিনি দ্বিতীয় *Iliad* লিখতে পারতেন।

পাশ্চাত্যের এই ক্লাসিকগুলো, বিশেষত *Iliad*র প্রভাবেই মধুসূদনের হাতে *রামায়ণের* বিনির্মাণ সম্ভব হয়েছে। *Iliad*-এ পবন দেব যখন বিশ্বকর্মাকে আনতে চলেছেন, যমপুরীর যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়েছে তার সঙ্গে *মেঘনাদবধ কাব্যের* অষ্টম সর্গের

প্রথপুরীর বর্ণনার কোনো পার্থক্য নেই। দান্তে, ভার্জিল ও মিল্টন ততদিনে হোমারের ভাব ও ভাবনার দুনিয়া তাঁর মনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তার ফলেই নাতিদীর্ঘ এই মহাকাব্যে যুক্ত হতে পেরেছে প্রায় সাড়ে তিনশ পঙ্ক্তির প্রথপুরীর বর্ণনা। প্রাসঙ্গিক দৃশ্য বর্ণনার পক্ষে দীর্ঘ মনে হলেও *Aeneid*র অন্ধ-অনুসরণে এটি ঘটেছে। *Aeneid*-এ যমপুরীর বর্ণনা প্রায় চারশো পঙ্ক্তিব্যাপী। বিদেশি আদর্শ এভাবে অনুসরণ করাটা শিল্পী হিসেবে তাঁর পরিমিতিবোধ নষ্ট করছে কিনা এ-প্রসঙ্গে রাজনারায়ণকে তিনি লিখেছেন : ‘It is my ambition to engraft the exquisite graces of Greek mythology on our own...I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. (ক্ষেত্র, ১৯৬৩ : ১৮০) একই সীমাবদ্ধতার কারণে, *মেঘনাদবধ কাব্যের* শিব-উমা গ্রিক পুরাণের জিউস-হেরার মতো। জিউসের কন্যা এথেনার মতো মহামায়াকে স্বতন্ত্র দেবী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষন্দও জিউস-হেরার পুত্র আরেসের (যুদ্ধের দেবতা) মতো। মেঘনাদের অন্তিম পরিণতিও হেক্টরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের আচরণ পাট্রোক্লাসের মৃত্যুতে আথিল্লিওস বা হেক্টরের মৃত্যুতে প্রিয়ামোসের আচরণের মতো। প্রমীলা কিছুটা হেক্টরের স্ত্রী অ্যান্ড্রোম্যাকি আর কিছুটা তাসার কাব্যের রণরঙ্গিনী ক্লোরিভার মতো। আর গ্রিক সাহিত্যের ‘দৈবনির্বন্ধবাদ’ সমগ্র *মেঘনাদবধ কাব্যকেই* সবসময় আবৃত রেখেছে।

এছাড়া *মেঘনাদবধ কাব্যের* কয়েকটি ঘটনার ওপরেও *Iliad*র প্রভাব বেশ স্পষ্ট। *Iliad*-এ যেমন দেব-দেবীরা ছদ্মবেশে গ্রিকদের বা ট্রোজানদের পরামর্শ দিয়েছে, *মেঘনাদবধ কাব্যেও* ঘটেছে সেটিই। কাব্যটির দ্বিতীয় সর্গে উমার প্রসাধন ও শিবকে ভুলিয়ে রাবণের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা *Iliad*র চতুর্দশ সর্গের হেরার প্রচেষ্টার মতো। হোমারের দেবী থেটিস হেক্টরকে বধ করার জন্য দেবশিল্পী হেফাইস্টোসের মাধ্যমে দিব্যঅস্ত্র বানিয়ে নিয়ে পুত্র আথিল্লিওসকে দিয়েছিলেন; *মেঘনাদবধ কাব্যে* ইন্দ্রজিৎ-বধের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র মহামায়ার কাছ থেকে দিব্যঅস্ত্র নিয়ে গন্ধর্ব চিত্ররথের মাধ্যমে পাটিয়েছেন লক্ষ্মণের কাছে। *Iliad*-এ দেবতার প্রথমে কেউ গ্রিক, কেউবা ট্রোজানদের পক্ষে অলক্ষে যুদ্ধ করেছেন; পরে জিউস ক্ষান্ত করেছেন তাঁদের। *মেঘনাদবধ কাব্যের* দেবতার পুত্রশোকাতুর দুর্জয় রাবণের আক্রমণ থেকে রামকে বাঁচাবার জন্য তাঁর পক্ষে অস্ত্র ধরেছিলেন; পরে বিষণ্ন আদেশে গরুড় তেজ হরণ করা তঁরা বিরত হন। এছাড়া *মেঘনাদবধ কাব্যের* শেষ সর্গে ইন্দ্রজিতের সৎকার, *Iliad*র শেষ সর্গে বর্ণিত মহাবীর হেক্টরের সৎকার অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রাণিত।

অর্থাৎ গ্রিক পুরাণের পাশাপাশি গ্রিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিও যে মধুসূদন আয়ত্ত করেছিলেন, উপর্যুক্ত তুলনা থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) তাই *মাইকেল রচনা সম্ভারের* (১৯৫৯) ভূমিকায় গ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই মধুসূদনের কাব্য-বিচার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, পূর্ব-সংস্কার মুক্তি, অখণ্ড

সৌন্দর্য সৃষ্টি, মানবরস এবং ঋজু দৃষ্টিভঙ্গি, গ্রিক জীবনের এই চারটি বিশিষ্টতা মধুসূদনের কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে; আর পূর্ব সংস্কার মুক্তির বলেই রামায়ণের কাহিনিকে বিনির্মাণের পাশাপাশি তিনি বিদেশি কাব্য-রীতিও বাংলা ভাষায় প্রবর্তন করতে পেরেছেন। *মেঘনাদবধ কাব্যে* বিধৃত গ্রিকদের 'The Heroic Code' সে-সাক্ষ্যই বহন করে। গ্রিকদের কাছে সেই 'Code' হলো ব্যক্তির বীরত্ব, অহংকার ও খ্যাতির পূর্ণ বিকাশ (constant striving for excellence and to surpass)। *মেঘনাদবধ কাব্যে* 'ব্যক্তির' এমন বীরত্ব দেখা গেছে মেঘনাদ ও রাবণের মধ্যে। নিকুন্ডিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র অবস্থায় যখন আক্রান্ত হয়েছেন, মেঘনাদ ভয় পাননি। লক্ষ্মণকে বলেছেন, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আবার যুদ্ধে তিনি প্রস্তুত। ব্যক্তিগত সেই বীরত্ব দেখাবার সুযোগ লক্ষ্মণ তাঁকে দিতে চাননি বলেই তাঁকে তিনি 'তক্ষর' বলে নিন্দা করেছেন।

মেঘনাদ যেমন দেবতাদের অপকীর্তি স্মরণ করে নিরস্ত্র লক্ষ্মণকে আঘাত করেননি, রাবণও তেমনি রণভূমিতে কোনো দেবতার আশীর্বাদে বিজয়ী হতে চাননি। রাবণ বা মেঘনাদের এই আত্মনির্ভরশীলতা হোমারিক বীরত্বেরই লক্ষণ : 'The moststriking single feature of the Homeric ethos is the enormous importance attached to individual prowess, individual pride, individual reputation.' (Hadas, ১৯৫০ : ৮২) ব্যক্তিগত এই কীর্তিকে বৃহৎভাবে দেখতে পারার কারণেই গ্রিকরা তাদের বীরদের স্মৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মের প্রেরণা হিসেবে দেখেছে। সেই বীরদের ভাস্কর্যগুলি তাই বাস্তবের কোনো অনুকৃতি নয়, তাঁদের আদর্শেরই রূপায়ণ। তারই অনুসরণে *মেঘনাদবধ কাব্যে* উঠে এসেছে : 'ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে/ লক্ষ রক্ষণশিল্পী আশু নির্মিল মিলিয়া/ স্বর্ণ পার্টিকেলে মঠ চিতার উপরে;—/ ভেদি অভ্র, মঠ চূড়া উঠিল আকাশে।' (মাইকেল, ২০১৭ : ১১৭) মেঘনাদের চিতার এই বিবরণ গ্রিক পৌরাণিক আদর্শে স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভেরই অনুপ্ররক। কিন্তু মধুসূদনের পরিপ্রেক্ষিত-জ্ঞান এখানে এমন প্রখর যে, হেক্টরের চিতা নির্বাচিত হয়েছিল মদ ঢেলে, আর মেঘনাদের চিতা ধৌত করা হয়েছে 'জাহ্নবীর জলে'। হেক্টরের স্মৃতিস্তম্ভ *মেঘনাদবধ কাব্যে* হয়ে গেছে 'মঠ'।

গ্রিক ছাড়াও ল্যাটিন ও ইতালিয়ান সাহিত্যের স্বাদও মূল ভাষাতেই গ্রহণ করেছিলেন মধুসূদন। বিশেষ করে দান্তে এবং তাসোর খুব ভক্ত ছিলেন তিনি। একাধিক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, মিল্টনের সাহিত্যপাঠের সূত্রেই এই দুজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। পরে সম্পর্কটি নিবিড় হয়েছে। *মেঘনাদবধ কাব্যের* অষ্টম সর্গের নরক বর্ণনার ক্ষেত্রে মধুসূদন তাই দান্তে, ভার্জিল ও মিল্টনকে একই পটে জারিত করতে পেরেছেন। দান্তের কাছে তাঁর ঋণ এক্ষেত্রে পরোক্ষ। দুটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। মধুসূদনের পরিকল্পিত তোরণের মুখে লেখা ছিল : 'এই পথ দিয়া/ যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে;—/ হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা প্রবেশ এ দেশে।' (মাইকেল, ২০১৭ : ১০৪) আর দান্তের নরকের মুখে লেখা ছিল : 'All hope abandon ye who enter

here.' (Cary ২০১৪, ১০) *Paradise Lost* এ মিল্টন তাঁরই অনুসরণ করে বলেছেন : 'Hope never comes that comes to all.' (Abrahm and Greenblatt, ২০০০ : ৮১৫) এছাড়া মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে প্রমীলার বিলাপ আর্মিডার বিলাপের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রমীলা-চরিত্রটির ওপর ক্লোরিডার প্রভাবও বিশেষভাবে অনুমেয়। তবে দান্তের চেয়ে ল্যাটিন ভার্জিলের কাছে প্রত্যক্ষভাবে মধুসূদন অনেক বেশি ঋণী। মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে নরক দর্শনের পূর্বে রামচন্দ্র দেখেছেন : 'অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত!/ বহিছে পরিথারূপে বৈতরণী নদী/ বজ্রনাদে; রহি রহি উথলিছে বেগে/ তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ/ উচ্ছসিয়া ধুমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে।' (মাইকেল, ২০১৭ : ১০৩) আর ভার্জিলের *Aeneid*-এ দেখা যায় : 'Aeneas suddenly looked back, and, below the left hand cliff, he saw wide battlements, surrounded by a triple wall, and encircled by a swift river of red-hot flames, the Tartarean Phlegethon, churning with echoing rocks.' (Kline, ২০১৪ : ৬৩৫) বিষয়টিকে *Paradise Lost*-এ দেখা গেছে এভাবে : 'He views the dismal situation, waste and wild; A dungeon horrible, on all sides round, As one great furnace flamed, yet from the flames no light, but rather darkness visible Served only to discover sights of woe.' (Abrahm and Greenblatt, ২০০০ : ৮১৬) মধুসূদনের বর্ণনায় সেটি উঠে এসেছে ভার্জিল ও মিল্টন দ্বারা জারিত হয়ে : 'সহসা পুরিল-/ ভৈরব আরাবে বন, পলাইল রড়ে/ ভূতকুল, গুরু পত্র, উড়ি যায় যথা/ বহিলে প্রবল বড়!' (মাইকেল, ২০১৭ : ১০৬) এই উপমা হোমার, ভার্জিল ও দান্তের মধ্যেও আছে। *Aeneid*-এ দেখা যায় : 'Thick as the leaves in autumn strew the woods. ...the army stands.' (Kline, ২০১৪ : ৬৩৮) *Paradise Lost*-এ : '... and called His legions, Angel forms, who lay embraced, Thick as autumnal leaves that strew the books In Vallombrosa.' (Abrahm and Greenblatt, ২০০০ : ৮১৩) এছাড়া কাব্যটিতে *Aeneid*র প্রভাব আরও বহু ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। সবচেয়ে বেশি তা দৃশ্যমান প্রেতপুরীর বর্ণনায়। প্রেতপুরীর দিকে রামচন্দ্রের প্রথম যাত্রার সময় মধুসূদন বলেছেন : 'চলিলা রাঘব শ্রেষ্ঠ, তিমির কানন—/ পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে/ সুধাংশুর অংশ পশি হাসে সে কাননে।/ আগে আগে মায়া দেবী চলিলা নীরবে।' (মাইকেল, ২০১৭ : ১০৩) আর *Aeneid*র 'Descent to Hades'-এ দেখা যায় : 'It was such a trip as one takes in the forest under the treacherous light of a feeble moon, when Jupiter has hid the heavens in shadow and the dark night has taken away colour from nature.' (Kline, ২০১৪ : ৬৫৮) নরক বর্ণনায় মধুসূদন লিখেছেন : 'যমদূত হানে দণ্ড মন্তক-প্রদশে;/ কাটে কৃমি, বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী/ উড়ি পড়ি ছায়া দেহে ছিঁড়ে নাড়ী ভুঁড়ি/ হুহুকারে!' (মাইকেল, ২০১৭ : ১০৫) *Aeneid*এ বলা হয়েছে : 'A huge vulture with

a hooked beak, plucking the evergrowing. lever and the vitals, tears at the feast and lives under the high breast of Tityus.’ (Kline, ২০১৪ : ৬৪৪) নরক অতিক্রম করে রাম দেখেছেন রম্যকানন আর স্বর্ণসৌধ। পশ্চিম দ্বারে দেখেছেন, বংশ-প্রদীপ দিলীপ সুদক্ষিণার সঙ্গে স্বর্ণাসনে বসা (অন্যান্য পূর্বপুরুষেরাও এখানে এসে বসেন)। তাঁদের এই সাক্ষাৎ বর্ণনায় মধুসূদন *Aeneid*-এর Book VI-র ‘Elysian Fields’র অনুসরণ করেছেন। অবহবধং তাঁর পিতা Anchisesর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে এমন ‘field’-এ পৌঁছেছিলেন। আর মধুসূদন বলেছেন : ‘সত্যযুগ-রণে/ সম্মুখ সমরে হত রথীশ্বর যত,/ দেখ এই ক্ষেত্রে আজি ক্ষত্রচূড়ামণি।’ (মাইকেল, ২০১৭ : ১০৯) ভার্জিলও *Aeneid*র সেই ‘fields’এ ‘The ancient race of Teucer, a most illustrious progeny, great heroes born in better years’র (Kline, ২০১৪ : ৬৯৮) বর্ণনা দিয়েছেন। দশরথের সঙ্গে রামের মিলন-দৃশ্যটি Anchisesর সঙ্গে Aeneasর মিলনদৃশ্যের মর্মানুবাদ।

পাশ্চাত্যের উপর্যুক্ত কবিগণের মধ্যে হোমার সাফো ভার্জিল দান্তে তাসো, সকলেই মধুসূদনের প্রিয়; কিন্তু তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন মিল্টন। এ-প্রসঙ্গে গৌরদাস বসাককে লিখছেন : ‘Some say it is better than Milton - but that is all bosh - nothing can be better than Milton, many say it licks Kalidas. I have no objection to that. I don't think it is impossible to equal Vergil and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets, Milton is divine.’ (ক্ষেত্র, ১৯৬৩ : ১৫৭) আরেকটি চিঠিতে লিখেছেন, মিল্টনের Satanর মহত্ত্ব মুগ্ধ করেছে তাঁকে। (ক্ষেত্র, ১৯৬৩ : ১৫৮) মিল্টনের মহাকাব্য-প্রতিভা যেহেতু Satan-এর মধ্য দিয়েই প্রকাশিত, রাবণের ‘elevation of mind’র দিকে মনোযোগ রেখে তার মধ্যেও মধুসূদন সেই মহত্ত্ব রক্ষার প্রয়াস করেছেন। এছাড়া প্রথম সর্গে বারুণী-মুরলা প্রসঙ্গও মিল্টনের *Comus*র সেবার্ন নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সারিনা ও লিজিয়ার কথোপকথন অনুসরণে রচিত। তৃতীয় সর্গে প্রমীলা ও মেঘনাদ মৃত্যুপুরী লঙ্কায় যখন সোনার সিংহাসনে বসেছেন, চারদিকের আনন্দ আর নৃত্যোৎসবকে লক্ষ করে মধুসূদন লিখেছেন : ‘ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর মাঝারে,/ গায় পাখী।’ (মাইকেল, ১৮৭৪ : ১৩৮) আসন্ন বিচ্ছেদের সংকেত সৃষ্টিতে মধুসূদনের এই দক্ষতা মিল্টনের প্রায় সমান। *Paradise Lost*র চতুর্থ সর্গে অ্যাডাম ও ইভের মিলনের সময় মিল্টনও ইভের সঙ্গে প্যানডোরার তুলনা করে একইরকম ট্রাজেডির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। এছাড়া মধুসূদন ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার জাগরণ বর্ণনা করেছেন *Paradise Lost*র পঞ্চম সর্গে অ্যাডাম ও ইভের নিদ্রাভঙ্গের বর্ণনা অনুসরণে। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণ যেমন ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছেন (‘বিধি-বুধি কেমনে/ তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে’) কিন্তু কখনও মিনতি করেননি ভগবানের কাছে; *Paradise Lost*র SatanI তেমনি বলেছে : ‘Since by fate the strength of Gods/ And this empyreal substance cannot fail.’ (Abraham and

Greenblatt, ২০০০ : ৮১৮) গ্রিক এই 'fate'র প্রতাপ মিল্টনের মতো মধুসূদনকেও আকৃষ্ট করেছে, তার সুযোগ নিয়েই মধুসূদন এই কাব্যে দেখিয়েছেন মনুষ্যত্বের বিজয়সূচক চূড়ান্ত লীলা।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবসম্পদ থেকে আহরিত এইসব আকরণের ঋণ মধুসূদন স্বীকারও করেছেন একাধিক পত্রে। গর্বভরে বলেছেন : 'I am too proud to stand before the world in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit.' (ক্ষেত্র, ১৯৬৩ : ১৬১)

৬

'বাংলা কাব্যের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত', এই জিজ্ঞাসার উত্তরে মধুসূদন একদা বলেছিলেন : 'beautiful ... tender and pathetic, with a dash sublimity.' (নগেন্দ্রনাথ, ১৯৫৩ : ৭৪৮) এই চিন্তারই পরিপূরক তাঁর 'কবি' শীর্ষক কবিতাটি। সেখানে তিনি বলেছেন : 'সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী/ যা'র মনঃকমলেতে পাতেন আসন/ অন্তগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি'/ ভাবের সংসারে তা'র সুবর্ণ-কিরণ।' (মাইকেল, ১৯২২ : ১১) অর্থাৎ 'অন্তগামী সূর্যের প্রভার মতো যাঁর ভাবের বিভা' এবং 'যাঁর মনঃকমলে কল্পনাসুন্দরী আসন পেতে থাকেন' তিনিই মূলত কবি। কবি-চরিত্রের এমন বৈশিষ্ট্য নির্দেশকালে মধুসূদন তাঁর মহাকবি-সত্তাকেই কেবল প্রাধান্য দিয়েছেন। অথচ একাধিক পত্রে নিজের গীতপ্রবণতার কথাও স্বীকার করেছেন তিনি (দ্র. ক্ষেত্র, ১৯৬৩)। উনিশ শতকের গীতিকবিতার বিকাশ তাঁর 'ধ্রুপদী প্রতিভার' প্রভাবে বিলম্বিত হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই মেজাজ অনুযায়ী 'ভাষা-নির্মাণের ক্ষমতা' এবং তাঁর 'সঘন শব্দপুঞ্জ' বাংলা কবিতার জন্য অপকারীও হয়েছে। 'স্থূল' কবিগানের জনপ্রিয়তার যুগে কাব্যভাষায় ধ্রুপদী ওজস্বিতা এনে সামাজিক ভাষার নৈকট্য থেকে বাংলা কবিতাকে তিনি বঞ্চিত করেছেন। সে-কারণে জীবনব্যাপী তাঁর নিরলস সাধনায় সম্ভাবনায়ুক্ত হলেও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য থেকে মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত বিকশিত তাঁর কবিতা 'চেতনা' ও 'প্রতিকল্পে' কখনও সংশয়মুক্ত হতে পারেনি। ইংরেজি রোমান ইতালীয় গ্রিক প্রভৃতি ভাবসম্পদ ও আঙ্গিকের কাছে নির্বিচারভাবে দ্বারস্থ হওয়ার ফলে তাঁর সমস্ত কাব্যপ্রয়াস কখনও বিষয় ও ভাবে, উদ্দেশ্য ও প্রেরণায়, আঙ্গিকে ও অলংকারে অর্জন করতে পারেনি সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা। এছাড়া বিবিধ উৎস থেকে গ্রহণ-বর্জন এবং যুগমানসের সঙ্গে সংশ্লেষের ক্ষেত্রে তাঁর পুরো কাব্যপ্রকল্পনায় ভাবনার সংগতি এবং কবিচেতনায় পরিমিতির অনটনও এত তীব্র যে, তাঁর সামগ্রিক কাব্য-পরিস্থিতিই ভীষণ এক 'অতৃপ্তিমুখর বেদনায়' জর্জরিত এবং প্রভূত সম্ভাবনা ও স্বপ্ন নিয়ে পরিপূর্ণতার জন্য উন্মূখ। কেননা উনিশ শতকের যুগায়তনের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-উজ্জীবনের মোড়কে রোমান্টিক উদাসীনতার 'দ্বিচারিতা' নিয়ে মধুসূদনের প্রায় সমস্ত কাব্যের বিস্তার। সে-কারণেই প্রায় সবগুলি কাব্যে তিনি ধ্রুপদী-সৌন্দর্যের সৌধ-নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কবি-ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণ সেখানে তাই হয়ে পড়েছে গৌণ।

ভারতবর্ষের নিজস্ব রূপের সংশ্লেষণও সেখানে নিরালম্ব বা স্বাধীন। স্বাধীন সেই ইচ্ছা থেকেই তাঁর মহাকাব্যও ভারতবর্ষের পৌরাণিক এক বিষয়কে অঙ্গীভূত করেছে মাত্র, কিন্তু উপনিবেশিত মনোবীজের অংকুরায়নের কারণে উনিশ শতকের সমবায়ী সাহিত্যধারা থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। শিল্পরূপে তাঁর ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির প্রকাশ সে-কারণে কেবল ব্যক্তিকবির দুঃখবোধ ও হতাশাজাত উচ্চারণে : ‘আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হয়।’ (শ্রীমধুসূদন, ১৮৬১ : ৬) এতটা আত্মকেন্দ্রিক উচ্চারণ বাংলা কবিতায় এর আগে কখনও ছিল না; কেননা তাঁর কবিতার পটভূমিতে ব্যক্তিগত স্বার্থবাদীতার প্রত্যক্ষ যতো প্রেরণা আছে, ইংরেজরা আসার আগে সমাজেই ছিল না সেটি। ইংরেজরা আসার পর সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের মাধ্যমে শতবর্ষ ধরে এই মানুষদের নির্মাণ করা হয়েছে। তাঁদের প্রতিনিধি মধুসূদন তাই ‘সিপাহি-বিপ্লবের’ ব্যাপারে সারা জীবনই ছিলেন ভীষণ নির্লিপ্ত।

মধুসূদন যখন বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তি-মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীনতার মূল্য অন্বেষণে মশগুল, পাশ্চাত্যে তখন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে বিচিত্র ঘটনা ঘটছে। সাহিত্য সেখানে বিচার্য হচ্ছে সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি ও গ্রহণ-বর্জনের অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে। জঁ-জাক রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) *Social Contract*, টম পেইনের (১৭৩৭-১৮০৯) *Age of Reason* ও *Rights of Man* তখন পাশ্চাত্যের সারস্বত সমাজে বহুলাদৃত। মানুষের রোমান্টিক অধিকারের চর্চা সেখানে এরই মধ্যে (১৭৯০-১৮৩২) পুরানো হয়ে পড়েছে। সেখানকার সমাজ ও সাহিত্যকে তখন বিচলিত করে তুলেছে বিবর্তনবাদসহ বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। মধুসূদন এসব জানতেন; তবুও নিজের সময়ের সাহিত্য-ধারার পরিপ্রেক্ষিতে ‘মহাকাব্যের গতায়ু অহমিকা ও আভিজাত্য নিয়ে’ তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্য* রচনা। বিশ্বসাহিত্যের ধারায় যাকে বেশ ‘বিলম্বিত’ এবং বাংলা সাহিত্যের ধারায় ‘আকস্মিক’ বলা যায়। শিল্পাঙ্গিকের বিবেচনায় বাংলা সাহিত্যের জন্য যা একটি বিরাট ‘উচ্চাভিলাসী উল্লসফন’। কেননা এর মর্মে যুগচেতনা ছাড়াও ক্রিয়া করেছে ধ্রুপদী ভারতবর্ষের ‘পুরাণ-বাহিত সাহিত্যিক প্রেরণা’। তার মাধ্যমে মধুসূদন মূলত তাঁর সমকালের ঐতিহাসিক দায়কে উপেক্ষা করে গেছেন। ভালোভাবে ইউরোপীয় কয়েকটি ভাষা জানা এবং মাদ্রাজে বসবাসের কারণে তিনি ছিলেন তাঁর কালের অন্যান্য লেখকের চেয়ে প্রাগ্রসর। কবিতার আঙ্গিক-নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর সেই অভিজ্ঞতা ও যাপিত-জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই প্রাধান্য পেয়েছে। এল. ডি. লারনার (১৮৭৫-১৯৪৯) হয়ত সে-কারণেই বলেছেন, ‘Form is never arbitrarily chosen by a Renaissance poet. (জীবেন্দ্র, ১৯৬৫ : ৭৯) মধুসূদনের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য, কেননা সিপাহি-বিপ্লবের পরও তিনি উপনিবেশিক শাসনের সরাসরি কোনো প্রতিবাদ করেননি। ‘মধ্যবিস্ত্র শ্রেণিস্বার্থ’ ছাড়াও উপনিবেশিক অর্থনীতি ও বর্ণবাদী উচ্চমন্য সামাজিক রাজনীতির অনেক কারণ সেখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করেছে। স্বজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কৌশলী হয়েছেন তিনি;

মেঘনাদবধ কাব্যের ‘রাবণ’ তাঁর সেই কৌশলী উদ্যোগেরই বহিঃপ্রকাশ। তারপরও ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারাবাহিক বিকাশের একটি ফলকে তাদের দ্বারা অধিকৃত একটি দেশে আরোপ করলে, সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের একটি গুরুতর লক্ষণ হিসেবেই তাকে শনাক্ত করতে হয়; কেননা পাশ্চাত্যের ‘রোমান্টিক শিল্পাদর্শ’ তাঁর মতো নব্য-শিক্ষিত গোষ্ঠীর উপনিবেশিত মনের সমর্থন পেয়েই বাংলা কাব্যে উপনিবেশায়ন সংঘটনের সুযোগ পেয়েছে। শিল্পবিপ্লবের উপজাত হিসেবে ‘ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের’ উত্থান এবং ‘প্রযুক্তি ও যুক্তিবাদের’ পরাক্রমতায় পাশ্চাত্য যখন ‘সমস্ত আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা’ হারিয়ে ফেলছে, সেই আশ্রাসন থেকে নিজেদের মনোবিশ্বকে রক্ষা করতে স্বভাবতই তাঁরা ‘রোমান্টিকতাবাদকে’ আশ্রয় করে তৎপর হয়েছে পুনর্বীর উজ্জীবনের আশায়। অর্থাৎ বিজ্ঞানসত্যের প্রভূত প্রভাবে পশ্চিমের দুনিয়া ক্রমশ যখন মমতাহীন ও রহস্যরহিত, তার প্রতিকার রূপেই শিল্প-সাহিত্যে রোমান্টিক বিস্ময়রসের আয়োজন করেছে পাশ্চাত্যের মানুষ। ভারতবর্ষেও সেই খবর পৌঁছেছিল, নিজের চোখে দেখেও এসেছেন অনেকেই, কিন্তু সেই বাস্তবতা এখানকার ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই স্পষ্টরূপ পায়নি। সত্য ও সুন্দরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অনুভববেদ্য সামাজিক রূপকে অস্বীকার করার আত্মাযোগ্য কোনো যুক্তিও তাই কখনও সত্যরূপ পায়নি এখানে। সে- কারণে বিভিন্ন পরিকল্পিত উদ্যোগে সৃষ্ট উপনিবেশিত মনন-সংকট থেকে মধুসূদনের কাব্যে সূচিত হয়েছে যে ‘জনবিচ্ছিন্নতা’, তার আরও ঘনীভূত রূপকে (সচেতন পুরাণপ্রীতি) উনিশ শতকের শেষ পর্বের কবিতার জন্য ইতিবাচক হিসেবে গণ্য করা যায় না। তবুও সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের মাধ্যমে প্রায় একশ বছর ধরে গড়ে ওঠা উপনিবেশিত সামাজিক প্রতিবেশের এই লেখক ইউরোপের প্রুপদী যুগের বাস্তবতাকে নিজেদের জীবনের আকল্প কল্পনা করে তাঁদের চিরায়ত মূল্যবোধকে বাংলা কাব্য ও বাঙালির পরিণতির পক্ষে ইতিবাচক হিসেবে প্রচার করার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপনিবেশিক প্রতিষ্ঠাকেই শক্তিশালী করেছেন। সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের সমস্ত উপায়ের মধ্যে সাহিত্যের মাধ্যমে উপনিবেশায়নের পন্থাটি যেহেতু অধিক কার্যকর, শাসকগোষ্ঠীর প্রভূত পৃষ্ঠপোষকতা ও উপনিবেশিত মননের কবি মধুসূদনের যুগান্তকারী প্রভাবে এই পথেই নির্ধারিত হয়েছে বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ।

টীকা

১. ব্রাহ্মণ্যবাদী কিছু পণ্ডিত রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধেও ছিলেন। যেমন, আচার্য কাশীনাথ তর্কবাগীশ (১৭৭৬-১৮৪৪)। রামমোহনের *সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ* (১৮১৮) গ্রন্থটির উত্তরে রক্ষণশীলদের পক্ষে তিনি রচনা করেন *বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ* (১৮১৯)। তার উত্তরে রামমোহন প্রণয়ন করেন *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ* (১৮২০)।

২. সাহিত্য ছাড়া আরসব বিষয়ের পড়াশোনায় মোটেও ভাল ছিলেন না মধুসূদন। অঙ্কে একেবারেই আগ্রহ ছিল না, আর চূড়ান্ত পরীক্ষায় সবসময়ই ছিলেন মাঝারি। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের আগে হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় তিনি পেয়েছিলেন পঞ্চাশের মধ্যে ত্রিশ। অষ্টম হয়েছিলেন। প্রথম হয়েছিলেন গোবিন্দ দত্ত (১৮২২-১৮৮৬), পেয়েছিলেন উনপঞ্চাশ। দ্বিতীয় হয়েছিলেন প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫)। তিনি পেয়েছিলেন সাতচল্লিশ। একবার মাত্র, অন্যরা যে অঙ্ক পারেননি, সেটি দ্রুত করে দিয়ে বন্ধুদেরকে মধুসূদন বলেছিলেন: ‘দেখলে তো শেক্সপিয়র চাইলে নিউটন হতে পারতেন কিন্তু নিউটন কখনও শেক্সপিয়র হতে পারতেন না’ (যোগীন্দ্রনাথ, ১৯০৫: ৪২)।
৩. এ-ব্যাপারে অবশ্য তাঁকে একা দোষারোপেরও সুযোগ নেই। হিন্দু কলেজের সিলেবাসে তখন বাংলা অনুবাদে পড়ানো হতো এগারো শতকের কবি কৃষ্ণমিশ্র রচিত সংস্কৃত নাটক *প্রবোধচন্দ্রোদয়*। তৎকালীন ‘অপরিণত বাংলা গদ্যে’ দুর্বোধ্য ওই অনুবাদটির বদলে ছাত্ররা পাচ্ছিল উইলিয়াম শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬), ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬), ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) বা লর্ড বায়রনের সুললিত লেখাগুলি। যার প্রভাবে মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ লেখকেরা, যেমন রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) বা প্যারীচাঁদ মিত্ররা (১৮১৪-১৮৮৩) কৈশোরে বা যৌবনে বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাননি। তাঁর সামসময়িকদের মধ্যে ‘স্কুল অব রাইটার্স’ খ্যাত শশীচন্দ্র দত্ত (১৮২৪-১৮৮৫), গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (১৮২৮-১৮৮৪) এবং উত্তরসূরীদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮), নবকৃষ্ণ ঘোষ/ রাম শর্মা (১৮৩৭-১৯১৮), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯), তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬০-১৯১৩), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮) ইংরেজিতে কবিতা রচনা করেছেন। এছাড়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক *The Persecuted* (১৮৩১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) উপন্যাস *Rajmohan's Wife* (১৮৬৪) এবং শশীচন্দ্র দত্তের (১৮২৪-১৮৮৬) গল্পগ্রন্থ *Times of Yore* (১৮৭৪) ইংরেজিতে রচিত। এই তালিকার কিছু ব্যক্তি ছাড়াও উনিশ শতকের বাঙালি লেখকদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, কোনো বয়সেই কখনও তাঁরা বাংলা লেখেননি এক বর্ণও। সে-কালের লেখকদের এমন প্রবণতা থেকে বোঝা যায়, মধুসূদন দত্তের ইংরেজিপ্রীতি তাঁর কাল থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়।
৪. মাদ্রাজে বসবাসকালে রুটিন মেনে বিভিন্ন ভাষা শেখা প্রসঙ্গে বাল্যবন্ধু রাজনারায়ন বসুকে মধুসূদন লিখেছেন: ‘Here is my routine: 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers’ (ক্ষেত্র, ১৯৬৩: ১১৩)?
৫. *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* প্রথম প্রকাশের সময় কবির কোনো নাম ছিল না। সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) কাব্যটির কৃতিত্ব দিয়েছিলেন ‘কোনো এক সুচতুর কবিকে’। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে, কাব্যটি মধুসূদন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।
৬. *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* উল্লিখিত হয়েছে: সিদ্ধবসনা তারাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন সোমদেব। এমনই সে উত্তেজনা যে, সব কিছু ভুলে তিনি অপহরণ করেন গুরুপত্নীকে। তারা যথাসাধ্য বাধা দেন, বারবার মনে করিয়ে দিতে থাকেন, কে তিনি? পতিব্রতা গুরুপত্নীকে জোরপূর্বক হরণ করলে যে সহস্র ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়, সে-কথাও জানাতে তিনি ভোলেননি। কামোন্মত্ত সোমদেব তাঁর কথা না মেনে নানা স্থানে তাঁকে নিয়ে যান,

- মেতে ওঠেন উদ্দাম রমণে। অবশেষে ব্রহ্মা ও মহাদেবের মধ্যস্থতায় বৃহস্পতি তাঁর স্ত্রীকে ফিরে পান। তারা ততদিনে গর্ভবতী, জন্ম হয় বুধের।
৭. মহামতি অঙ্গিরার পুত্র উতথ্য ছিলেন বৃহস্পতির বৈমায়েয় দাদা। উতথ্যর স্ত্রী মমতা যখন গর্ভবতী, মমতার অসম্মতি সত্ত্বেও বৃহস্পতি তাঁর সঙ্গে রমণে উদ্যত হন। যথাসাধ্য বাধা দেন মমতা। এমনকি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানটিও মায়ের জরায়ুপথ আটকানোর চেষ্টা করে। সন্তোষ ব্যাহত হওয়ায় ক্রুদ্ধ দেবগুরু বৃহস্পতি সেই সন্তানকে অন্ধত্বের অভিশাপ দেন। মমতাও পালটা অভিশাপ দেন বৃহস্পতিকে: এক দিন তাঁর স্ত্রীও পরপুরুষের ভোগ্যা হবেন। মনে করা হয়, তারার নারীত্বের অবমাননা সে-কারণে অনিবার্য ছিল। বিকৃতকাম এক পুরুষের লালসার ফলে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এসে অন্য এক পুরুষের (সোমদেবের) কামনার শিকার হন নিরপরাধ এক নারী।
৮. *বীরঙ্গনা* কাব্যের প্রায় দশ বছর পরে আসামের কবি রামকুমার নন্দী (১৮৩৩-১৯০৫) রচনা করেন *বীরঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য*। সোমদেব সেখানে বলেছেন: ‘কলঙ্কী শশাঙ্ক কেহ বলে নাই সতি! এত দিন, কিঙ্কর তব ভবিষ্যত-কথা/ দৈববাণী সম এবে ফলিবে দাসেরে;/ ধরিবে কলঙ্ক এ কিঙ্কর তব নামে—/ শোভিবে সোমের অঙ্কে সে কলঙ্করেখা,/ ভৃগুপদচিহ্ন যথা মাঘবের হৃদে / তারানাথ নাম মম তেয়গিয়া আজি,/ হইব তারার দাস জনমের মত’ (রামকুমার, ১৮৯৮: ৪৬)!
৯. কৃত্তিবাস ওঝা *রামায়ণ* অনুবাদ শুরু করেন ১৪১৫ সালে। গৌড়ের রাজা গণেশ দেবের নির্দেশে। দোদগু মুসলিম শাসন আমলেও কোনো ঐতিহাসিক পরম্পরা ছাড়াই হঠাৎ তিনি সিংহাসন দখল করেছিলেন। টিকেছিলেন মাত্র বছরতিনেক: ১৪১৪ থেকে ১৪১৮ পর্যন্ত। দিল্লীর মুসলিম শাসকের হাতে তার মৃত্যুর পর, প্রাণ ও রাজ্য রক্ষার্থে ধর্মান্তরিত হয়ে জালালউদ্দিন নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র। কবিকে তিনি এমনভাবে অনুবাদটি শেষ করতে বলেন, যাতে তাঁর পিতার ইচ্ছাও পূরণ হয় আবার মুসলিম শাসকেরা রুষ্ঠও না হন। কৃত্তিবাস তখন রামায়ণের অনুবাদে জুড়ে দেন ‘দস্যু রত্নাকরের ঋষি হওয়ার গল্প’, লক্ষণরেখার ধারণা, ‘দেবী-দুর্গার অকালবোধন’, ‘সতীত্বের জন্য সীতার অগ্নি-পরীক্ষার’ মতো অনেকগুলি বিষয়। *বাঙ্গালীকি রামায়ণে* এসব নেই।
১০. শব্দটি ‘কৃত্তিবাস’ হওয়া উচিত। *রামায়ণ* অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝার নামের বানান এমনই।
১১. পুরাণ অনুসারে মা রাক্ষস-রাজকন্যা হলেও রক্তেশ্বর রাবণের পিতা ছিলেন ঋষি বিশ্রব। সে-কারণে রাক্ষসরাজ হয়েও জন্মসূত্রে তিনি ব্রাহ্মণ।

সহায়কপঞ্জি

- অজিতকুমার ঘোষ [সম্পা.] (১৯৪২)। *মধুসূদন-রচনাবলী*। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
 কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৯০৮)। *বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন*। সারস্বত প্রকাশিকা, কলকাতা।
 ক্ষেত্র গুপ্ত [সম্পা.] (১৯৬৩)। *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী*। গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা।
 গোলাম মুরশিদ (২০১৩)। *আশার ছলনে ভুলি*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
 জীবেন্দ্র সিংহরায় (১৯৬৫)। *আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা* (সনেট, উনিশ শতক)। ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা।
 দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য [সম্পা.] (১৯১৯)। *সতীক মেঘনাদবধ কাব্য*। স্বর্ণা প্রেস, কলকাতা।
 নগেন্দ্রনাথ সোম (১৯৫৩)। *মধুস্মৃতি*। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা।
 ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ (১৯১৫)। *দুর্গোৎসব পদ্ধতি*। সরস্বতী বিদ্যামন্দির, কলকাতা।
 মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮৭৪)। *মাইকেল মধুসূদন-গ্রন্থাবলী*। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।
 —(২০১৭)। *মধুসূদন রচনাবলী* [সম্পা. ক্ষেত্র গুপ্ত]। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

- মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা.] (২০০৪)। *মনুসংহিতা*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।
- মোহিতলাল মজুমদার (১৯৬৩)। *কবি শ্রীমধুসূদন*। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রা. লি., কলকাতা।
- যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৯০৫)। *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত*। সান্যাল এন্ড কোম্পানী, কলকাতা।
- রামকুমার নন্দী (১৮৯৮)। *বীরঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য*। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা।
- শ্রীমধুসূদন দত্ত (১৮৬১)। ‘আত্মবিলাপ’। *বিবিধ-কাব্য* [সম্পা. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস]। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।
- সুরেশচন্দ্র মৈত্রী (২০২০)। *বাংলা কবিতার নবজন্ম*। রত্নাবলী পাবলিশার্স, কলকাতা।
- হায়াত মামুদ (২০১৮)। *মেঘনাদবধ কাব্য* (গদ্যে কাহিনি-রূপান্তর)। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
- Abrahm, MH and Stephen Greenblatt [eds.] (2000). *Anthology of English Literature*. Norton, New York.
- Cary, HF [trans.] (2014). *ŌCanto IIIŌ. The Vision or Hell. Purgatory and Paradise of Dante Alighieri*. volume I (Hell). Taylor and Hessey, London.
- Hadas, Moses (1950). *A History of Greek Literature*. Columbia University Press, New York.
- Halhed, Nathaniel Brassey (2018). *A Grammar of The Bengali Language*. Journeymen Books, Dhaka.
- Hall, JB (2023). *The Heroides*. Cambridge Scholars Publishing, UK.
- Kline, AS [trans]. (2014). *The Aeneid*. Create Space Independent Publishing Platform, UK.
- Michael Madhusudan Dutt (1849). *The Captive Ladie*. Advertiser Press, Madras.

মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ

সাহিত্যিক

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬ ব. ঃ ১৯৫৯ খ্রি.

ru.ac.bd/bangle/bangle-journal-shahittyki

Print : ISSN 1994-4888

বর্ষ : ৬৬ সংখ্যা : ৫৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ ঃ মে ২০২৫

প্রকাশকাল : মে ২০২৫

প্রবন্ধ জমা : ২২ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রবন্ধ গৃহীত : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পৃষ্ঠা : ৮৩-৯৭

তিতাস একটি নদীর নাম : অন্ত্যজ নারীর অন্তর্দর্শন

মোছাঃ রওশন আর

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

ই মেইল : rawson.shetu@gmail.com

সারসংক্ষেপ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) বাংলাদেশের সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাকার। সাহিত্যিক প্রবণতায় তিনি স্বতন্ত্রতায় ভাস্বর। তিতাস একটি নদীর নাম তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও আলোচিত সাহিত্যকর্ম। ঔপন্যাসিক নিজে অন্ত্যজ সমাজের প্রতিনিধি হয়ে, অন্ত্যজ জীবনের কথা বলেছেন। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শুধু মালো সমাজের জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের কথা বলেননি; বলেছেন মালোনারীর ব্যথিত অবহেলিত জীবনের সারবত্তার কথা। বাঙালি মূল-সমাজের মতো অন্ত্যজ সমাজেও নারীই সর্বাপেক্ষা শোষিত শ্রেণি। মালোজীবনের অন্দরমহলের কথা বলতেই লেখক মালো-নারীর জীবনের রূপরেখা নির্মাণ করেছেন। বাসন্তী, অনন্তর মা আর উদয়তারা এই তিন নারীর জীবনদর্শনের মধ্য দিয়ে লেখক অন্ত্যজ নারীর সংকট ও সমস্যার চিরায়ত আখ্যান নির্মাণ করেছেন।

মূল শব্দ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ, তিতাস একটি নদীর নাম, অন্ত্যজ সমাজ, জীবনদর্শন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলাদেশের সাহিত্যে একজন স্বল্পপ্রজ কথাকার। ধীর-বংশের সন্তান হওয়ার কারণে আশৈশব সমাজের নেতিবাচকতা, প্রতিহিংসা, প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছিলেন তিনি। কোনো বৈষম্যের প্রাচীর দমন করতে পারেনি তাকে, তাঁর ইচ্ছা-শক্তিকে। সমাজের প্রান্তিকতায় অবস্থান করেও, শিক্ষা আর সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে উত্তরণের পথ-সন্ধান করে গড়ে তুলেছিলেন নিজেকে। তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন এই জীবনকে মুক্তির আলো দিয়েছিল শিক্ষা। জ্ঞান-অর্জনের প্রবল স্পৃহায় মালোজীবনের নিরক্ষতার রুদ্ধদ্বারকে অতিক্রম করতে পারলেও সর্বাংশে সফল হতে পারেননি তিনি। পারিবারিক বিপন্নতার কারণে মাধ্যমিকের গণ্ডি শেষ করার পরই তাঁকে প্রবেশ করতে হয়েছিল কর্ম-জগতে। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান-অর্জনের পথ বন্ধ হলেও বন্ধ হয়নি তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান-অনুশীলন। সংবাদপত্রের একনিষ্ঠ সাংবাদিক হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। এই পরিক্রমায় তিনি ত্রিপুরা, নবশক্তি, মোহাম্মদী, আজাদ হয়ে সাগরময় ঘোষের আহ্বানে ১৯৪৫ সালে দেশ পত্রিকায় যোগদান করেন।

১

প্রতিটি মানুষের বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক নানান ঘটনার মেলবন্ধন ঘটে থাকে। ব্যক্তি অদ্বৈত মল্লবর্মণ যে পল্লিতে জন্মেছিলেন তাকে ঘিরে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর লেখক-সত্তার উন্মেষ ও বিকাশ। লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণের শ্রেষ্ঠকীর্তি *তিতাস একটি নদীর নাম*, উপন্যাসটি মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৩৫২ বঙ্গাব্দে। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৫১ সালে অদ্বৈত'র মৃত্যু হলে তাঁর বন্ধু সুহৃদদের সহযোগিতায় ১৯৫৬ সালে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। জেলেজীবন বা নদী-তীরবর্তী গ্রামবাংলার জনজীবন নিয়ে অদ্বৈত'র পূর্বে বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচিত হলেও, সেগুলো ছিল ঐ সমাজের বাইরের মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। এ-প্রসঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত মত ছিল এইরূপ : ‘সুবোধদা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় Artist, master artist ; কিন্তু বাওনের পোলা-রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা।’ (উদ্ধৃত, বিশ্বজিৎ, ২০০৮ : ৬৭) জেলের সন্তান অদ্বৈত মল্লবর্মণের এই উক্তির মধ্যে আছে জল ও জীবনের প্রদীপ্ত অঙ্গীকার। পাশাপাশি রয়েছে উপন্যাসিক প্রতিবেদন নির্মাণের নন্দনসূত্র, বিকল্প বাচন এবং নিম্নবর্ণের জীবনাদর্শকে শিল্পিত করার বিকল্প প্রত্যয়। এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নদী-নির্ভর বাংলা উপন্যাসের ধারায় *তিতাস একটি নদীর নাম* অর্জন করেছে বিশিষ্টতা। (বিশ্বজিৎ, ২০০৮ : ৬৭) আর এই জনপ্রিয়তার মূলেও কাজ করেছে অন্ত্যজ জীবনের অনিবার্য উপস্থিতি। এই উপন্যাসের অভিনবত্ব রয়েছে পরিচিত গ্রামীণ আবহের বাইরে নদীকেন্দ্রিক জীবনের পটভূমি আঁকার প্রচেষ্টায়।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের মালোসম্প্রদায় বর্ণগত ও অর্থগত উভয় বিচারে সামাজিক সম্মানে পশ্চাৎপদ। সেই মানদণ্ডের বিচারে উপন্যাসটি নিম্নবর্ণের জীবন আখ্যানের সার্থক শিল্পপ্রতিমা। মালোজীবনের এই সত্যকে সামনে রেখে বলা যায়,

জাতিবর্ণ-বিষয়ক প্রচলিত সামাজিক ধারণা অনুসারে সমাজব্যবস্থার সর্বনিম্নে যে সব জনগোষ্ঠী অবস্থান করে; যারা বা যাদের শ্রম দ্বারা যুগ যুগ সামাজ্যীবনকে সচল রেখেছে বা রেখে চলেছে সেই সব শ্রমজীবী মানুষই সমাজের নিয়মে অন্ত্যজ। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সমাজে বর্ণপ্রথা প্রচলিত। চতুর্থ বর্ণের শেষ বর্ণটি শূদ্র। শূদ্র বর্ণটি বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির অন্তর্গত। সমাজের জন্য অপরিহার্য এই সমস্ত পেশাই এক সময় উচ্চবর্ণের নিকট অস্পৃশ্য বা অন্ত্যজ হয়ে উঠে। অন্ত্যজ শব্দের বহুবিশেষণ শব্দ প্রচলিত যেমন শূদ্র, হরিজন, দলিত, ব্রাত্য, প্রান্তিক, প্রাকৃতজন প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হয়। মূলগত দিক থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে অন্ত্যজ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় মোটাদাগে যাকে নিম্নবর্ণ বলা হয়। অন্ত্যজ বা নিম্নবর্ণ যাই বলি না কেনো শ্রেণি, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত মানুষকেই এই কাঠামোয় নির্ধারিত করা হয়। এ বিষয়ে রণজিৎ গুহের মত নিম্নরূপ :

In other words, it was a relationship of dominance and subordination- a political relationship of feudal type, or as it has been appropriately described, a semi feudal relationship which derived its material sustenance from pre-capitalist conditions of production and its legitimacy from a traditional culture still paramount in the superstructure. (Ranajit, 1982 : 30)

এই পরিস্থিতিতে বলা যায়, সবধরনের অধস্তন শ্রেণিই নিম্নবর্ণ। অধস্তন বলতে সেই সব শ্রেণিকে বোঝানো হয় যারা ক্ষমতার বিন্যাসে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত নন। যারা রাজনৈতিক প্রভুত্ব, অর্থনৈতিক স্বার্থ, মতাদর্শগত প্রভাবের মধ্য প্রবলরূপে অন্তর্ভুক্ত থাকে। সামাজিক বৈষম্যের বহুমাত্রিক পরিসরে অর্থনৈতিক ও লৈঙ্গিক শোষণের প্রথম শিকার হয় নারী। এই আলোকে *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের নারী প্রসঙ্গে আলোকসম্পাতের চেষ্টা করা হবে। আধিপত্য ও অধীনতার স্থবিরতায় নির্মিত মানুষের যাত্রা অপ্রতিরোধ্য। নারী ও নিম্নবর্ণ দুটির দাসত্বের পরিণাম ও পরিধি একই সূতায় বাঁধা। শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নারী সব সময় অবদমনের শিকার হয়ে থাকে। সামগ্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক আধিপত্য ও অধীনতার। নিম্নবর্ণের আর্থ-সামাজিক শোষণের পথ ধরে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্য দুই প্রকার : প্রথমত, পুরুষের কতৃত্বাধীন সমাজে লৈঙ্গিকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে; দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এই দ্বৈত দুর্বলতা বা শোষণের মধ্য দিয়ে নারী পড়ে থাকে সার্বিক শোষণের জাঁতাকলে। এ প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিডাকের মত নিম্নরূপ :

পুরুষ শাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্ণ। তাই বলে নারীর কোনও শ্রেণীগত, জাতিগত ও সম্প্রদায়গত পরিচয় নেই, এও সত্য নয়। সূত্রাং নিম্নবর্ণের নির্মাণ দেখতে হলে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধীনতাও যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, তেমনি অন্যান্য ক্ষমতার সম্পর্ক, যেমন শ্রেণী,

জাতি, সম্প্রদায়, ইত্যাদি কীভাবে সেই নিম্নবর্ণীয় নারীর নির্মাণটিকে আরও জটিল করে তোলে, তাও বিশেষ গবেষণার বিষয়। (গায়ত্রী, ২০২০ : ২০)

ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে জাতিগত বৈষম্য যেমনভাবে জড়িত, তেমনভাবে শ্রেণিগত ও লিঙ্গগত বৈষম্য জড়িত থাকে। সবগুলো বৈষম্যের সঙ্গে নারীর প্রতি যোগ হওয়া লিঙ্গগত বৈষম্য আর একটি বড় শোষণ। নিম্নবর্ণের তাত্ত্বিকদের মধ্যে অন্যতম গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিডাকের অন্যতম তত্ত্ব ‘can the subaltern speak?’। তাঁর আলোচনার অন্যতম আলোচিত ধারণা ‘অপর’ ধারণা। এই প্রবন্ধে স্পিডাক নারীবাদী বক্তব্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তিনি তৃতীয় বিশ্বের নারীর সংগ্রাম ও নিপীড়নের ওপর আলোকপাত করেছিলেন। উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার দ্বারা প্রভাবিত অপরতাবোধের আলোকে ভারতীয় উপমহাদেশের নিম্নবর্ণের নারীর অন্তর্জালকে উদ্ভাসনের চেষ্টা করেছেন। লৈঙ্গিক সংজ্ঞায়নের সেই জায়গা থেকে নারী বহুমাত্রিকভাবে বৈষম্য ও অবদমনের শিকার হয়ে থাকে। সামাজিক ঐ সমস্ত প্রপঞ্চকে এড়িয়েও আমরা যদি শুধু আর্থ-সামাজিক পটভূমির মানদণ্ডকে সামনে রাখি, সেখানেও দেখা যাবে অন্ত্যজ নারীর শোষণের মাত্রা বহুবিধ। *তিতাস একটি নদীর নাম* অন্ত্যজ জীবনের প্রতিলিপি, তারপরও সেখানে অন্ত্যজ নারীর আখ্যান সর্বাধিক ব্যাপ্তি পেয়েছে। আলোচনার পরিক্রমায় সামাজিক বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অন্ত্যজ নারীর জীবনোতিহাস নিরূপণে অভিপ্রায়ী হবো।

২

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের কাহিনির পট ও পটভূমি নির্মিত হয়েছে দারিদ্র্যপীড়িত জনপদের ইতিবৃত্তে সুবল-কিশোর-বাসন্তী আর অনন্তর মাকে কেন্দ্র করে। এই বৃত্তান্তের সূত্রেই আছে মাণো সম্প্রদায়ের জীবনভূমি অন্বেষণের সূত্রায়ণ। (শান্তনু, ২০১৪ : ২০) সুবল, কিশোর, বাসন্তী, অনন্তর মা উপন্যাসের কাহিনির প্রধান নর-নারী। শোষিত জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে লেখকের নিকটে নারী হয়ে ওঠেছিল প্রধান প্রত্যয়। এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে অন্ত্যজ নারীর চিরকালীন প্রথাগত জীবনের সংকট-শোষণ ও সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। সামাজিকভাবে ধীবর সমাজের মধ্যেও অবস্থান করেও নারী হিসেবে তাদের শোষণের লিপিমাল্য ভিন্ন হয়ে থাকে। শোষিত শ্রেণির অংশ হিসেবে সব সমাজের মতো ধীবর সমাজের নারীও দ্বিতীয়বার শোষিত শ্রেণি। কারণ নিম্নবিত্তের জীবনে সমাজ আর ধর্মের অদৃশ্য ফাঁদে পড়ে নারীর প্রাণ হয়ে উঠে ওষ্ঠাগত। শোষিত সমাজের অংশ হয়ে লেখক নারীর মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বাপেক্ষা শোষিত শ্রেণিকে রূপায়িত করেছেন।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের মূল কাহিনি-পর্বে রয়েছে তিনজন নারীর অমীমাংসিত জীবন উপাখ্যান। বাসন্তী সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সে শুধু একজন নারী নন, একটি চরিত্রও নন; একটি শ্রেণির একক সত্তার অধিকারী। বাসন্তী

সামাজিক পরিচয় দীননাথ মালোর কন্যা, সুবলের স্ত্রী, আর সবশেষে অনন্তর মাসী। সে একই সঙ্গে মালোর মেয়ে আর মালোর বউ; এ পরিচয়ের ব্যাপ্তি তাকে উপন্যাসে গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত করেছে। এই সমস্ত সীমানার বাইরে সে একজন ব্যক্তি। তার ব্যক্তিগত জীবন-রেখার আদ্যোপান্ততা এই সম্প্রদায়ের ইতিহাসের অংশ। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের মতামত নিম্নরূপ :

সুবলার বউ এর মধ্যে এক বিপ্লবী বাস করে। সে দমিতে জানে না।' সে হারতে জানে না, নিজের বিশ্বাসের ভূমিতে স্থিত থেকে নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থনে দৃঢ় থাকার বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। দৃশ্যত শান্ত পরিস্থিতিতেই লুকিয়ে থাকে অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনা। (দিলীপ, ২০১৫ : ২৫)

বাসন্তীর এই আপাত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের আড়ালে আছে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত এক নারীসত্তা। যেখানে উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় বাসন্তী কিশোরের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল। বাসন্তীর আশৈশবের সেই স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে যায়। অবদমিত বাসনার ইতি ঘটিয়ে সুবলের সঙ্গে বিয়ে আর সংসার নামক খেলাঘর গড়েছিল সে। ক্ষণিকের ঝড়ে সব হারিয়ে সে ফিরে এসেছে তার পুরোনো জীবনে। বাসন্তীর জীবনের এই ঝড় প্রান্তিক নারীর জীবনের চিরচেনা প্রতিবেশ। নারী জীবনের চিরায়ত বাস্তবতা নিয়ে বাসন্তী চরিত্রের ব্যাখ্যায় সমালোচকের অভিমত নিম্নরূপ :

বালিকা থেকে প্রৌঢ়া, জীবনের এক বিশাল বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে অদ্বৈত বড় যত্ন করে বাসন্তীকে একেছেন। গোকর্ণঘাটের মালোগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের জীবন্ত সাক্ষী যেন বাসন্তী। অথবা বাসন্তীর জীবন কাহিনির মধ্য দিয়ে যেন তিনি দেখিয়েছেন এক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার এক আপসহীন যোদ্ধা হিসেবেও আমরা তাকে দেখি। এবং এই যোদ্ধা রমণীর ট্রাজিক পরিণতিও আমরা দেখি বুক ভার করা এক শূন্যতার মধ্যে দিয়ে। (দিলীপ, ২০১৫ : ৩১)

কোনো কারণ ছাড়াই জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বাসন্তীকে এমনই সব প্রতিকূলতার শিকার হতে হয়েছে। চরিত্র হিসেবে সে উপন্যাসে বিশ শতকের সৃষ্ট হলেও, জীবনের পটভূমিতে তার নির্মাণ উনিশ শতকের বাঙালি নারীর পরিমণ্ডলে। বাল্য বৈধব্যের যন্ত্রণা সহ্য করে সে পৌঁছেছে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায়। নিজের কোনো ইচ্ছাকেই সে পূর্ণ করতে পারেনি জীবনের দীর্ঘ পরিমণ্ডলে। কেনো পারেনি? তার কারণ অজানা। সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় তার উত্তর সে নারী, অন্ত্যজ; তার নিজের কোনো ইচ্ছা থাকতে নেই।

বাসন্তীর জীবন-রেখা ভেদ করে ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ আসলে প্রবেশ করেছিলেন মালোজীবনের আবাসস্থলে। মালোপাড়ার সুবলার বউ বাসন্তী নিঃসন্তান বিধবা এক নারী (গিয়াস, ২০০২ : ১৫০)। বিধবা হলেও মানবিক ঐশ্বর্যে সে এক হৃদয়বান নারী। অন্ত্যজ এই নারীর উদারতার সর্বোত্তম পরিচয় দেখা যায় অনন্তর মা 'ভইন' হয়ে উঠার মধ্য দিয়ে। নিঃসঙ্গ জীবনে অনন্তর মার সান্নিধ্য তাকে সন্ধান দিয়েছিল এক নতুন পৃথিবীর। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাসন্তীর বক্তব্যে : 'ভাবছিলাম আমারই দুঃখের দুঃখী অনন্তর মার মত সাথী পাইয়া, অনন্তর মত ছাইলা কোলে পাইয়া সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়ামু।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭৭) একথাও সত্য যে, বিধবাই পারে আর এক বিধবার বৈধব্যের যন্ত্রণা অনুধাবন করতে। বাসন্তী আর অনন্তর মার বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে লেখক

আসলে সেই শ্রেণিগত-সাম্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাদের জীবনের যন্ত্রণা তাদেরকে মিলিয়ে দিয়েছিল একরেখায়। অনন্তর মার সঙ্গে বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে দুই বিধবা নারী তাদের বিবর্ণ জীবনের সহযাত্রী হয়ে উঠেছিল : ‘না দিদি, মন ঠাণ্ডা কর। পুরুষ মানুষ দিয়া কি হইব। তারা বৃষ্টির পানি-ফোঁটা, ঝরলেই শেষ। তারা জোয়ারের জল। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭৫) নারীর জীবনে পুরুষকেন্দ্রিক বাসনার অপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতের পাশাপাশি সঙ্গীবিহীন জীবনের অন্তর্জ্বালাও সত্য হয়ে উঠেছিল এই সত্য ভাষণে। অন্ত্যজ জীবনের সংকীর্ণ পরিধিতে নারীর বিবাহ নামক বৈতরণি পার হওয়ার পরে, সমাজ-সংসারের নিকট তার আর চাওয়া-পাওয়ার কিছু থাকে না। প্রান্তিক সমাজের নারীর শৈশব-কৈশোরের শিক্ষা তাকে প্রদীপের মতো পুড়ে পুড়ে বাঁচতে অনুপ্রাণিত করে। জোয়ারের জলের ক্ষণিক সুখের স্মৃতির নিয়ে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মধ্যেও তারা বাঁচার রসদ খুঁজে নেয়; অনন্তর মতো সন্তানেরা সেই অসীম শূন্যতায় ভেলা হয়ে ভাসিয়ে রাখে তাদের। এভাবেই অন্ত্যজ নারীরা জীবনশ্রোতে ভেসে থাকে, জীবনের সুখ খুঁজে নেয়। বাসন্তী তাদেরই একজন।

আমরা জানি বাসন্তী মালোসম্প্রদায়ের নারী। তার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কোনো জীবন নেই, আছে শুধু সামাজিক জীবন। সেখানে তার দীননাথ মালোর মেয়ে আর সুবল মালোর বিধবা স্ত্রী। এছাড়া আর কোনো পরিচয় তার নেই। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র-সমাজে নারীর নিজস্ব কোন পরিচয় তৈরি হয় না। তারা বাঁচে কারো কন্যা হয়ে, স্ত্রী হয়ে, মা হয়ে। তারপরও মানুষ হিসেবে বাসন্তী মধ্যে আছে কতকগুলো মানবিকবোধের বিকাশ; যা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। সেই সহজাত স্বভাব থেকে নারীর মধ্যে মাতৃত্বের প্রগাঢ়তার সৃষ্টি। স্বভাব-সিদ্ধভাবেই নারী মা হওয়ার মধ্যে নারীত্বের পূর্ণতা বলে মনে করে। বাসন্তীর চরিত্রে সেই অনুভূতির প্রকাশ জাঙ্জল্যমান। অনন্তর মাসীরূপে বাসন্তীর সুপ্ত মাতৃত্বের জাগরণ ঘটেছিল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত জীবনের শেষ আশ্রয় রূপে অনন্তকে লালন-পালন করে সে মেটাতে চেয়েছিল তার মাতৃত্বের ক্ষুধাকে। তার নিঃস্ব জীবনের সব দুঃখ, সব আঁধার, একদিন অনন্তর হাত দিয়ে বিলীন হয়ে যাবে। তেমনিটিই ভেবেছিল বাসন্তী :

ঘরে গিয়া সে অনন্তকে আবার মাখাইল, চুমা খাইল, বুকে চাপিয়া ধরিল, ছাড়িয়া দিয়া আবার বুকে চাপিয়া ধরিল। অনন্তর মুখখানা সুন্দর, চোখ দুটি সুন্দর, শরীরখানা সুন্দর। যখন কথা বলে কথাগুলি সুন্দর। যখন কোনোদিকে চাহিয়া থাকে তখন তাকে অনেক বড় মনে হয়। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭৫)

অনন্তর শিশুসুলভ অভিব্যক্তি, বাসন্তীর মাতৃত্বকে প্রাণ দিয়েছিল। জীবনের অন্য সব দুরাশার মতো মাতৃত্বের সুখও তার জীবনে স্থায়ী হয়নি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অপর হয়ে বাসন্তী তার মাতৃত্বের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। যে বাসন্তী কাঁচা রাঁড়ি, নিজেই পিতার সংসারে একটা বোঝা। সে কীভাবে আর একজনের মা হয়ে তার অন্ন-বস্ত্রের দায়িত্ব নিবে। দারিদ্র্যের অপরিনেয় দুর্যোগ আর নিজের মায়ের নিষ্ঠুরতা বিফল করে দিয়েছিল তার মাতৃত্বের আবহনকে। এই চরিত্রের সমগ্রতার মধ্যে দিয়ে

একজন প্রান্তিক নারীর সমগ্র জীবনের নিঃস্বতা প্রকটিত হয়েছে। (সেলিনা, ২০০৮ : ২৭৫) তার অর্থ এই নয় যে, বাসন্তীর মানসিক সামর্থ্যের অভাব ঘটেছে। তবে অভাবের সংসারে তার চাওয়া-পাওয়া হয়েছে মূল্যহীন। কারণ সে নারী, সে দরিদ্র। তাই তার নিজের কোনো ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই। অনন্তর এই চলে যাওয়া বাসন্তীর জীবনকে শূন্য করে দিয়েছে; তবু উজ্জীবিত থেকেছে হার না মানার প্রবল শক্তিতে। তাই দার্ততার সঙ্গে বলেছে : ‘আপদ গেছে ভাল হইছে। কার দায় কে সামলাইবে গো দিদি? আমার পেটের না পিঠের না, আমার কেনে অত ঝকঝক।’ (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৯৮) তার এই অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট হয়েছে কোনো অবস্থাতেই জীবনের কাছে, নিয়তির কাছে হার মানতে রাজি নয়। সমস্ত অপ্রতিরোধ্যতার মধ্যেও নিজেকে টিকিয়ে রাখার এই শক্তি সে পেয়েছে তার স্বসমাজ থেকে, স্বশ্রেণি থেকে। জন্ম থেকেই যে নারী প্রতিকূলতাকে প্রতিরোধ করে বাঁচে, নিয়তির হাতে সে কখনো বন্দি হতে পারে না। বাসন্তী তেমনই এক আত্মপ্রত্যয়ী নারী। চরিত্রের দ্বন্দ্বিকতায় বাসন্তী বরাবর যেন জীবন-রসধারায় এক মোমগলানো পলতে। (জহর, ২০১৪ : ১৫) যে অনন্তের মহা-ইন্দ্রিয়ে মুগ্ধ হয়েছিল সে, তা শুধু অনন্ত নয়। অনন্ত নামের বাতাবরণে হারিয়ে যাওয়া কিশোর নামের প্রাণের অংশ। যে সমাজে বাস করে বাসন্তী তার প্রেমকে প্রকাশ করতে পারেনি, প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি; সেই সমাজ কী পরেছে অনুভূতিকে রোধ করতে? বাসন্তী শ্রেণিগতভাবে অন্ত্যজ হলে, মানুষ হিসেবে অন্ত্যজ নয়। সমাজের সমস্ত পঙ্কিলতা পেছনে ফেলে জীবনকে ভালোবেসে সামনে চলেছে সে অবিরত। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করে জীবনবাদী এক মানবীতে পরিণত হয়েছে সে। তার জীবনের এই অপূর্ণতা অন্ত্যজ জীবনের অপূর্ণতারই অংশ। অদ্বৈত মানুষের মানবিক সূক্ষ্মতাকে গ্রহণ করেছেন অবোধে; সেই সমস্ত দক্ষতাকে প্রয়োগ করে উচ্চকিত করেছেন চরিত্র নির্মাণ শৈলীকে। সেখানে বাসন্তী এক অনবদ্য সংযোজন। বাসন্তী চরিত্রের দৃঢ়তা আর ঋজুতাকে উপন্যাসের আর কোনো চরিত্রের সঙ্গে মেলানো যায় না। সমগ্র উপন্যাসে সে অবতীর্ণ হয়েছে নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে।

একটি চরিত্র, একজন ব্যক্তি, একজন নারী আর এক মা, অনন্তর মা। সব পরিচয়ের উর্ধ্বে একটি পরিচয় উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে; তা হলো অনন্তর মা। অনন্তর মা চরিত্রের মাতৃত্বের সুধা যতটা প্রকাশিত হয়েছে; তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে কিশোরের স্ত্রী বা প্রেমসী সন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ়তা। যদিও মাতৃত্বের দায়িত্বই তাকে বাধ্য করেছে কিশোরের স্ত্রী পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে। কারণ পিতা নিজেও জানে না, সে একজনের পিতা। পিতা সন্তান সম্পর্কে অবহিত না হলেও, মাকে হতে হয়; এটাই সামাজিক নিয়ম। তাই মা হিসেবে অনন্তর মার প্রধান দায়িত্ব তার সন্তানের পিতৃপরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করা। এখানেই তার চরিত্রের সংকট, সম্ভাবনা এবং সমগ্রতা। অনন্তর মার জীবনের স্বল্প পরিসরে, কিশোরের আগমন ও প্রস্থান। অনন্তর মার জীবনের কিশোরকেন্দ্রিক অন্ধকারের পশ্চাতে সামাজিক বা সংস্কৃতিক যে বৈষম্যগুলো

ক্রিয়াশীল ছিল তার যথার্থ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে উত্তর-সন্ধান এই গবেষণার অভিপ্রায়। উপন্যাসের প্রবাসখণ্ডের শুকদেবপুরের দোল-উৎসবে পাঠক প্রথম আবিষ্কার করেন নামহীন এই নারী, অনন্তর মাকে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসিকের স্বগতোক্তি নিম্নরূপ :

দলের ভিতরে সেই মেয়েটিকেও দেখা গেল। মার পায়ের দিকে তাকাইয়া সেই তালে তালে পা ফেলিতেছিল। কিশোরের সহিত চোখাচোখি হইয়া সে তাল-কাটা পড়িল। পা আর উঠিতে চাহিল না। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৩২)

এখানেই অনন্তর মার সঙ্গে কিশোরের পরিচয়, প্রণয় আর পরিণয়। এত সব ঘটনা, এত স্বল্প সময়ে ঘটে চলে যে, কেউ কাউকে ভালো করে চেনার সুযোগ পায় না। কারণ অন্ত্যজ জীবনের পরিসীমায় সব কিছু দ্রুতই ঘটে চলে; শ্রমশীল মানুষের জীবনে কোনো ঘটনা নিয়ে সময় অতিবাহিত করার অবসর থাকে না। ‘মোড়ল-গিল্লির হাতে দুইটি ফুলের মালা। একটি কিশোরের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, ‘শাস্ত্রমতে বিয়া কইর দেশে গিয়া। অখন মালা বদল কইরা রাখ।’ (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৩৪) এই নিয়মবদ্ধ জীবনে নারীর অবস্থান এতটাই দুর্বল যে সেখানে একজন নারীকে খেলার পুতুলের মতো বার দুয়েক দেখলো; তার পরপরই বিয়ে হলো। যেন বিয়ে হওয়াই ঐ নারীর জীবনের একমাত্র উপজীব্য। বিয়ের পর এই পুতুল নারী, নামহীন অনন্তর মার ভবিষ্যৎ কি হতে পারে? কেমন হতে পারে? তা নিয়ে তার স্বজন, সম্প্রদায়, কারো কোনো ভাবনা নেই। যেন দশমীর দুর্গা বিসর্জনের মতো অনুঢ়া নাম ঘুচলেই সবাই আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলবে। যে সমাজে নারী জন্মই পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেখানে এর চেয়ে ভালো সমাপ্তি আর কী হতে পারে।

লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঐ সমাজের একজন হয়ে, চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন ঐ সমাজের নারীর প্রকৃত অবস্থানকে। সে-কারণেই তাঁর সাহিত্যিক ভাবনায় সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল এমন এক নারীর জীবন-পরিমণ্ডল। অনন্তর মার যাত্রা হয়েছিল সেই অনন্তের পথে, যার নাম, পরিচয়, ঠিকানা, কিছুই তার জানা ছিল না। সময়ের প্রবল আঘাতে এই অন্তঃসত্ত্বা নারী যখন স্বামীকে হারিয়ে ফেলেছে; এর অধিক বিপন্নতা সেই নারীর জীবনে আর কী হতে পারে? তাই সমগ্র উপন্যাসে অনন্তর মার জীবনকে একটা রহস্যের ঘেরাটোপে বন্দি করে রেখেছেন লেখক। নামহীন এই নারী পেয়েছিল মাতৃত্বের স্বদ। যে-কারণেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল বিস্মৃত অতীতের নিকট। যার কোনো নিদর্শনই তার কাছে ছিল না; ছিল শুধু তিতাসের দুর্নিবার আকর্ষণ। এই পরিস্থিতি তাকে নিয়ে চলেছে আধেক স্বপ্নে, আধেক জাগরণে হারানো স্মৃতি-সুধার পানে :

শুধু জানে গাঁ-খানা তিতাস নদীর তীরে। নদী সোজা উত্তর দিকে আসিয়া এ গাঁয়ের গা ঘেঁষিয়া পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরিয়াছে। এক একটা গ্রামের ছায়ায় নৌকা আসিল চমকাইয়া উঠিয়াছে, বিহ্বলের মত চাহিয়াছে এই বুঝি সেই গাঁ। গাঁ খানা তার মনকে টানিয়াছে শুধু আজ নয়, অনন্ত যখন পেটে, তখন থেকে। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৪৩)

অনন্তর মার তিতাস-তীরে আগমন একটি সংগ্রাম মুখর অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছিল। সম্পূর্ণ স্বজনহীন পরিবেশে নিজের ও সন্তানের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল সে। বিবাহ নামক সামাজিক যে প্রতিষ্ঠান নারীর জীবনকে খোলামকুচিতে রূপান্তরিত করে সেখানে তার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন থাকে। তবুও সমাজ বিবাহের মধ্যে নারী জীবনের পূর্ণতা খোঁজে। কারণ সমাজ নারীকে মানবসভ্যতার পুনরোৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। (সেলিনা, ২০০৮ : ১৩০) আবার সে কারণেই নারীকে সারাজীবন ধরে দিতে হয় সতীত্বের পরীক্ষা। যেমন দিতে হয়েছিল সীতা ও শকুন্তলাকে। সমাজ, ধর্ম নারীর কাছে সন্তানের পিতাকে চায়, সন্তানের যথার্থ সত্য পরিচয় চায়। সেই অনাদিকাল থেকে এভাবেই নারীকে নির্মাণ ও নিপীড়ন করে আসছে সমাজ। অথচ আদিকালের সেই সমাজে রাজা দুশ্মন্তকে কারো কাছে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়নি ; আর আজকের দিনের কিশোরকেও নয়। তবে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও অনন্তর মাকে অনড় থেকে নারীত্বের সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। নিয়তির সমস্ত বিপত্তিকে অতিক্রম করার অসামান্য আত্মশক্তি নিয়ে তিতাস-তীরে আবাস গড়েছে এই অন্ত্যজ নারী। স্বামীহীন, স্বজনহীন একা নারীর, এই একক লড়াইয়ে সে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ নির্মাণ। অনন্তর মার এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট যে, যে-কোনো সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও নারী তার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি ও সাহস রাখে। এই সংগ্রাম নারীর নিজস্ব সংগ্রাম। যে শ্রেণি সমাজের মধ্যে নারী অবস্থান করে সেই সমাজ পুরুষের নির্মিত; নারী সেই সমাজেরই অংশ মাত্র। সেই সমাজের মধ্যে অবস্থান করেই নারী তার মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে। নারীর এই শ্রেণিসংগ্রাম, সমগ্র সমাজের শ্রেণিসংগ্রামের অংশ হলেও, পুরুষ সেখানে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। আর নারীর অবদানকে অবদমন করতে চায়। সেক্ষেত্রে গবেষকগণ মনে করেন যে, নারীর সংগ্রামের যে-সব উপাদানগুলো ইতিহাসের লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে তাকে প্রকাশ করে, তাদের পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। (যশোধরা, ২০১২ : ৬৯) তিতাস একটি নদীর নাম তেমনি একটি সাহিত্যিক বিনির্মাণ যেখানে অন্ত্যজ নারীর অবদমিত জীবনের ইতিহাস নির্মিত হয়েছে। অন্ত্যজ জীবনের সামগ্রিক পরিসরের একটি অনাদৃত অংশ নারীর জীবন ইতিহাস।

অনন্তর মা তার নামহীন জীবনকে বিলীন হতে দেয়নি সামাজিক অবকাঠামোর চোরাশ্রোতে। নিজের লক্ষ্যে নিবিষ্ট থেকে সামাজিক সত্যকে অন্তঃশীলার মতো বয়ে চলেছে সে। এই একক লড়াইয়ে সবার আগে তার প্রয়োজন হয়েছিল আর্থিক নিরাপত্তার পথ আবিষ্কার করা। লেখক তার জীবনের মূল সত্যের সূত্রায়ণে রহস্যবৃত রাখলেও, জীবন ও জীবিকার সূত্রে তাকে অন্য মালা নারীদের সমগোত্রীয় করে তুলেছেন :

মালো পাড়ার অধিকাংশ নারী লক্ষ্মীরমতো সেও সূতা-বুননের মাধ্যমে জীবিকার্জনের উপায় বের করে নেয়। কৃচ্ছসাধনার মধ্য দিয়ে পুত্র অনন্তকে নিয়ে সে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নঘোর বাস্তবতায় পথ চলে সে। যে নতুন সমাজ-প্রাকারে সে স্বেচ্ছাবিন্দিনী, সে সমাজের-প্রথা-পদ্ধতি কখনও কখনও তাকে আতঙ্ক-শিহরিত করে; দূরদূর-বক্ষে সে অপেক্ষা করে ভয়ঙ্কর কোনো তথ্যচিত্রের। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৪৩)

নারীর জীবন সমাজের দৃষ্টিতে সর্বদা একটি কৌতূহলের কেন্দ্রস্থল। তারপর অনন্তর মার জীবন যখন যথার্থই এক অমীমাংসিত সত্যে বাঁধা পড়ে থাকে; তখন এই সমাজের কাছে তার সংশয় আর সংকোচের শেষ নেই। সে কারণেই বোধ হয়, লেখক রহস্যের আড়াল থেকে বয়ান করেছেন তাকে ও তার কাহিনিকে। ইশারা ইঙ্গিতে কিশোরের প্রতি তার দুর্বলতা প্রকাশ করলেও সম্পর্কের সত্যতাকে বরাবরই অস্বীকার করেছে সে : ‘পাগলে কারে কই হারাছে, তার আমি কি জানি। আমি কেবল জানি, একলাজীবন চলে না। পাগলেরে পাইলে তারে লখ কইরা জীবন কাটাই।’ (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭৮) অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে অনন্তর মা আড়ালে রেখেছে নিজের অতীতকে। সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পন্ন না হওয়ায় সন্তানের সামাজিক পরিচয়কে বারবার গোপন করতে হয়েছে তাকে। স্বামী কিশোরকে চিনতে পারার পরও নিজের সংসারে, নিজের অধিকারের কথা বলতে পারেনি। এই সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে বারবার এমন সবকৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। কারণ প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠিত করার যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য তাদের থাকে না।

তিতাস-তীরে অনন্তর মার আগমনের হেতু কিশোর হলেও, মূল উদ্দেশ্য ছিল অনন্তোর সামাজিক পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা। মালোসমাজের ভবিতব্য জেনেই যেন লেখক নির্ধারণ করেছিলেন জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের মতো প্রাকৃতিক ভারসাম্যের মধ্যেই জীবনের স্থূলবোধ আর ট্র্যাজিক পরিণতির সীমানা। অনন্তর মা তার এই নিঃসঙ্গ যাত্রাপথে একজন সঙ্গী পেয়েছিল; তার নাম বাসন্তী। তার সান্নিধ্য, সহযোগিতা তিতাস-তীরের স্থবির পরিবেশকে শ্রোতশীল ও বেগবান করেছিল। উপন্যাসের পটভূমিতে আলোচনার পরিসর থেকে জানা যায় গ্রামীণ নারীর বন্ধুত্বের প্রাসঙ্গিকতার। গার্হস্থ্য শ্রমের সঙ্গে নারীর যুক্ততা অনিবার্যভাবে নারীসত্তার অবস্থানকে অপরাধন করে তোলে। এই অপরাধনের বৃত্ত নারীকে আর এক নারীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। (সেলিনা, ২০০৮ : ২২৬) অন্যভাবে বলা যায়, পূর্ব থেকেই তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা করেছিলেন ঔপন্যাসিক। আর তাদের অভীষ্ট যোগসূত্র হয়তো কিশোর বা কিশোরের প্রণয় মুগ্ধতা। ‘হরিণী যেমন নিজের কস্তুরীর গন্ধ অনুভব করে, সুবলার বউয়ের আবির্ভাবও অনন্তর মা তেমনি করিয়া অনুভব করিল।’ (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৮৮) তিতাসের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু মানুষ আর নদীর এক সত্তায় মিশে যাওয়ার মধ্যে নয়, গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় নারীর জীবনচােরের সমৃদ্ধ এক সাহিত্যিক কাঠামো নির্মাণে। বাসন্তী আর অনন্তর মার ব্যক্তিক মিলন হলেও মানসিক মিলন হয়নি। ব্যক্তিত্বের

স্বমহিমায় তারা তাদের অতীতকে অবরুদ্ধ রেখেই পথ চলেছে। দুজনেই তাদের নিজস্ব যন্ত্রণার পরিসীমাকে অব্যক্ত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সেই পরিস্থিতির বর্ণনা এরূপ :

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছে, যদি কোনোদিন চূড়ান্ত সময় আসে সেদিন বলিবে, তার আগে বুক যতই মুচরাইয়া দুমরাইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাক সেখানেই উহাকে সবত্বে সংগোপনে লুকাইয়া রাখিবে।' (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৭০)

এখানেই অনন্তর মা চরিত্রের ব্যক্তিত্বের ঋজুতা স্পষ্ট। অনিশ্চিত জীবনের দোলায় সে দ্বন্দ্বিক, তবু সে নিরুত্তর। পুরুষতন্ত্রের একটি বড় সফলতা হলো নারীর মনোজগতে জন্ম দিতে পেরেছে অধস্তনতা ও দাসীসুলভ সত্তার। সমাজ নারীকে পতিভক্তি ও স্বামী সেবার মধ্য দিয়ে জীবনকে সার্থক করায় বিশ্বাসী করে তুলেছে। এভাবে নারীকে প্রাণহীণ, সংবেদনহীন বস্তুতেও পরিণত করেছে। (আবদুল, ২০১২ : ৩৫) সামগ্রিক এই অবস্থার মধ্য দিয়ে অনন্তর মার মতো নারীর পক্ষে একজন পুরুষের সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থেকে যায়।

অনন্তর মা তার বাসনার সবটুকু না পেলেও, তার প্রতীক্ষিত প্রেমের শিহরণ পেয়েছিল। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের অস্তিমাংশে হোলি উৎসবের উদ্দীপ্তায় কিশোরের হারানো স্মৃতিকে স্পর্শ করতে পেরেছিল সে। তারপরও তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে সমবেত লোকের বিভ্রান্তিতে :

মেয়েটার খোঁপা খুলিয়া গিয়া সাপের মতো মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। ...কিশোর পুরোপুরি পাগল হইয়া সে বুকে মুখ ঘষিতে লাগিল। দাড়ি গোফের জবর জঙ্গিমায়ে বুঝিবা সেই নরম তুলতুলে বুকখানা উপরাইয়া যায়। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৮৩)

কিশোরের এই উন্মাদনা সাধারণ মানুষের কাছে পাগলামী মনে হলেও, এটাই ছিল তার প্রেমের প্রকাশ। সমাগত মানুষের অসতর্ক আঘাতে মৃত্যু হয়েছে কিশোরের। কিশোরের মৃত্যুর চারদিন পরে অনন্তর মারও মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, অন্ত্যজ জীবনের অনাদৃত প্রেক্ষাপটই এই মৃত্যুর নিয়ামক। জীবনের সন্ধিক্ষণে সব পেয়েও হারিয়ে ফেলার আঘাত তাকে পৌঁছে দিয়েছে মৃত্যুর দুয়ারে। অন্ত্যজ জীবনের এই সংগ্রাম, ক্লান্ত, অবসন্ন করে তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। এভাবে নামহীন এই নারী হারিয়ে যায় সময়ের শ্রোতে। এই সত্য জীবনের সত্য, এই সত্য অন্ত্যজ জীবনের সত্য।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালোসমাজের জীবনগাঁথা রচনা করতে বসে নির্মাণ করেছেন মালোনারীর জীবন-ইতিহাস। সমগ্র উপন্যাসে লেখক তিন ধরনের নারীকে উপস্থাপন করেছেন। প্রচলিত বাল্য বিধবার নিগড়ে বাঁধা বাসন্তী, দুর্যোগে স্বামী-সংসার হারানো অসহায় নারী অনন্তর মা, সমাজ-সংসারকে উপেক্ষা করে জীবনের চাওয়াকে প্রতিষ্ঠাকারী নারী উদয়তারা। বাসন্তী, অনন্তর মা, উদয়তারা এই তিন নারীকে দিয়ে উপন্যাসের কাহিনিকে বিস্তৃত করেছেন লেখক। এই তিন নারীর মধ্যে উপন্যাসিক সংযোগ ঘটিয়েছেন অনন্তকে দিয়ে। এই তিন নারী জীবন-সংসারে তিন ধরনের যন্ত্রণায় কাতর। উদয়তারার স্বামী থাকলেও সন্তানহীন সংসারের প্রতি আসক্তি তৈরি হয়নি

তার। তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে অনন্তকে কেন্দ্র করে কাহিনির যে আবর্তন, সেখানে উদয়তারা একজন গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। (গিয়াস, ২০০২ : ১৩৫) গোকর্ণঘাটের মালোসমাজে তার পরিচয় সে লবচন্দ্রের বউ। বাসন্তীকে বধিত করে অনন্তকে নিজের কাছে আনার অভিপ্রায় তার ছিল না। আশ্রয়হীন অনন্তর আশ্রয় হয়ে নিজের ঘরে ঠাই দিয়েছিল শুধু উদয়তারা। মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল বাসন্তী আর উদয়তারার : ‘খুব যে দরদ লবচন্দ্রের বউ-এর। স্বামীকে দিয়া খোঁজাইয়াছে। বলি কয়দিনের কুটুম?’ (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৯১) এই সব বাসন্তীর অভিমানী উত্তেজনা আর পরিস্থিতির রূঢ়তা। উদয়তারা অনন্তকে শুধু আশ্রয় দেয়নি; দিয়েছিল তার শিশুমনে উৎসুক জিজ্ঞাসার জন্ম। তার সামনে তুলে ধরেছিল মালোনারীর প্রচলিত লোকসংস্কৃতির জগত। তার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

সু- ফুল ছিট্যা রইছে, তুলবার লোক নাই

সু-শয্যা পইড়া রয়ছে, শুইবার লোক নাই। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫০৪)

উদয়তারার ব্যবহৃত এমনই বহু ধাঁ-ধাঁ সমগ্র উপন্যাস জুড়ে আছে। লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে উদয়তারার ব্যক্তি চরিত্রের প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। দাম্পত্যের আর্বতনলীলায় তার মধ্যে মাতৃত্বের আকৃতি থাকলেও, উত্তেজনা ছিল না। ফলে তার আর অনন্তর মধ্যে মাতৃত্ব সূচক স্নেহের পরিসীমার বাইরে নির্মিত হয়েছিল বন্ধুত্বের সহজ সীমানা। গোষ্ঠী জীবনের প্রচলিত সীমার বাইরে উদয়তারা এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল নারী নির্মাণ।

অনন্তকে জীবনের পথে হারিয়ে স্বামী গৃহে ফিরে আসে উদয়তারা। পুরোনো তিক্ততাকে পেছনে ফেলে সে নতুন বন্ধুত্বের আহ্বান জানায় বাসন্তীকে। তারা ফিরে আসে তাদের পুরোনো ভালো লাগার আলোচনায়। মাতৃত্বের করুণ আকৃতিতে তারা দুই নিঃসম্বল নারী একে অপরকে প্রবোধ দিয়েছে : ‘কি লা বাসন্তী, মনে বুঝি মানে না। আমারও মানে না। আমার ত ভইন কৃষ্ণহারা ব্রজনারীর মত অবস্থা। কিন্তু পরের পুত, তোরও পেটের না, আমারও পেটের না।’ (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৫৫৮) বাসন্তী ও উদয়তারা দুজনে মালোসম্প্রদায়ের নারী; তাদের জীবনে যন্ত্রণার ক্ষতও গভীর, সেই আজন্ম লালিত ক্ষতের একটি অংশ অনন্ত। এর বাইরে তাদের আছে বেঁচে থাকার অজস্র লড়াই। সেই লড়াইয়ের লড়াকু সৈনিক তারা, তিতাসের বুক জেগে ওঠা চর আঘাত করেছে তাদের অস্তিত্বে। ক্ষুধার লড়াইয়ের বাঁচার পর যদি কোনোদিন কোনো অবসর তারা পায় ; তাহলে হয়তো তারা তাদের পুরোনো ব্যথায় খোঁচা দিয়ে বাৎসল্যের সুধায় অনুরণিত হবে। এটাই যেন অন্ত্যজ নারীজীবনের চিরায়ত সত্য।

প্রধান এই তিন নারী ছাড়াও উপন্যাসে আরো বেশকিছু নারী চরিত্র আছে যারা কাহিনির প্রবাহে বড় অবদান না রাখলেও, কাহিনির সামগ্রিকতায় তাদের অবস্থান অত্যাৱশ্যক। কালোর মা, মঙ্গলার বউ, সুবলার মা, কিশোরের মা ও বাসন্তীর মা সবার জীবন একই

সুতায় বাঁধা। এদের মধ্যে কালোর মার জীবন পদ্ধতি অন্যদের থেকে একটু আলাদা। স্বামীর মৃত্যুর পর সে জেলেরমণীদের দিয়ে সুতা কাটাতো। সেই সুতা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে জাল তৈরি করা হয়। সুবলের মা দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত এক জেলেরমণী, সুবলের বাবার নিজের নৌকায় না থাকায় সারাজীবন নিঃস্বতার মধ্যে কাটে। বাসন্তীর মা অন্যদের তুলনায় আরো একটু সক্রিয় চরিত্র। বাসন্তীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় তার রয়েছে সক্রিয় ও সজাগ ভূমিকা। এর বাইরে তার চরিত্রে রয়েছে মাতৃত্বের উন্মুক্ত দিগন্ত, যেখানে সে অমোঘ অনুকম্পায় বিধবা কন্যা বাসন্তীর প্রতি স্নেহাৰ্হ। মঙ্গলার বউয়ের মধ্যে গ্রামীণ নারীর প্রথাগত জীবনবোধর সন্ধান পাওয়া যায়। সে বাসন্তী আর অনন্তর মার সখী হয়ে তাদের অন্তর্গত সত্যকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছিল। অন্ত্যজ, নিরক্ষর নারীর যা স্বভাবগত সত্য। এভাবে ভালো-মন্দে, স্নেহে-প্রেমে, ক্রোধ-ক্ষমায়, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে নারী চরিত্রগুলো হয়েছে দীপ্যমান। জীবনশ্রোতের বহমানতায় তারা করেছে কেবর্তসমাজের প্রতিনিধিত্ব। এ-প্রসঙ্গে গবেষক অভিমত স্মরণীয় :

তিতাস একটি নদীর নাম- এর বাস্তব তথ্যের ক্ষেত্রে ফাঁক নেই কোথাও, তাই লঘু কল্পনার কুয়াশা দিয়ে পাঠকদের ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টাও নেই। তাই তিনি (অদ্বৈত) সেই বিরল ঔপন্যাসিকদের অন্যতম যাঁর লিখন-প্রণালীতে সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক ফন্দিফিকির ও বৌদ্ধিক চাতুর্য নেই, কল্পনাপ্রতিভা যাঁর আখ্যানে বিধৃত বাস্তবতাকে নতুন মাত্রা দেয়। (তপোধীর, ২০০০ : ৭৫)

ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু আখ্যান নির্মাণ বা বর্ণনায় নয়। চরিত্রকে যথার্থ বাস্তবতায় দাঁড় করানোর মধ্যেও লেখকের নৈপুণ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য। অদ্বৈত মল্লবর্ণণ মালাজীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস তুলে ধরার প্রচেষ্টায় জীবনসূত্রের কোনো রূপকে অস্পৃশ্য রেখে যাননি। (হরিশংকর, ২০০৮ : ৮৯) তাঁর উপন্যাসের নারীরাও সামাজিক জীব, তাদের জীবনও অর্থনীতির অমোঘ সুতায় বাঁধা। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের অবশ্যম্ভাবী নিয়মে পুরুষেরা যেমন মাছ ধরতে জাল নৌকা সঙ্গী করে নদীর বুকে ভেসে চলে; তেমনি তাদের ঘরের নারীরা শুধু গৃহকর্ম আর সন্তান লালন পালনের মধ্যে দিনাতিপাত করে না, বরং তারা যথার্থ নর্ম সহচাৰী হয়ে পুরুষের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে। এ প্রসঙ্গে লেখকের স্বগতোক্তি দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে :

তিন বউ সারারাত সুতা কাটিয়া শেষরাতে শুইয়াছিল। অল্প একটু ঘুমাইতেই কালোবরণের জালে যাওয়ার সময় হইল। ... উঠিয়া কেউ তামাক টিকার ডিবা, কেউ মনসা, খলুই জালের পট্টলি হাতে নিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ... কালোর মা যতদিন বাঁচিয়া আছে এইসময় বউদের উঠিতেই হইবে। সকল বাড়ির বউদের আগে কালোর বাড়ির বউদের স্নান করিয়া আসা চাই। (অদ্বৈত, ২০১৫ : ৪৪৭)

এই প্রাত্যহিকতা শুধু কালোবরণদের বাড়ির নয়, তিতাস-তীরের সমস্ত জেলেনারীর জীবন একই সুতায় গাঁথা। নানান রকম সংসারিক কাজের মধ্যে যদি একটু সময় পায়, তাহলে তাদের নানা রকম সুতা কেটে, জাল বুনন করে প্রস্তুত রাখতে হয়। যেন প্রয়োজনের সময় সহজেই হাতে পেতে পারে।

গল্প বলতে বলতে, লেখককে দেশ-কালের সীমানা পার হয়ে যেতে হয়; তাকে হতে হয় সমাজের প্রতিনিধি। সেই সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা যখন নারীকে দেখতে পাই; তখন সেই পরিচিত বাস্তবের আড়ালে থাকে অন্য এক বাস্তবতা। অর্থনৈতিক শোষণের ইতিহাসে তারা সমাজ থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি; অথচ এই সমাজের বিনির্মাণের পটভূমিকায় তাদের শ্রমের, ঘামের সুলুক সন্ধান আজও যথার্থরূপে হয়নি। সাধারণ সমাজে যখন আজ পর্যন্ত নারীর গৃহশ্রমের আর্থিক মূল্য নির্ধারণ হয়নি। সেই সমাজের অন্ত্যে থাকা অন্ত্যজ নারীর শ্রমের মূল্য অগণিত থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। অথচ সর্বার্থেই মালোনারীর কর্মযোগ মালোপুরুষের অর্থনৈতিক শ্রমদানকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। এ-প্রসঙ্গে বিজিতকুমার দত্তের মতামত যথার্থ :

জীবিকার এই যৌথ প্রয়াস গ্রামীণ অর্থনীতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য। অদ্বৈত এটা টের পেয়েছিলেন।

তিনি কর্মক্ষম নারীর যে চিত্র এঁকেছেন তাতে শ্রম এবং মাধুর্য মিলে একটি সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে। (উদ্ধৃত, হরিশংকর, ২০০৮ : ১৯২)

নদীকে কেন্দ্র করে নর-নারীর সম্মিলিত যে জীবনপ্রয়াস তাতে জীবন-জীবিকা, সমাজ, অর্থনীতি খুটিনাটি সমস্ত কিছু এক বৃত্তাকারে ধরা পড়েছে। ব্রাত্যজীবনের নীরব ডুবুরি হয়ে লেখক তুলে ধরেছেন মালোপাড়ার গোষ্ঠীজীবনে নারীর আর্থ-সামাজিক অস্তিত্বের স্নায়ুশাখাগুলোকে। এর মধ্য দিয়ে প্রতিটি চরিত্র হয়ে উঠেছে মালো নারীর যথার্থ প্রতিনিধি।

এই আলোচনার পরিক্রমায় বলা যায়, অন্ত্যজ নারী শোষিত জনপদের সর্বাধিক শোষিত জনগোষ্ঠী। সর্বহারার সমাজে আরো অধিক সর্বহারা শ্রেণি; শ্রেণিহীনের মধ্যেও অধিকরতর শ্রেণিহীন। হাজার বছরের সামাজিক ইতিহাসের ধারায় তাদের এই অকথিত জীবনকথা গ্রথিত হয়েছে *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের পরতে পরতে। এই প্রধান তিন নারীর জীবন পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে মালোজীবনের ইতিহাস যেমন রচিত হয়েছে; তেমনি উন্মোচিত হয়েছে মালো সমাজের জীবনদর্শন। এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রান্ত-প্রদেশে অবস্থিত এইসব নারীকে স্মরণ করার প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাদের অন্তর্দেশের কাতরতা কখনো সমাজ, রাষ্ট্র, ইতিহাসে, স্থান পায়নি। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোও এই সাহিত্যিক প্রয়াসের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানবের এই ইতিহাসে পৃথিবী আজন্ম ঋণী থাকবে তাদের শ্রম, ঘাম আর রক্তের কাছে।

সহায়কপঞ্জি

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (২০১৫)। অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা।

আবদুল মান্নান (২০১১)। *গ্রামীণ নারী*। অবসর, ঢাকা।

গিয়াস শমীম (২০০২)। *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় [সম্পা.] (২০২০) *নিম্নবর্ণের ইতিহাস*। আনন্দ, কলকাতা।

তিতাস একটি নদীর নাম : অন্ত্যজ নারীর অন্তর্বয়ন

জহর সেনমজুমদার(২০১৪)। উপন্যাসের ঘরবাড়ি। পুস্তক বিপনী, কলকাতা।

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০০০)। অদ্বৈত মল্লবর্মণ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

দিলীপ দাস (২০১৪)। তিতাসের অদ্বৈত একটি নদী-নিবিড় উপন্যাসের রূপকল্প সন্ধান। বুক ওয়াল্ড, কলকাতা।

শান্তনু কায়সার (২০১৪)। জন্মশতবর্ষে অদ্বৈত মল্লবর্মণ জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। সোপান, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৮)। ‘তিতাস একটি নদীর নাম : জল ও জীবনের বিকল্প নন্দন’। বাংলা উপন্যাসে নদী-চর ও দ্বীপজীবন [সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন ও সিরাজ সালেহীন]

জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশনী, ঢাকা।

সেলিনা হোসেন (২০০৮)। ‘সংস্কৃতি ও নারী’। জেডার আলোকে সংস্কৃতি [সম্পা. সেলিনা হোসেন ও বিশ্বজিৎ ঘোষ], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

হরিশংকর জলদাস (২০০৮)। নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Ranajit Guha (1982) ‘On some Aspects of the Historiography of Colonial India’ *Subaltern Studies* No.1, [Edi. Ranajit Guha] Oxford University Press, Delhi.

মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ

সাহিত্যিক

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬ ব. ॥ ১৯৫৯ খ্রি.

ru.ac.bd/bangle/bangle-journal-shahittyki

Print : ISSN 1994-4888

বর্ষ : ৬৬ সংখ্যা : ৫৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ ॥ মে ২০২৫

প্রকাশকাল : মে ২০২৫

প্রবন্ধ জমা : ২০ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রবন্ধ গৃহীত : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পৃষ্ঠা : ৯৯-১১৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ইকোক্রিটিসিজম

মোঃ মোকাদ্দেস-উল-ইসলাম

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা

ই মেইল : biddut.cou@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার ভারসাম্যপূর্ণ আবেগ নিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে আবির্ভূত হন। গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা তাঁর ছোটগল্পগুলোতে প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মানুষ এই ত্রিতন্ত্রের সুসম সমন্বয় লক্ষণীয় যা মানবজীবনের সামগ্রিকতার সমান্তরালে পরিবেশন করা হয়েছে। সচেতনভাবে প্রয়োগ না-করা হলেও, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ছোটগল্পগুলোতে ‘ইকোক্রিটিসিজম’ নামে আধুনিক সাহিত্যতত্ত্বের প্রভাব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ১৯৭০র দশকে জনপ্রিয় হওয়া এই তত্ত্বটি বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। অতএব, ইকোক্রিটিসিজম তত্ত্বের আলোকে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলোতে ইকোক্রিটিসিজম তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, প্রভাব এবং প্রয়োগ বর্তমান গবেষণামূলক প্রবন্ধে অন্বেষণ করা হয়েছে।

মূল শব্দ

ইকোক্রিটিসিজম, অবভাস, আবেগ, প্রভাব, প্রকৃতি, মানুষ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) শরৎ-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ নাম। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলের সমকালে লেখনী ধারণ করলেও কল্লোলগোষ্ঠীর সাথে তাঁর আপাত সংযোগ ছিল না। তিনি সদর্থে গ্রামজীবনের শিল্পী, প্রকৃতির মত অনাবিল এবং প্রকৃতি ও মানুষের সাথে ছিল তাঁর গভীর যোগ। গ্রামের সাথে তাঁর শিল্পজীবনের যোগ আমৃত্যু অবিচ্ছিন্ন ছিল। তিনি গ্রামীণ, আন্তিক, মানবধর্মে বিশ্বাসী এবং গার্হস্থ্য জীবনের রূপকার। পল্লিগ্রামের সাধারণ মানুষ নিয়েই তাঁর সাহিত্যপথে যাত্রা। এরা অতি পরিচিত, বাস্তব চরিত্র। একান্ত পরিচিত বাস্তব বিষয় ও চরিত্র এবং প্রকৃতির মিশেলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প অসামান্যতা অর্জন করেছে। সাধারণের ভেতরেই তিনি দেখেছেন জীবনের সৌম্য, শান্ত ও পরিপূর্ণ রূপ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে সমগ্ররূপে দেখেছেন। তাঁর গল্পে কেবল মানুষ ও প্রকৃতি আছে এ বক্তব্য আরোপিত। মানবজীবনের প্রবৃ্ত্তি ও নিয়তির অমোঘ লীলা যেমন দেখেছেন তেমনি অলৌকিক ও অধ্যাত্মবিশ্বাসের কার্যকারণও তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই তিন মিলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যলোক গড়ে উঠেছে। তিনি যে সামগ্রিক জীবনের শিল্পী তার পরিচয় তাঁর ছোটগল্পেই পাওয়া যায়। প্রকৃতিগত প্রাণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের বিষয়টি লক্ষ করা যায়। তাই তাঁর ছোটগল্পে ইকোলজিক্যাল প্রভাব খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

ইকোলজি বিষয়টি মানুষের পরিবেশ সচেতনতার মধ্য দিয়ে একটি শাস্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। জার্মান প্রাণবিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকেল ১৮৬৬ সালে বিজ্ঞানচর্চার শাখা হিসেবে ইকোলজিকে সামনে নিয়ে আসেন। তিনি জৈব-অজৈব পরিবেশের সাথে প্রাণিজগতের সম্পর্ক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন— যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়। বর্তমানকালেও পরিবেশের বিষয়টি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে মানব সমাজে উদ্বেগের বিষয় হিসেবে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সভাতে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় প্রাকৃতিক পরিবেশ যেভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে তা নিয়ে নানামুখী চিন্তা-ভাবনা, উদ্বেগ ও উদ্যোগের বিষয়টি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। যদিও এর বেশ কিছুকাল আগে ১৯৬২ সালে র্যাচেল কারসন তাঁর অসামান্য লেখা ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’এ ডিডিটি’র মতো বিষাক্ত কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতির বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরেন— যা বিশ্বব্যাপী সবার মনে ভীষণ দাগ কাটে। জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭২ সালে স্টকহোমে এবং ঠিক তার ২০ বছর পরে ১৯৯২-তে রিওডি জেনিরোতে পরিবেশ বিষয়ক দুটি বিশ্ব সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিশ্ব-নেতৃত্ব মানবজাতির অস্তিত্ব-রক্ষায় পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি গ্লোবাল এজেন্ডা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস

পেয়েছিলেন এবং সেই ধারা বৃহত্তর জনসমাজ এবং পরিবেশবাদী মানুষ ও সিভিল সোসাইটি সংগঠনের আন্দোলন ও ক্যাম্পেইনের ফলে ক্রমশ বেগবান হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথমদিকে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ যখন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল ঠিক সে সময়ে ওয়েস্টার্ন লিটারেচার এসোসিয়েশন তত্ত্বগতভাবে ‘ইকোক্রিটসিজম’র ধারণা সাহিত্যরসিকদের সম্মুখে নিয়ে আসেন। ১৯৭৮ সালে উইলিয়াম রিউকার্ট তাঁর বিখ্যাত আর্টিকেল ‘লিটারেচার এন্ড ইকোলজি অ্যান এক্সপেরিমেণ্ট ইন ইকোক্রিটসিজম’-এ ‘ইকোক্রিটসিজম’ শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। যদিও কার্স ক্রোয়েবার ১৯৭৪ সালে ইকোক্রিটসিজমের কাছাকাছি ‘ইকোলজিক্যাল’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর একটি প্রবন্ধে। কিন্তু একাডেমিক ডিসকোর্স হিসেবে রিউকার্ট এবং ক্রোয়েবারের উল্লিখিত শব্দ দুটির প্রয়োগ বোদ্ধামহলে সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি। অবশ্য ১৯৮৯ সালে ডব্লিউএলএ-র সম্মেলনের অব্যবহিত পরে ইকোক্রিটসিজম সাহিত্য সমালোচনার একটি প্রকরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এজন্য যাঁর নামটি সর্বাগ্রে সামনে আসে তিনি হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময়ে অধ্যয়নরত গবেষক শেরিল গ্লটফেল্টি। উক্ত সম্মেলনে তাঁর পঠিত গবেষণা প্রবন্ধের মাধ্যমে ইকোক্রিটসিজম শব্দটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘এসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অব লিটারেচার এন্ড এনভায়রনমেন্ট’ এবং উক্ত সমিতির জার্নাল এর যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি সাহিত্য সমালোচনার নতুন ধারারূপে ইকোক্রিটসিজমকে জনপ্রিয় করে তোলেন। ‘ইকোক্রিটসিজম’র সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ করা বেশ দুর্লভ। কারণ এ নিয়ে ইকোক্রিটিকদের মধ্যে মতদ্বৈততা বিরাজমান। তবে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, ‘এটি হচ্ছে সাহিত্য-সমালোচনার এমন একটি পদ্ধতি- যা সাহিত্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির মধ্যে যে সম্পর্ক তা বিশ্লেষণাত্মকভাবে উপস্থাপন করে। ইকোক্রিটিকগণ মনে করেন, প্রকৃতির একটা বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে, এটি কবি-সাহিত্যিকদের কল্পনা জগতের কোন বিষয়বস্তু কিংবা বাকনির্ভর কোন রোমান্টিক ধারণা নয়। বর্তমানে ইকোক্রিটসিজমকে একটি বহুশাস্ত্রীয় প্লাটফর্মের ওপর দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সাহিত্যের পাশাপাশি প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পরিবেশবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, সাংস্কৃতিক নৃ-তত্ত্বসহ নানাবিধ দৃষ্টিকোণ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।’ (Glottfelty, C & Fromm, H. 1996 : 24) সনাতনী মানবকেন্দ্রিক (অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক) দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশকে সাহিত্যে রূপায়ণের তীব্র বিরোধিতা করে আসছে ইকোক্রিটিকগণ এবং তার ফলে হাল আমলে কথাসাহিত্য ও কবিতায় ইকোসেন্ট্রিক রচনাবলি ক্রমবিকশিত হচ্ছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ইকোক্রিটসিজমের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব অন্বেষণই বর্তমান গবেষণার অন্তিষ্ট।

পরিবেশ ভাবনা বিষয়টি মূলত পরিবেশ বিনষ্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা থেকেই পরিবেশ ভাবনার জন্ম হয়েছে। ১৯৩৫ সালে আর্থার টেন্সলি প্রথম ইকোসিস্টেম বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেন। ১৯৬৬ সালে ওডাম প্রথম উপস্থাপন করেন তার খাদ্য-শৃঙ্খলের ধারণা। যেহেতু ইকোসিস্টেম একটি সমন্বিত ব্যবস্থা তাই এর কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুরো প্রক্রিয়াটিতে নির্ভরশীল প্রাণিকুল মারাত্মক ক্ষতির শিকার হয়। ক্রমেই পরিবেশ বিপর্যয়ের এই সমস্যা প্রভাবিত করেছে সাহিত্য সমালোচনার ধারাকে। পরিবেশ সমালোচনা (Ecocriticism) অতি-আধুনিক ও একেবারে নতুন একটি প্রপঞ্চ। ১৯৭৮-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে উইলিয়াম রিউকার্ট প্রথম ‘ইকোক্রিটিসিজম’ পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল- *Literature and Ecology : An Experiment in Ecocriticism*. ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ASLE- Association for the Study of Literature and Environment. এই সংস্থার হাত ধরে ২০০৯ সাল থেকে প্রকাশিত হয় সাহিত্য ও পরিবেশ বিষয়ক (ইকোক্রিটিসিজম) গবেষণা পত্রিকা ISLE : *Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*। ২০১০ সালে প্রকাশিত হয় Graham Huggan ও Helen Tiffinর লেখা *Postcolonial Ecocriticism* বইটি। এভাবেই পাশ্চাত্য দেশে প্রথম ইকোক্রিটিসিজমের সূত্রপাত হয়। William Howarth তাঁর ‘Some Principles of Ecocriticism’ প্রবন্ধে ইকোক্রিটিসিজমকে বাস্তবত্বের থেকেও গভীর জ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ecology শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Okios ও Logos থেকে। যার অর্থ দাঁড়ায় বসতবাড়ি স্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান। অন্যদিকে William Howarth বলছেন Eco ও critic শব্দ দুটি গ্রিক শব্দ oikos ও kritis শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ- ‘বসতির বিচারক’। তার মতে ইকোক্রিটিকরা ব্যাখ্যা করে, কখন মানব-সংস্কৃতি প্রকৃতি পরিবেশের জন্য শুভ আর কখন অশুভ। এমনকি রাজনৈতিক কারণ কখনো কখনো প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিনষ্ট করে দেয়। (Howarth, 1996 : 211) আধুনিক সময়ে ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ও বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার উদ্যোগে প্রথম জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরই ফলে গঠিত হয় Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). প্রতিবছর বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত এই প্যানেল প্রতিবেদনে জানায় যে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, সিএফসি, নাইট্রাস অক্সাইডের মতো গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এসব গ্যাস পৃথিবীর জন্য বৃহৎ ক্ষতি ডেকে আনবে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়বে, মেরু অঞ্চলের বরফ গলে পৃথিবীর নিম্নভূমি প্লাবিত হবে। এরপর ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন। ১৭৯টি দেশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে রিও ঘোষণাপত্র

গ্রহণ করা হয় এবং তাতে ২১টি এজেন্ডা নির্ধারণ করা হয়। গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনতে সকল সদস্য একমত পোষণ করে। এরই হাত ধরে প্রতি বছর পৃথিবী জুড়ে ৫ জুন ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস’ পালন করা হয়। দূষণমুক্ত সুস্থ পৃথিবীর চিন্তা থেকেই জন্ম হয়েছে এই বৃহৎ সম্মেলনের। মূলত ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের হাত ধরে আধুনিক সময়ে ব্যাপক হারে পরিবেশ দূষণের সূত্রপাত হয়েছে। যন্ত্র ব্যবস্থার অধিক উন্নতি মানুষকে ক্রমেই পরিবেশের শত্রু করে তুলেছে। প্রকৃতি-পরিবেশের এই ধারাবাহিক বিপন্নতার কারণে সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টি কাড়ে প্রকৃতিনির্ভর সাহিত্যগুলো। তারা সবুজ-পৃথিবী ও অকৃত্রিম প্রাকৃতিক জীবনব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে সূত্রপাত করেন পরিবেশবাদী সাহিত্য-সমালোচনার। সাহিত্য ও প্রকৃতি-পরিবেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রকৃতি ভিন্ন সাহিত্য কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সব সাহিত্য পরিবেশবাদী পাঠ দাবি করে না। যেসব সাহিত্যে বিপন্ন পরিবেশ, প্রকৃতি-পরিবেশের স্তব-স্ততি, পরিবেশের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়— সেসব সাহিত্য পরিবেশবাদী পাঠ দাবি করে।

পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনা মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণিকুল, পরিবেশ ও মানবিক সভ্যতার বিকাশের সম্পর্ক নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করে। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত থ্রেগ গ্যারাদ তাঁর *Ecocriticism* গ্রন্থে বলেন :

Indeed, the widest definition of the subject of ecocriticism is the study of the relationship of the human and the non-human, throughout human cultural history and entiling critical analysis of the term human itself. (Garrad, ২০১৩ : ০৫)

Cheryll Glotfelty ও Harold Fromm সম্পাদিত *The Ecocriticism Reader* নামক গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে ইকোট্রিটিসিজমের সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে :

Ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment. Just as feminist criticism examines language and literature from gender-conscious perspectives, and Marxist criticism brings an awareness of modes of production and economic class to its reading of texts, ecocriticism takes an earth-centered approach to literary studies. (Cheryll Glotfelty and Harold Fromm, 1996 : xviii)

পরিবেশ-সমালোচনা হচ্ছে এমন একটি নাম যেটি বাস্তবস্থান সংক্রান্ত সাহিত্য বুঝিয়ে থাকে। পরিবেশ-সমালোচক হলেন একজন ব্যক্তি যিনি প্রকৃতির উপর সংস্কৃতির প্রভাবকে চিত্রিত করে তার গুণাগুণ এবং ত্রুটিগুলি বিচার করেন, এর ধ্বংসকারীদের তিরস্কার করেন এবং রাজনৈতিক কর্মের মাধ্যমে তাদের ক্ষতির বিপরীত করেন। পরিবেশ সমালোচনা হল আন্তর্গর্ভবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য এবং পরিবেশের অধ্যয়ন যেখানে সাহিত্যের পণ্ডিতরা পরিবেশ বিশ্লেষণ করে এবং সমসাময়িক পরিবেশগত পরিস্থিতি সংশোধনের জন্য সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং বিভিন্ন উপায়ে সাহিত্য প্রকৃতির বিষয়কে বিবেচনা করে। পরিবেশ-সমালোচনা যেমন

এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান, তেমনি উনিশ শতকের ট্রান্সেন্ডেন্টালিস্ট লেখকদের কাছ থেকে সাহিত্যের জন্ম নেয়া সাহিত্যেও ছিল, যাদের রচনা প্রকৃতি, জীবনশক্তি এবং প্রান্তরকে উদযাপন করে, যেমন : রাল্ফ ওয়াল্ডো ইমারসন, মার্গারেট ফুলার এবং হেনরি ডেভিড থরো। রুকেট (Rueckert)র মতে, ইকোক্রিটিসিজম সাহিত্যপাঠের সাথে বাস্তবদ্বন্দ্ব বা বাস্তবসংস্থান-সংক্রান্ত তত্ত্বকে সংশ্লিষ্ট করে। লরেন্স বুয়েলের মতে, ইকোক্রিটিসিজম সাহিত্য ও পরিবেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে। প্যাট্রিক ডি. এয়ারফি (Patrick D. Murphy)র মতে, ইকোক্রিটিসিজম হচ্ছে একটি সাহিত্য-বিষয়ক সমালোচনা যার উদ্ভব ঘটে মানুষ ও বাস্তবগত মিথস্ক্রিয়া ও পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে।

পরিবেশ সমালোচনার (Ecocriticism) বৈশিষ্ট্য :

১. পরিবেশবাদী সমালোচনা মানবজাতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের অনুসন্ধান করে।
২. পরিবেশবাদী সমালোচনা প্রকৃতির প্রতি প্রকৃতি ও মানুষের ব্যবহার অথবা আচরণ উপস্থাপন করে মূলত একটি নির্দিষ্ট যুগে।
৩. পরিবেশবাদী সমালোচনা মূলত মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর এবং বস্তুগত (non-living) পৃথিবীর মধ্যকার সম্পর্ক এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা নিয়ে গবেষণা করে।
৪. পরিবেশবাদী সমালোচনা প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ যেমন- বায়ু, পানি, মাটি, বন, তৈল, কয়লা ইত্যাদির অবক্ষয় নিয়ে কাজ করে।
৫. মানবজাতির উন্নত ভবিষ্যতের জন্য পরিবেশবাদী সমালোচনা টেকসই উন্নয়নকে সমর্থন করে।
৬. ইকোক্রিটিসিজম পরিবেশ-নীতিকে মানুষের প্রকৃতি জয় করার সর্বগ্রাসী তাড়না হিসেবে চিহ্নিত করে যা খানিকটা বিভ্রান্তিকর।
৭. ইকোক্রিটিসিজমে প্রকৃতিই কেন্দ্র, মানুষ নয়। কারণ প্রকৃতি ধ্বংসের জন্য মানুষই দায়ী।
৮. ইকোক্রিটিসিজম সাহিত্য এবং পার্থিব পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ক তুলে ধরে।
৯. ধরণীকে রক্ষা করাই ইকোক্রিটিসিজমের প্রধান উদ্দেশ্য।
১০. আন্তর্বিষয়ক দৃষ্টিকোণ থেকে ইকোক্রিটিসিজম সাহিত্য ও বাস্তববিদ্যার অধ্যয়ন করে।
১১. পরিবেশ সমালোচনা আমাদের অন্য সব ধরনের সমালোচনার পুনর্মূল্যায়ন করে। প্রাথমিকভাবে, এটি ভাষার তত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে (পরবর্তীতে আরও বেশি) এবং কীভাবে সাহিত্যকর্মের কাছে যেতে হয় সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি রাখে।
১২. ইকো-সমালোচনা হল একটি অধ্যয়ন যা মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি শুধুমাত্র প্রকৃতির বর্তমান অবস্থার দিকেই মনোযোগ দেয় না, বরং তারা বসবাস করে এমন বিভিন্ন যুগে মানুষের বিকাশের দিকেও মনোযোগ দেয়। ইকোর ধারণা সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে প্রয়োগ করা সমালোচনা মানুষের মধ্যে ভাষাসম্পদ খুঁজে বের করার প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মানব ও প্রকৃতি পরিবেশের উদ্ভবে।
১৩. ইকোক্রিটিসিজম সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে।
১৪. ইকোক্রিটিকরা এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেন যে সবকিছুই সামাজিক বা ভাষিকভাবে নির্মিত।
১৫. পরিবেশ-সমালোচনা এই ধারণাটি তুলে ধরে যে মানুষ প্রকৃতির মালিক নয়। এটি একটি দাস নয় যেমন ইকোক্রিটিকাল সাহিত্য সমালোচনা বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের এনটোপোকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে নষ্ট করার জন্য প্রধান সাহিত্যিক গ্রন্থগুলোকে পুনরায় পড়ার

গুরুত্ব নির্দেশ করে। তারা মানুষ, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের উপরও জোর দেয়। ইকোট্রিটিসিজম দর্শন ও জীববিজ্ঞানের ধারণা ও পরিভাষা ব্যবহার করেও এই সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। এটি করার মাধ্যমে, তারা একটি পরিবেশগত চেতনা তৈরি করে এবং একটি পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র রচনা করে।

৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে পরিবেশবাদী সমালোচনার স্বরূপ

ইংরেজি সাহিত্যে প্রকৃতির কবি হিসেবে জর্জ গার্ডন বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪), জন কিটস (১৭৯৫-১৮২১), স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪), পার্শি বি. শেলী (১৭৯২-১৮২২), টমাস স্টেয়ার্নস এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫), উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের কবিতায় প্রকৃতি পরিচর্যার ভিন্নতার মধ্যে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। জর্জ গার্ডন বায়রন যিনি ‘লর্ড বায়রন’ নামে সমধিক পরিচিত তাঁর কবিতায় প্রকৃতির ভয়ংকর রূপ উঠে এসেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো ‘Don Juan’, ‘Childe Harold's Pilgrimage’, ‘She Walks in Beauty’। জন কিটসকে ‘সৌন্দর্যের কবি’ ও ‘ইন্দ্রিয়পরায়ণ কবি’ বলা হয়। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির সাধারণ রূপ এমন অসাধারণ চিত্ররূপময়তায় উদ্ভাসিত হয় যেন তা পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভববন্দ্য হয়ে ওঠে। ‘Ode to a Nightingale’, ‘To Autumn’, ‘Ode on a Grecian Urn’ তাঁর বিখ্যাত কবিতা। জন কিটসের কবিতার চিত্ররূপময়তার সঙ্গে বাংলার নির্জনতার কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কবিতার গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ তাঁর কবিতায় সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্ব খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর *The Rime of the Ancient Mariner*-এ আলবট্রাস পাখিকে হত্যা করার ফলে গভীর সমুদ্রে নৌকায় অবস্থানকালে এনসিয়েন্ট ম্যারিনারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া পাপ (Crime), শাস্তি (Punishment) ও মুক্তির (Salvation) প্রতীকায়িত বহিঃপ্রকাশ অসাধারণত্বের মহিমা বহন করে। পার্শি বি. শেলী তাঁর কবিতায় বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা সহযোগে প্রকৃতির প্রবহমানতার রূপের ব্যাখ্যানে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর ‘The Cloud’ কবিতায় পানি থেকে মেঘের সৃষ্টি, সেটা ঘনীভূত হয়ে আবার বৃষ্টির পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার বর্ণনা কবির বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচায়ক। টমাস স্টেয়ার্নস এলিয়টের কবিতায় প্রকৃতির ধূসর রূপটি উঠে এসেছে। তাঁর বিখ্যাত রচনা *The Waste Land*র জন্য তিনি ১৯৪৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রকৃতি-মনস্কতার জন্য ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচিত কবিতাগুলো স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর এবং স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রকাশিত হয় *Lyrical Ballads* (1798)। এছাড়া তাঁর ‘The prelude’, ‘Tintern Abbey’, ‘Three years she grew’, ‘Immortality Ode’- প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতির প্রাণবন্ত উপস্থাপনা পাঠকের মর্মমূলে ভাস্বর হয়ে আছে। ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি-চেতনার সাদৃশ্য বিদ্যমান। সমালোচক রামজি লাল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার পরিচর্যা সম্পর্কে বলেছেন :

In *Tintern Abbey* also Wordsworth traces the development of his love for Nature. In his boyhood Nature was simply a playground for him. At the second stage he began to love and seek Nature but he was attracted purely by its sensuous or aesthetic appeal. Finally his love for Nature acquired a spiritual and intellectual character and he realized Nature's role as a teacher and educator. (Ramji Lal, 1993 : 44)

তঁার কবিতার মধ্যে চারটি পরিচর্যা আছে : প্রথমত. শৈশবের স্মৃতিসমৃদ্ধ প্রকৃতির রূপ তিনি ঐকেছেন তঁার কবিতায়। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'লুসি' ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের 'অপু' সমগোত্রীয়। দ্বিতীয়ত. প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভেতরে তিনি বিশ্বশিল্পীকে দেখেছেন, তার কবিতায় সর্বেশ্বরবাদের প্রভাব পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণের 'বিশ্বশিল্পী', 'মাকাল-লতার কাহিনী', 'কুশল পাহাড়ী' গল্পে প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভেতরে বিশ্বসৃষ্টার উপস্থিতির অনুভব সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) প্রভাবের বিষয়টি স্পষ্ট করে। তঁার 'মড়িঘাটের মেলা' ছোটগল্পে কথকের প্রশ্নের উত্তরে বুনো সাধুর স্পষ্ট উচ্চারণ সর্বেশ্বরবাদের প্রমাণ : '[...] এখানকার গরীব লোকে পয়সা খরচ করে গঙ্গায় নাইতে যেতে পারে না মাষী পূর্ণিমায়। তাই রটিয়ে দিয়েছি মা গঙ্গা এই মড়িঘাটের গাঙে আসবেন বলেছেন আমার কাছে পূর্ণিমার যোগের দিন। মন শুদ্ধ করে নাইলে এখানেই গঙ্গা! তিনি নেই কোন্ জায়গায়?' (মড়িঘাটের মেলা) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপিগুলোতেও তঁার সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মনের পরিচয় পাওয়া যায় :

ক. নদীজলে বিকেলে নাইতে নেমে ইছামতীর কালো জলে দেখি ভগবানের আর
একটি রূপসৃষ্টি :

যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে

যিনি শোভন এ ক্ষিতিলেতে

উপনিষদের ঋষিরা শুধু দার্শনিক ছিলেন না, দ্রষ্টা ছিলেন, কবি ছিলেন।'

(বিভূতিভূষণ, ১৪২০ : ৫৫৮)

খ. 'আমি ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই। তঁার এই লক্ষ বিরাট রূপের মধ্য দিয়ে।'

(বিভূতিভূষণ, ১৪২২ : ৩২৬)

তৃতীয়ত. প্রকৃতির মধ্যে তিনি শুষ্কতার শক্তি দেখেছেন; ধ্বস্ত, আহত ও ক্লান্ত প্রাণে নিবিড় প্রকৃতির সান্নিধ্যে এর অন্তর্নিহিত শক্তি আত্মস্থ করলে প্রশান্তি অর্জনের সম্ভাব্যতার কথা বলেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির মাঝে অবগাহনের মাধ্যমে 'Tranquil Restoration' বা 'প্রশান্তি পুনরুদ্ধারের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রকৃতির মাঝে যে প্রশান্তি আছে তা প্রকৃতির সান্নিধ্যে না-গেলে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শহুরে যান্ত্রিক জীবন ও সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলেছেন : 'দাও ফিরে অরণ্য, লও এ নগর।' এ যেন প্রকৃতির কোলে আশ্রয়ের জন্য লালায়িত ও দুর্বিষহ নাগরিক জীবনের প্রতি সংক্ষুব্ধ প্রাণের মর্মান্তিক আত-চিৎকার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতির মাঝে সতত বিচরণের আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা না-

থাকলেও ‘কবি’ গল্পে রঘুনাথ দাসের সাহিত্যচর্চার কুটির দেখে জায়গাটি কিনে সেখানে বসবাসের ইচ্ছাপোষণ করেন। কিন্তু গ্রামে নাগরিক সুবিধার অভাবহেতু পরবর্তী সময়ে দমে যান। গ্রামে প্রকৃতি থাকলেও নগরকে গ্রামে রূপান্তরিত করার অলীক আশাবাদ ব্যক্ত করেননি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দিনলিপিতে ক্রান্ত মনের শুশ্রূষার জন্য একা প্রকৃতির মাঝে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। দিনলিপি *অভিযাত্রিক* এ তিনি বলেন :

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের যেতে হয় একাকী, তবেই প্রকৃতির রানী অবগুষ্ঠন উন্মোচন করেন দর্শকের সামনে, নতুবা নয়। চুপ করে বসে থাকতে হয়, একমনে ভাবতে হয়, মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে দেখলে মনে আপনিই কত ভাবনা এসে পড়ে। [...] এমন কি সঙ্গে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি থাকলেও প্রকৃতির সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না। (বিভূতিভূষণ, ১৪০১ : ৩১৩)

চতুর্থত. উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর কবিতায় প্রকৃতিকে তিনি নৈতিক শিক্ষক হিসেবে আবিষ্কার করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রকৃতিকে শিক্ষকরূপেই দেখেছেন। তিনি তাঁর দিনলিপি *অভিযাত্রিক*-এ বলেন : ‘আমার এই দৃঢ় ধারণা, যে দেশভ্রমণ করেনি, প্রকৃতিকে বিভিন্নরূপে দেখেনি, কোথাও বা মোহন, কোথাও বিরাট বা কোথাও রক্ষ ও বর্বর-তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে অনেক বাকি।’ (বিভূতিভূষণ, ১৪০১ : ৩৬৮)। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতোই তিনি প্রকৃতির ভেতর সাধারণ সৌন্দর্য, ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, শুশ্রূষার গুণ ও শিক্ষার উপকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি-চেতনার সঙ্গে উইলিয়াম হেনরি হাডসন-র *Green Mansion's* (1904), নুট হামসন-র *Pan* (1894), হেনরি ফ্রেডরিখ এমিল-র *Amiel's Journal* (1913), বিখ্যাত শিকারী জিম করবেটের *Jungle Lore* (1935) উপন্যাসের মূলগত চেতনার সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে মানুষের সমান্তরালে প্রকৃতি-চেতনার প্রয়োগ অর্বাচীন নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে প্রকৃতির উপস্থাপনা দুস্ত্যাপ্য নয়, কিন্তু তা শিল্পীর সচেতন সত্তায় জারিত না হওয়ায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোমান্টিক প্রকৃতি-চেতনার দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) কথাসাহিত্যে প্রকৃতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাঁর *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *আনন্দমঠ* (১৮৮২) ও *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪) উপন্যাসে প্রকৃতির প্রক্ষেপণ ঘটেছে। প্রেক্ষাপট, পটভূমি ও প্রতিবেশ তৈরিতে প্রকৃতির ব্যবহার দেখা যায় *আনন্দমঠ* ও *দেবী চৌধুরাণী* উপন্যাসে। *কপালকুণ্ডলায়* মানুষ ও প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এখানে ‘কপালকুণ্ডলা’ মূলত প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে বেড়ে উঠেছে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) কাব্যেও প্রকৃতি-চেতনা আছে, কিন্তু তা অস্বচ্ছতার বেড়াজালে আবদ্ধ। প্রকৃতি তার সর্বৈব সত্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, মুক্তি পেয়েছে বলা যায়— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) কাব্য ও ছোটগল্পে। বিশেষত তাঁর পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত ছোটগল্পগুলোতে প্রকৃতি বিচিত্র সত্তায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কাব্যেও প্রকৃতি তার ফুল-দল মেলে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থে যুগপৎভাবে ধূসর এবং সজীব ও প্রাণবন্ত প্রকৃতির সহাবস্থান প্রকৃতি ভাবনায়

নবতর মাত্রা যোগ করেছে। প্রকৃতিপ্রীতি ও প্রকৃতির প্রতি দুর্বীর মোহনীয় আকর্ষণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত ও প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে পরিপুষ্ট বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিপ্রীতিই তাঁর শিল্পীমানসকে কল্লোল গোষ্ঠী থেকে বিচ্যুত করে রবীন্দ্রানুসারী হিসেবে গড়ে উঠতে প্রণোদিত করেছে। তাঁর প্রকৃতি মানব-বর্জিত নয়। আদিবাসী ও অরণ্যচারী সরল মানুষ, শিশু ও গ্রামীণ মানুষ প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ। বাংলার মানুষ ও প্রকৃতির যৌথরূপের নিখুঁত চিত্রায়ণে তাঁর ছোটগল্পসমূহ কালোত্তীর্ণ মহিমা লাভ করেছে। তাঁর স্মৃতির রেখা (১৯৪১) দিনলিপিতে মানুষ ও প্রকৃতির মিথষ্ক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন :

বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক-বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র বাংলার সন্ধ্যাসকাল আকাশ-বাতাস, ফল, ফুল-বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃত ছায়া বরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখ দুঃখকে রূপ দিতে হবে। (বিভূতিভূষণ, ১৪০২ : ২৬৭)

রবীন্দ্রানুসারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনায় প্রকৃতির নির্মোহ রূপায়ণ ঘটলেও তাঁর ছোটগল্পে প্রকৃতি চিত্রায়ণ গৌণ হয়ে উঠেছে, সেখানে মুখ্য মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের প্রকৃতি-চেতনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-ভাবনার পার্থক্য বিদ্যমান। ‘বিমূর্তন রবীন্দ্রসাধনার প্রবণতা— বিভূতিভূষণ জীবন রস-পিপাসু। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় পদ্মা শেষে ‘বলাকা’র বিরাট নদী’তে পরিণত; বিভূতিভূষণের আদিত্যেও ইছামতী, অন্তেও সেই ইছামতী।’ (তারকনাথ, ১৩৭৬ : ১০৯) রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃতি-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হলেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে তাঁর কবিচিন্তা পাঠককে আনন্দময় সৌন্দর্যলোকাভিসারী করে এক নির্জন মায়াময় আবহে পৌঁছে দেয়, যা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-ভাবনা থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেন : ‘মানবিক সত্যের সাথে প্রাকৃতিক সত্যের মিশ্র দিয়া গল্পগুলিকে কবিত্বরূপে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছেন।’ (বিশী, ১৩৬৪ : ২৩) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতির সচেতন প্রয়োগ তাঁর গল্পের কাহিনি বা চরিত্রের পরিণতিকে প্রভাবিত করেছে। যেমন : যেসব গল্পে বৃষ্টির দৃশ্য বা পটভূমি সংযোজিত হয়েছে সেগুলোর নিষ্পত্তিতে অনিবার্যভাবে ট্রাজিক রসের উৎপত্তি হয়েছে। ‘পোস্টমাস্টার’, ‘ছুটি’, ‘মধ্যবর্তিনী’, ‘জীবিত ও মৃত’ প্রভৃতি গল্পে বৃষ্টির আবহ এরই সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়া বিভিন্ন গল্পে ‘বৃক্ষ’ ও ‘অন্ধকারের’ উপস্থাপনা গল্পের কাহিনির পূর্ণতাব্যঞ্জক সংকেত দান করে। অন্ধকারের সাথে মানবমনের মিথষ্ক্রিয়া লক্ষ করা যায় ‘সমাপ্তি’ গল্পে— ‘মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাতে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল’; (সমাপ্তি)। ‘অন্ধকার অজ্ঞাতসারে এমন এক গীতময় সঙ্গরূপশীল আবহ সৃষ্টি করেছে, যা অবিকশিত স্বামীবিমুখ মৃন্ময়ীর অপূর্ব-বিশ্বাস, সারল্য ও আকাজক্ষাকে সংগোপনে সম্ভাবিত করেছে।’

(আকরম, ২০১০ : ৩১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে এরকম মানুষ ও প্রকৃতি মিশে একীভূত হয়নি, প্রকৃতি এসেছে বিক্ষিপ্তভাবে, সেখানে গভীর কোনো দ্যোতনা সৃষ্টি করেনি, প্রকৃতি শুধু গল্পের প্রতিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কনে দেখা’ গল্পে ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। গল্পের নায়ক হিমাংশু প্রিয় এরিকা পাম গাছটিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব আরোপ করে। এরিকা পাম গাছটিকে অন্যের বাড়িতে দেখতে গিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পায়। তখন অনুভব করে, ‘ও যেন বলছে, আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি তোমার কাছে গেলে হয়তো এখনও বাঁচবো! ছেড়ে যেও না এবার! আমায় বাঁচাও!’ (কনে দেখা) বাসায় ফিরে রাতে ভালো ঘুমাতে পারে না হিমাংশু। পরদিন এরিকা পাম গাছটিকে উদ্ধার করে প্রসন্ন চিন্তে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার একে বিয়ে দেওয়ার সাধ জাগে। হিমাংশু বলে- ‘তাই অল্প বয়সের, দেখতে ভালো পাম খুঁজছিলাম। হি-হি-পাগল নয় হে পাগল নয়, ভালোবাসার জিনিস হোতো তো বুঝতে।’ (কনে দেখা) এরকম অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা সাধারণ মানুষের বুঝতে কষ্ট হলেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বৃক্ষপ্রেমিক তথা প্রকৃতিপ্রেমিকের পক্ষে অনায়াস সাধ্য।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতিমুগ্ধতা যে একেবারে নেই তা নয়, যেসব গল্পে প্রকৃতির মোহনীয় রূপের মুগ্ধতার প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে মানুষের জীবন নেই, শুধু প্রকৃতির দর্শন ঘটেছে (‘বিক্রমখোল’, ‘প্রভাতী’, ‘মানতালার’, ‘ছোটনাগপুরের জঙ্গলে’ প্রভৃতি গল্পে) ফলে কোনো সরস কাহিনিবৃত্তও তৈরি হয়নি। গল্পকার যেখানেই প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছেন, সেখানেই অপূর্ব মহান শিল্পীর প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি ঈশ্বর ভাবনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। ‘নব-বন্দাবন’ গল্পে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত কর্ণপুর বন্দাবন যাওয়ার পথে একশিশুকে কুড়িয়ে পেয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার আশা ত্যাগ করে পুনরায় গৃহী হয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসে এবং শিশুটিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্রত গ্রহণ করে। গল্পের শেষে সে কৃষ্ণের বাঁশির তান শুনতে পায়। গৃহী কিংবা সন্ন্যাসীর চেয়ে বড় হলো মানবধর্ম, কর্ণপুর মানবধর্ম পালন করেছিল তাই গৃহী হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছিল। ঈশ্বরের কৃপায় দুশরিত্র হরিপ্রাণ মুখুজের ধর্মপ্রাণ সাধুতে রূপান্তরিত হওয়ায় গল্প ‘হরিকাকা’। ‘বিশ্বশিল্পী’ গল্পে গল্পকার প্রকৃতির সাধারণ বন্যলতার সৌন্দর্যের মধ্যে পরম ব্রহ্মের আশ্বাদ লাভ করেছেন। গল্পকার বলেন : ‘পরম ব্রহ্মের প্রাণময়ী বার্তা বহন করে এনচে ওই বন্যলতা লোক-লোকান্তরের অসীমতা থেকে। যে মহাশিল্পীর হাতের এই অতি সুকুমার শিল্প, সেই শিল্পীর স্বাক্ষর আছে ওর পাতায়, ফুলে, লাবণ্যময় দুর্লুনিতে-ওর মধ্য দিয়েই তাকে প্রত্যক্ষ কর।’ (বিশ্বশিল্পী) ‘মাকাল-লতার কাহিনী’ গল্পেও মাকাল ফল ও লতার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ প্রাণ গল্পকার, প্রকৃতির অনাবিল রূপের মধ্যে ঈশ্বরের অপার সৌন্দর্য বিভা আবিষ্কার করে ঔপনিষদিক আনন্দ লাভ করেছেন। প্রকৃতি-চেতনার সমান্তরালে গল্পকারের অন্তর্লোকে সতত বিরাজমান ছিল ঈশ্বর-বিশ্বাসের অখণ্ডতা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিপ্রাণতা ছড়িয়ে আছে তাঁর রচিত নানা সাহিত্যে। এই প্রকৃতি প্রীতিই তাঁকে প্রকৃতির মত অনাবিল, সরলমনা, অকৃত্রিম ও সহজ জীবন চর্যার অধিকারী আদিবাসীদের নিয়ে সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেছে সন্দেহ নেই। তিনি প্রকৃতির সাহচর্যে যেতেন নাগরিক সংস্কৃদ্ধ মনের গুঞ্জনর জন্য। সেখানে তিনি এক অজানা রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, যা আদিবাসীদের সরল, প্রাণবন্ত জীবনযাপনে সংগৃহীত ছিল। আর তা হলো সহজ নির্লোভ জীবনচর্যা, যেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাওয়ার বাসনা নেই আছে অল্পে তুষ্টির অভ্যস্ততা। যার প্রাঞ্জল বর্ণনা রয়েছে তাঁর বনে পাহাড়ে দিনলিপি পাঠ্য পাতায়। গল্পকার খেলাতচন্দ্র ঘোষ স্টেটের জঙ্গল-মহালে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালনের সময় সাঁওতাল আদিবাসীসহ নানা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন। সেখানে তাদের লোকজ, বন্য অথচ স্বনির্ভর জীবনপ্রণালীর অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ও অভিভূত হন। তাঁর ছোটগল্পে আদিবাসীদের সংস্কৃতি, জীবনদর্শন ও নির্লোভ সহজ জীবনযাপনের চিত্রই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তাঁর আদিবাসীদের নিয়ে লেখা ছোটগল্পের মধ্যে রয়েছে ‘বোতাম’, ‘কালচিতি’, ‘কবি’ প্রভৃতি।

‘বোতাম’ গল্পে আদিবাসী তরুণী চম্পূর রাজনৈতিক নেত্রী এলিশাবা কুইয়ে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। আশ্রয়দাতা মাকা হোর মৃত্যুর পর দিশেহারা হয়ে ওঠা তরুণী চম্পূ নিজের সন্তান রক্ষার্থে ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় ধর্মাস্তরিত হয়ে এলিশাবা নাম ধারণ করে। কথক পিডলিউ ডি-র চাকরি সুবাদে সিংভূম বা রাঁচি অঞ্চলে যায় বাঁধ তৈরির কাজে। সেখানে কুলি তরুণী চম্পূর উপর ওভারসিয়ার নিকোডিম কারকাটার অত্যাচারের প্রতিবাদ করার সময় চম্পূর সঙ্গে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরের আঘাতে কথকের পায়ের আঙুল খেঁতলে গেলে কুলি মেয়ে চম্পূ নিজের শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে পট্টি বেঁধে দিয়ে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। যে ঘরের বিবরণ নিম্নরূপ :

জঙ্গলের ধারে বলিবা গ্রামের একটি ঘরে ওরা আমায় নিয়ে এল। ...শালকাঠের খুঁটি ও আড়ালাগানো একখানা কুঁড়েঘর, না তার জানালা না দরজা-ঘরের সামনে শালকাঠের তক্তা সোজা করে পুঁতে বেড়া দেওয়া। ওরকম ঘরে কখনো বাস করিনি। তেমনি শীত এখন এই বনের মধ্যকার গ্রামে। চাহড় লতার ছালের দড়ি দিয়ে ছাওয়া একখানা খাটিয়াতে ঘরের চরখা-কাটা মোটা সুতো দিয়ে বোনা একখানা চাদর পেতে দিলে শতরঞ্জির মত পুরু। (বোতাম)

চম্পূ তখন আদিবাসী ভাষা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ চালিয়ে নিতে হয়, যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে পরবর্তী কাজ করে আশ্রয়দাতা মাকা হো, যে হিন্দি বলতে ও বুঝতে পারে। বনজ ঔষধ বাটা ঘায়ে লাগিয়ে দীর্ঘ ১০ দিন গুঞ্জনর পর কথক সুস্থ হয়। নিকোডিমের হাত থেকে রক্ষা করার প্রতিদানস্বরূপ চম্পূ তার সেবা করেছিল। মাকা হোর ভাষা মতে- ‘চম্পূ বলচে, কোনো ভয় নেই তোমার। তোমার পা ও সারিয়ে দেবে। তুমি যতদিন সেরে না ওঠো, নির্ভাবনায় এখানে থাকো। তোমার কর্তব্য তুমি করেচ, ওর কর্তব্য ও করবে।’ (বোতাম) ভাষা না বুঝলেও বন্য বালিকার

নয়নের স্নেহের দৃষ্টি ও ভালোবাসা অনুভব করেছিল কথক। চলে আসার সময় কৃতজ্ঞতারস্বরূপ হাতঘড়িটা খুলে দিয়ে আসতে চাইলে তা নিতে অস্বীকৃতি জানায় চম্পু, বিনিময়ে নিয়েছিল জামার পেতলের বোতাম যার মূল্য ছ আনা পয়সা। অপ্রকাশিত প্রেমের স্মৃতিস্বরূপ এই বোতামটাই রেখে দিয়েছিল নিঃস্বার্থ বালিকা চম্পু। এ গল্পের মাধ্যমে গল্পকার সুকৌশলে বোঝাতে চেয়েছেন, আদিবাসীদের অরণ্যবাসী বলে অবহেলা করার সুযোগ নেই। যথেষ্ট সুযোগ পেলে তাদের মধ্য থেকেও এলিশাবা কুইয়ের মতো নেত্রী সৃষ্টি হতে পারে, ব্রিটিশদের রাজত্বে থেকেও পাহাড়ে যে দুইমাস স্বাধীন সরকার পরিচালিত করেছিল। এগল্লে আদিবাসীদের সংস্কৃতি হিসেবে এসেছে তাদের ঘরবাড়ি, ভাষা ('মাস্তি' অর্থ ভাত, 'জুম পে'? অর্থ পায়ে লাগছে?), চিকিৎসা পদ্ধতি (কথকের আঙুল খেঁতলে গেলে বনজ ঔষধ অর্থাৎ শিকড় বাটা তার পায়ে লাগিয়ে দিয়েছিল চম্পু), খাবার (ভাত ও শকরকন্দ আলু সিদ্ধ, বাসন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে শালপাতা) সর্বোপরি তাদের নিঃস্বার্থ, নিলোভ মানসিকতা ও অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

'কালচিতি' গল্পে আদিবাসী জনপদের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উঠে এসেছে। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে সরল অথচ প্রাণবন্ত জীবনপ্রণালী পাঠককে প্রাচীন ভারতবর্ষের অনার্য জীবনবেদের আশ্বাদ দান করে। কথক ডাক্তার পরিবারসহ আদিবাসী নারান হাসদার আমন্ত্রণে কালচিতি গ্রামে যাওয়ার পটভূমিতে গল্পটি রচিত। গরুর গাড়ীতে ভ্রমণকালে নিজের বয়স সম্পর্কে উদাসীন ইঞ্চি দুই চওড়া কাপড়ের কোপিন পরিহিত আদিবাসী বৃদ্ধ কাঠুরে গনু সর্দারের সঙ্গে দেখা হলে লেখক তাদের নৈমিত্তিক খাবারের অনাড়ম্বরতা ও সাহসিকতা সম্পর্কে বলেন :

... ভিজে চাল আর নুন দিয়ে খেয়েছে। এসব বন্য দেশে আটা ছাড়া প্রভৃতি খাদ্য একেবারে অচল। এরা ভাত ছাড়া কিছু বোঝে না। এমন কি তরকারি পর্যন্ত খায় না, হয়তো একটু শাকভাজা আর নুনের টাকনা দিয়ে এক বড় জামবাটি ভর্তি পান্তাভাত দিবি মেরে দিলে। তাতেই এদের সবল স্বাস্থ্যবান পাথরকোঁদা চেহারা, ধনুকবান নিয়ে বড় বাঘ ও বুনা হাতী আর ভীষণ বিষধর শঙ্খচূড় সাপের সামনে এগিয়ে যাবে নির্ভয়ে। আর ভালুক? সে তো এদের ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘোরে। ... ঘটতে চা এল আর এল তালের পরোটা, গরম ভাজা মুড়ি, তালের ক্ষীর, মর্তমান কলা, আর শসার কুচি নুন-নেবু মাখানো। যা কিছু সবই এ গ্রামের, কেবল পরোটার আটা এসেছে বাইরে থেকে। অবশ্যি চা-চিনিও। খাঁটি দুধের তৈরি তালের ক্ষীরটি অতি উপাদেয় হয়েছিল। (কালচিতি)

নিজস্ব গ্রামীণ প্রযুক্তিতে উৎপাদিত বিশুদ্ধ খাবার খাওয়ার পর তারা যে পানি পান করেছে তার উৎস হলো প্রাকৃতিক ঝরনা। তৃপ্তি নিয়ে খাওয়ার পর আসে পিকা খাওয়ার পালা। এসব বনাঞ্চলে সিগারেট-বিড়ির প্রচলন কম। তাই তারা নিজেদের তৈরি 'পিকা' খায়। 'পিকা' হলো- 'কাঁচা শাল-পাতায় জড়ানো তামাকের পাতা; বিড়ির আকারের বটে, তবে আধহাত লম্বা। বাজারের বিড়ির চেয়ে পিকা খেতে অনেক ভাল লাগে।' (কালচিতি) আদিবাসীদের ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ ও সাজসজ্জা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে। এসব ঘরবাড়ি প্রায় শতবর্ষের পুরাতন হলেও জীর্ণ হয়ে

যায়নি, মাঝে মাঝে নতুন ছাউনি দিলে এগুলো নবযৌবন লাভ করে। গল্পকারের ভাষ্যমতে :

... রাস্তার দুধারে অবস্থিত সারবন্দী ওদের বাঁশ-খড়ের ছোট নীচু ঘরগুলির মেঝে ও দাওয়া এলা মাটির রং করা, নিকানো মোছানো, দেওয়ালের বাইরে ধনেশপাখীর চবি আঁকা, ভালুকের, পাহাড়ের ও ফুলগাছের ছবি আঁকা। ... খড়ের বাড়ী, মাটির দেওয়াল, মাঝখানে বড় একটা চওড়া ঘর, তার চারপাশে কুঠুরি, শালকাঠের দরজা জানালা। কোথাও চুন সিমেন্টের বালাই নাই। (কালচিহ্নিত)

অতিথি সৎকারের রীতি অনুযায়ী প্রকৃতির অটেল দান শাক-সবজি আদিবাসীরা নিজেরা ভোগ করার পর উদ্বৃত্ত অংশ ভব্যতার চিহ্নস্বরূপ অতিথিকে বিদায় দেওয়ার সময় উপটোকন হিসেবে দেয়। কথকের পরিবারও এর থেকে বঞ্চিত হয় না। বিদায়বেলায় কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে উপটোকন হিসেবে গাড়ীতে তুলে দেয়— টেঁড়শ, কুমড়া, পাতিলেবু, বড় একছড়া মর্তমান কলা, গোটা চারেক পাকা তাল। অন্ধকার রাতে জ্বালানি হিসেবে আদিবাসীরা কেরোসিন তেলের উপর নির্ভর করে না। বনাঞ্চলে বিদ্যুৎ ও কেরোসিনের তেলের অভাব পূরণ করে মছয়া বীজের তেল ও বন-করজার তেল। বনই এদের একমাত্র অবলম্বন, মাতৃসম মমতায় বনই এই আদিবাসীদের সকল চাহিদা মেটায়।

‘কবি’ গল্পে এক আদিবাসী কবি রঘুনাথ দাসের অনাড়ম্বর জীবনপ্রণালীর সরস বিবরণ দিয়েছেন গল্পকার। কবি রঘুনাথ দাসের আকৃতি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, পরনে লেংটি, মাথায় বাবড়ি চুল, বয়স প্রায় চল্লিশ এবং বেশ স্বাস্থ্যবান সুঠাম দেহের অধিকারী। সে টুসু পরব উপলক্ষে বই ছাপিয়ে বাৎসরিক ত্রিশ টাকা আয় করে। এছাড়া পাহাড়ের কোঁলে তার ধানের জমি আছে, ভাদ্র মাসে মকাই হয়। বছরে কুরমি ফলে প্রায় দশ মণ। গাছে ফলে ধুঁধুল, চিচিঙ্গে, টেঁড়শ এই দিয়েই তাদের সবজির অভাব পূরণ হয়। আদিবাসীদের খাবার নিয়ে বিশেষ চাহিদা নেই। ফলে অল্পে তুষ্ট এসব আদিবাসীরা প্রকৃতির ক্রোড়েই বসবাস করতে পছন্দ করে। অল্প খেয়েও সুঠাম দেহের অধিকারী এদের বয়স অনুমান করা যায় না। তাদের খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে কথকের ভাষ্য :

দুবেলা বাঙালী বাবুদের মত ভাত খেতে হবে, তা নয়। ভুট্টাপোড়া খেয়েই দুদিন কেটে গেল। জঙ্গলী আলু একরকম আছে, কার্তিক মাসে পাহাড়ের জঙ্গল থেকে গ্রামসুদ্ধ মেয়েরা তুলতে যায়। সকরকন্দ আলুর মত মিষ্টি। এক একজন একমণ দেড়মণ পর্যন্ত আলু তুলে আনবে জঙ্গল থেকে। তাই খেয়েই পনেরো দিন কেটে গেল—এমনই। (কবি)

একধামা মুড়ি, আট দশটা ভুট্টাপোড়া, শসাকুচি ও চাপর্ব সমাধা করার পর যখন কবি রঘুনাথ দাস তার স্বরচিত নিসর্গপ্রীতির কবিতা পাঠ করতে আরম্ভ করে তখন কথকের মনে হয় এমন নির্জন পাহাড়ে কিছু জায়গা কিনে নিয়ে বসবাস শুরু করে। কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধার কথা মনে পড়াতে উৎসুক মনের আগ্রহে ভাটা পড়ে যায়। পাহাড়ের শালফুলের সুবাস, দেবকাঞ্চনের সৌন্দর্য, কবির কাব্যচর্চা, আতিথেয়তা ও

আদিবাসীদের সহজ জীবনচর্যা এসবকিছু কথককে প্রাচীন ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়ে। কথকের ভাষ্যমতে :

সত্যিই এই সরল বন্য কবির জীবন আমাদের কাছে লোভনীয় মনে হইল। আর এই পাহাড়ের কোলের ছোট ঘরখানা।...প্রাচীন ভারতবর্ষে এমনই শৈলারণ্যে এমনই আশ্রমে কত কবি 'ভাস', 'অবিমারক', 'স্বপ্ন বাসবদত্তা' রচনা করিয়া গিয়াছেন, কত কালিদাস 'মেঘদূত' লিখিয়াছিলেন, কত ভবভূতি প্রশ্রবণগিরির বর্ণনা করিয়াছিলেন। সুঠাম তরুণী কবিপ্রিয়া খোঁপায় শালমঞ্জরী গুঁজিয়া ময়ূরকে আহাৰ্য প্রদান করিতেন আশ্রমের অঙ্গনে। দিকে দিকে মুক্ত প্রকৃতির আহ্বান।...আমাদের রঘুনাথ দাস তাঁহাদেরই সেই ধারা এই অরণ্যপ্রান্তে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাঁহাদেরই প্রতীক ও।

(কবি)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসীদের সহজ জীবনযাপনে মুগ্ধ ছিলেন বলেই তাঁর ছোটগল্পে তাদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। আধুনিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলো থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থিত এসব আদিবাসী প্রকৃতির দক্ষিণে বেড়ে ওঠে তাই সরল জীবনই তাদের ব্রত। কুটিলতামুক্ত এসব মানুষকে যথার্থরূপেই সাহিত্যে তুলে এনেছেন গল্পকার। আধুনিক সমাজের তথাকথিত সভ্য মানুষ বনবাসী এসব মানুষের আশ্রয়ে হানা দিয়ে সভ্যতার আলো ছড়ানোর নামে তাদের উদ্ধাস্ত করে এদের জাতিগত স্বকীয়তা, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতিকে কলুষিত করছে। ফলে সামাজিক ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং অবশ্যম্ভাবী বৈশ্বিকভাবে আক্রান্ত প্রকৃতি প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে উঠছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ মানব সভ্যতার অনিবার্য ধ্বংসই ডেকে আনে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পরিবেশতত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই শতকের ষাট ও সত্তর দশকে শিল্প-কারখানার দূষণ এবং আশির দশকে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠলে পরিবেশতত্ত্ব জনপ্রিয়তা পায়। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলে শিল্পায়নের বিকাশ যে পরিবেশের সংকট তৈরি করেছে তার দায় পুরোপুরি শিল্পোন্নত দেশগুলোর। দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া শিল্পোন্নত দেশ মানেই ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিভূ ইউরোপ ও আমেরিকা। পরিবেশতত্ত্ব ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর আত্ম-প্রতারণার মত বিষয়, যেহেতু তারা নিজেরাই 'উন্নয়ন'-এর নামে নিজেদের এবং উপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলোর পরিবেশ নষ্ট করেছে। এখন তারাই পরিবেশ রক্ষায় সোচ্চার!

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে উপর্যুক্ত পরিবেশতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যাবলির প্রক্ষেপণ লক্ষ করা যায়। 'নদীর ধারে বাড়ি' গল্পের যদুনাথ ও শ্যামলী নতুন পরিপূর্ণ জীবনের আশায় শহরের জটিল ও কৃত্রিম পরিবেশে ছেড়ে পরিবারসমেত শহরবাস গুটিয়ে গ্রামে প্রকৃতির বুকে আশ্রয় নিয়েছিল। গল্পকারের ছোটগল্পে প্রকৃতিই একটা স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে উঠেছে। তাঁর 'মাকাল-লতার কাহিনি' গল্পে বিন্দুর মধ্যেই তিনি সিদ্ধু দেখেন। মাকাল লতার মত সাধারণ লতার ঝোপের মধ্যেই তিনি বিশ্বের অপরিমেয় বিশ্বসৌন্দর্যকে অবলোকন করেছেন। প্রকৃতি এখানে বিশ্বশিল্পী মহান স্রষ্টার নিপুণ হাতে গড়া শিল্প-সুখমার আকর। গল্পকার সৃষ্টি-সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়ে বলেন :

এর মধ্যেই বিশ্ব। এই মাকালঝোপের নিচেই। এই যে মাকাল-পাতাগুলো এদিক ওদিক অশুভভাবে ঝুলচে গাছ থেকে পড়ে, তার গাটে গাটে পাকা ফল, এই যে রহস্যময় সুন্দর দৃশ্য যার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না, অবাক হয়ে বিমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়— এই সৃষ্টির আইডিয়াকল্পী বীজ কার মধ্যে ছিল? কোন্ দেবতা তিনি? কত বড় শিল্পী তিনি? (মাকাল-লতার কাহিনি)

অবশ্য স্বীকার্য, বৃহদার্থে মানুষ প্রকৃতির সন্তান। গল্পকার প্রকৃতির অংশ হিসেবেই মানুষকে তাঁর গল্পে স্থান দিয়েছেন বলেই চরিত্র হিসেবে এসেছে আবহমান গ্রামবাংলার আপামর সহজ-সরল সাধারণ মানুষ। প্রকৃতির বিচ্যুতি মানেই মানবতা বিপন্ন, সেখানে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য। তাই ‘কাঠ বিক্রি বুড়ো’ গল্পে স্পষ্ট করেই বলেন : ‘[...] লোককে পরামর্শ দেই গাছপালা দেশের সম্পদ, ধরণীর শ্রী ওরা বাড়িয়েচে, ফুলে, ফলে, ছায়ায় সৌন্দর্যে—ওদেরই ডালে ডালে দিন রাত কত বিহগ-কাকলী, ওদের কেটে নষ্ট কোরো না।’ (কাঠ বিক্রি বুড়ো) তবুও মানুষ গাছ কাটে, কখনও পুঁজির লোভে কাটে, কখনও ঔপনিবেশিক শাসনবৃত্তে বাধ্য হয়ে শিল্প-কারখানার জন্য জঙ্গল কেটে নগর গড়ে তুলতে হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* (১৯৩৯) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যচরণ প্রকৃতি ভালোবাসে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের কুচক্র ও নিষ্ঠুর নিয়তির দুর্বিপাকে পড়ে তাকেই জঙ্গল মহাল সাফ করে প্রজা বাড়ানোর দায়িত্ব নিতে হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

প্রকৃতির মালিকানা চলে যাচ্ছে ক্ষমতা ও বিভ্রাটীদের করতলে এবং প্রকৃতির উপর্যুপরি হননের জন্যে ক্ষমতাজালী বর্গই দায়ী। সারা বিশ্বের শিল্পায়নের ইতিহাস হাতড়ালে এ সত্যের তেমন কোনো ব্যত্যয় ঘটবে বলে মনে হয় না; আর উন্নত বিশ্বের আয়োজনে প্রায় সমস্ত (?) শিল্পায়ন আজ প্রকৃতিবিরোধী এবং প্রকৃতিসংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী বিরোধী। ছোটখাটো মধ্যবিত্ত সত্যচরণ তেমন কিছু করেনি, ‘চাকুরির খাতিরে মনিবের স্বার্থরক্ষার জন্য’ জমি প্রজাবিলি করেছে মাত্র। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর আবাসনের ব্যবস্থা নিয়ে অরণ্যের কিছু অংশ লুণ্ঠ করা তেমন গর্হিত কিছু কি? কিন্তু সভ্যতার সমস্ত দায়ভার যেন সত্যচরণের কাঁধে। আর তাই যুগল প্রসাদের সঙ্গে বৃক্ষরোপণের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে সত্যচরণ ... (সুমন, ২০১১ : ২৬)

উত্তর-ঔপনিবেশিকতার মূল লক্ষ্য হলো, ঔপনিবেশিকতার নিজস্ব সংস্কৃতি খুঁজে করা ও আত্ম-পরিচয় নির্মাণ করা। নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন ও লোকজ অনুশঙ্গগুলোকে পুনরায় চর্চা ও প্রচারের মাধ্যমে উজ্জীবিত করলেই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব। দেশীয় লোকজ অনুশঙ্গ থেকেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পের ভাষা, সংলাপ, চরিত্র, উপমা ও নানা অলংকারের অন্বেষণ করেছেন। তাঁর প্রকৃতিসংলগ্নতাই তাকে পরিবেশবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে যথেষ্ট।

৪

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে দুঃখ-যন্ত্রণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কৃতিত্ব-ব্যর্থতা, ক্রোধ-গ্লানির সমন্বয়ে প্রবহমান মানব জীবনের সামগ্রিকতাকেই ধারণ করেছেন। এখানে তিনি গণমানুষের ভেতরে তাদের অধিকারবোধ জাগিয়ে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। মূলত তিনি জীবনরসিক শিল্পী। নির্মোহ, নির্লিপ্ত রসগ্রাহী হিসেবে মানব

জীবনের বিচিত্র রসাস্বাদনই যেন তাঁর ছোটগল্প রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেখানে জীবনের বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়েছে। মানব চরিত্রের নানা অভিজ্ঞতা তাঁর সজীব কল্পনার মিশ্রণে ছোটগল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। জীবনদৃষ্টির সুবিশাল পার্থক্য থাকলেও উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচনার বিষয়শৈলীর সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পের সমধর্মিতা প্রাধান্যযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে প্রকৃতি-প্রেম এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতি-চেতনার মূলগত পার্থক্য হল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতির সাহচর্যে অর্জিত অনুভূতির সাহায্যে বিশ্বদেবতার কল্পনা করেছেন, আর বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মোহনীয় রূপে শুধু মুগ্ধ ও আত্মতৃপ্তিই হয়েছেন, কোনো সূক্ষ্মতর আকৃতি প্রবল হয়ে ওঠেনি। মূলত অর্জিত জীবনাভিজ্ঞতা ও মৃদু কল্পনার মিশেলের পরিমিতিতে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর ছোটগল্পের অণুবিশ্ব। জীবনকে প্রকাশ ও গোপন করার এই আশ্চর্য পরিমিতিবোধ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মহৎ শিল্পীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর ছোটগল্পে মানুষের জীবনোপলব্ধি, প্রকৃতির সৌন্দর্য-চয়ন ও অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা আশ্চর্য গীতময়তায় একীভূত হয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী। *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প*। দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা।
চিদ্রঞ্জন ঘোষ, *বিভূতিভূষণ*। বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী, কলিকাতা।
তারকনাথ ঘোষ, *জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ*। আনন্দধারা প্রকাশন, কলিকাতা।
প্রমথনাথ বিশী। *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা।
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাস রাজনৈতিক : বিভূতিভূষণ*। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলিকাতা।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলি* ৫ম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা।

—আরণ্যক। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ*। পুনশ্চ, কলিকাতা।

—রবীন্দ্র রচনাবলি, ৮ম খণ্ড। বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, কলিকাতা।

রুশভী সেন (সম্পা.)। *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ধান*। অক্ষর প্রকাশনী, কলিকাতা।

সুমন সাজ্জাদ। *প্রকৃতি, প্রান্তিকতা ও জাতিসত্তার সাহিত্য*। আবহমান প্রকাশনী, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন। *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

Glotfelty, C & Fromm, H., *The eco criticism reader : Landmark in literary ecology*. The University of Georgia press. Athens.

Graham Huggan & Helen Tiffin. *Postcolonial Ecocriticism*. Routledge, London and New York.

Greg Garrard. *Ecocriticism*. Routledge. London and New York.

Ramji Lal, *William Wordsworth Selected poems an evaluation of his poetry*. Aarti Book Centre. New Delhi.

Rueckert, William. "Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism." *Iowa Review*.

Cheryll Glotfelty & Harold Fromm Edit. *Some Principles of Ecocriticism*, The University of Georgia Press. Athens and London.

মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ

মাহিত্যিক

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬ ব. ৥ ১৯৫৯ খ্রি.

ru.ac.bd/bangle/bangle-journal-shahittyki

Print : ISSN 1994-4888

বর্ষ : ৬৬ সংখ্যা : ৫৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ ৥ মে ২০২৫

প্রকাশকাল : মে ২০২৫

প্রবন্ধ জমা : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রবন্ধ গৃহীত : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পৃষ্ঠা : ১১৭-১৪৮

বাংলাদেশের ছোটগল্পে দেশভাগের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার রূপায়ণ

মো. আবু বকর সিদ্দিক

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

ই মেইল : abubakar-bng@sust.edu

সারসংক্ষেপ

দেশভাগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নয়, হিংসা বা দাঙ্গার বিষয় নয়, শরণার্থী সমস্যা নয়; ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকট, পুরোনো স্মৃতি আর অভিজ্ঞতার রূপায়ণই বিশেষভাবে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে (প্রধানত, ছোটগল্পে) প্রতিফলিত হয়েছে। অনেক গবেষক বাংলাদেশের ছোটগল্পে দেশভাগের প্রভাব নিয়ে লিখেছেন; কিন্তু সেসব আলোচনায় দেশভাগের গল্পসমূহে ব্যক্তির স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার রূপায়ণ কীভাবে হয়েছে সে-সম্পর্কে বিশ্লেষণ দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ-পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধে বাংলাদেশের ছোটগল্পে ব্যক্তির স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার রূপায়ণ কীভাবে হয়েছে তার স্বরূপ অন্বেষণ করা হয়েছে। এছাড়া ব্যক্তির স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার রূপায়ণে ছোটগল্পকারদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে।

মূল শব্দ

দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শরণার্থী সমস্যা, ব্যক্তির অন্তর্গত বেদনা, অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন।

প্রাককথন

১৯৫২ সালের ‘ভাষা-আন্দোলন’ ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ—এ-দুটো মহান ঘটনা বাংলাদেশের সাহিত্যকে বেশি প্রভাবিত করেছে। তবে, তৃতীয় যে অধ্যায়টি বাংলাদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তা ১৯৪৭ সালের ‘দেশভাগ’ বা ‘ভারতভাগে’র ঘটনা। বাংলাদেশের সাহিত্যে দেশভাগের ঘটনাবলির বহুমাত্রিক প্রতিফলন ঘটেছে। দেশভাগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নিয়ে রচিত হয়েছে কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও স্মৃতিচারণমূলক গদ্য প্রভৃতি। কেবল বিষয়বস্তুগত প্রভাব নয়, দেশভাগের ফলে ‘ফর্মের বুননকাঠামো’ও বিনির্মিত হয়েছে (শহীদ, ২০২০)। দেশভাগের ঘটনাবলিকে উপজীব্য করে বেশি লেখা হয়েছে ছোটগল্প ও উপন্যাস। তবে, দেশভাগের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে এমন উপন্যাসের সংখ্যা বেশি নয়।

দেশভাগের নানান অনুষঙ্গ নিয়ে ১৯৪৭ উত্তর সময়ে লেখা হয়েছে অনেক গল্প। এ-ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯২৭-২০১৮) ও আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) সম্পাদিত *দাংগার পাঁচটি গল্প* (১৯৫০) নামের একটি সংকলনের কথা। এটি মূলত দাঙ্গাবিরোধী গল্পের সংকলন। এ-সংকলনে চারটি গল্প ও একটি নাটক অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংকলনে মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-১৯৭১) *মানুষ* নাটক ছাড়া বাকি চারটি গল্প হচ্ছে—কৃষ্ণ চন্দরের (১৯১৪-১৯৭৭) ‘পেশওয়ার এক্সপ্রেস’, গল্পটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩); খাজা আহমদ আব্বাসের (১৯১৪-১৯৮৭) ‘প্রতিশোধ’ [মুস্তাফা নূরউল ইসলাম অনূদিত]; আলাউদ্দিন আল আজাদের ‘ছুরি’ ও বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের (১৯৩৬-২০২০) ‘অতন্দ্র’ (বুদ্ধদেব, ২০২০)। দেশভাগের গল্প নিয়ে প্রকাশিত আরও দুটো সংকলন-গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায়—সজল আহমেদ(?) সম্পাদিত *দুই বাংলার নির্বাচিত গল্পে দেশভাগ* (২০১৫)। এই বইয়ে মোট গল্প রয়েছে ৫৩টি। তন্মধ্যে বাংলাদেশি গল্পকারের লেখা গল্পের সংখ্যা ২৯। সুশীল সাহা (জ. ১৯৪৭) সম্পাদিত *দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ* (২০১৭) বইয়ে ৩৪ জন লেখকের ৩৫টি গল্প রয়েছে। এ-সংকলনে গল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পাদকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—তিনি পাকিস্তানের তোষামোদ আছে এমন গল্প বাদ দিয়েছেন এবং ‘মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ গল্প’কে গুরুত্ব দিয়েছেন। (সুশীল, ২০১৭)

বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাহিত্যের ১৯৪৭-২০০০ কালপর্বে দেশভাগের ওপর রচিত পনেরোটি ছোটগল্পকে গভীরভাবে পাঠ করা হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে সজল আহমেদ সম্পাদিত *দুই বাংলার নির্বাচিত গল্পে দেশভাগ* (২০১৫) গল্পসংকলন থেকে পাঁচটি গল্প নেওয়া হয়েছে—সরদার জয়েনউদ্দীনের (১৯১৮-১৯৮৬) ‘ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (১৯২২-১৯৭১) ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’, হাসান আজিজুল হকের (১৯৩৯-২০২১) ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’, জাফর তালুকদারের (জ. ১৯৫২) ‘পিতৃভূমি’ ও সালাম আজাদের (জ. ১৯৬৪) ‘সীমান্ত’। সেই সঙ্গে সুশীল

সাহা সম্পাদিত *দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ* (২০১৭) বই থেকে দশটি গল্প নেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) ‘আলিম মুয়াজ্জিন’, সিকান্দার আবু জাফরের (১৯১৮-১৯৭৫) ‘ঘর’, আবু রুশদের (১৯১৯-২০১০) ‘হাড়’, বুলবন ওসমানের (জ. ১৯৪০) ‘স্যামরক্স ও সহোদরা’, মাহমুদুল হকের (১৯৪১-২০০৮) ‘মুহূর্ত নায়িকা’, হরিপদ দত্তের (জ. ১৯৪৭) ‘নরকযাত্রা’, সেলিনা হোসেনের (জ. ১৯৪৭) ‘শেষ ভিটার আঁচড়’, পূর্বী বসুর (জ. ১৯৪৯) ‘স্থলপদ্ম ও ভীমনাগের সন্দেশ’, সাদ কামালীর (জ. ১৯৬২) ‘দেহত্যাগের পর যে দিন বগুড়ায় এলেন শৈলেশ্বর ঘোষ’ ও প্রশান্ত মৃধার (জ. ১৯৭১) ‘সোনার গোপাল’। উপর্যুক্ত গল্পসমূহে দেশভাগের ‘স্মৃতি’ ও ‘অভিজ্ঞতা’র রূপায়ণ কীভাবে হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধানত পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতি (Textual analysis) অনুসৃত হয়েছে।

২. বাংলাদেশের ছোটগল্পে দেশভাগের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার রূপায়ণ

দেশভাগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ছোটগল্পের মধ্যে ধারণ করা সহজ কাজ নয়। উপন্যাসে সেটা সহজ। বাংলাদেশের ছোটগল্প লেখকেরা দেশভাগকে উপজীব্য করে যেসব গল্প লিখেছেন, সেসবের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকট—কেবল ছোটগল্প নয়, বাংলাদেশের সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও ‘ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকট’ই প্রাধান্য পেয়েছে। বলা যেতে পারে, দেশভাগের সাহিত্যের মৌল উপজীব্য বিষয় দুটো—‘স্মৃতি’ ও ‘নতুন অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন’ (মননকুমার, ২০২১)। দেশভাগের সাহিত্যে তাই ‘স্মৃতি’ তথা ফেলে আসা যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি ব্যক্তির ‘নতুন অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন’ের বয়ানও সমান্তরালভাবে উঠে এসেছে।

বাংলাদেশের ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে অনেকেরই দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। ব্যতিক্রম হিসেবে কয়েক আহমদ (১৯৪৮-১৯৯২), হাসান আজিজুল হক, মাহমুদুল হক প্রমুখ লেখকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে, যেসব লেখক দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেননি, তাঁরা দেশভাগের ইতিহাসের বয়ানকে গল্পে তুলে ধরার চেয়ে চরিত্রের মনোজাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে, তাঁদের গল্পে দেশভাগের ‘স্মৃতি’ ও ‘অভিজ্ঞতার বিবরণ’ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে। বাংলাদেশের সাহিত্যিকেরা দেশভাগের ঐতিহাসিক বিষয়বলি ছোটগল্পে তুলে ধরার চেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকটকে। ব্যক্তির কাছে তার জীবনের ‘স্মৃতি’ ও ‘অভিজ্ঞতা’ এক অমূল্য অধ্যায়। কারণ, ‘[...] ব্যক্তিরও আছে আবার এক নিজস্ব, ক্ষুদ্র ইতিহাস, যার প্রধান সামগ্রী হলো তার অভিজ্ঞতার স্মৃতি’ (সন্দীপ, ২০১ : ৩০)। তাই, বাংলাদেশের ছোটগল্পে ফেলে আসা জীবনের দুঃসহ স্মৃতিকে ব্যক্তি কীভাবে চেতনে ও অবচেতনে বহন করেছে তার বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি নতুন দেশের নতুন পরিবেশে ব্যক্তির টিকে থাকার সংগ্রাম কিংবা

অভিজ্ঞতাও গল্পের বয়ানে উঠে এসেছে। বক্ষমান প্রবন্ধে, বাংলাদেশের ছোটগল্পে (বিশেষভাবে, নির্বাচিত পনেরোটি গল্পে) ব্যক্তির স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার রূপায়ণ কীভাবে হয়েছে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার বিষয়টি কীভাবে দেশভাগের ছোটগল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২.১ শওকত ওসমানের ‘আলিম মুয়াজ্জিন’

শওকত ওসমানের ‘আলিম মুয়াজ্জিন’ দেশভাগের ওপর লেখা একটি অসাধারণ গল্প। এ-গল্পে শওকত ওসমান ব্যক্তির ওপর দেশভাগের প্রভাবকে তুলে ধরেছেন। ‘আলিম মুয়াজ্জিন’ গল্পে দেশভাগের স্মৃতির বর্ণনা নেই; বরং দেশভাগের ফলে ব্যক্তি চরিত্রের (আলিম মুয়াজ্জিন) অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। দেশভাগের কারণে ব্যক্তির জীবন-সংগ্রামই গল্পের মূল বিষয়। ব্যক্তির মনোচৈতন্যে রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কীভাবে প্রভাব ফেলে, প্রতিনিয়ত কীভাবে ব্যক্তির হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে, যার ফলে ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্য পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে—সেই সংকটের তদন্ত করেছেন গল্পকার। অর্থাৎ, গল্পকার আলিম মুয়াজ্জিন চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেশভাগের নির্মম অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন। কেবল দেশত্যাগী, ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা আলিম মুয়াজ্জিন চরিত্রে প্রতিফলিত হয়নি, উন্মাদ আলিমের মধ্য দিয়ে গল্পকার ধর্মের নামে যারা দেশকে বিভক্ত করতে চায় তাদেরকেও ব্যঙ্গ করেছেন।

‘আলিম মুয়াজ্জিন’ গল্পে এক মুয়াজ্জিনের জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে। তার নাম আলিম। পুরো নাম আলিমউদ্দিন নকীবুল্লা খাঁ শাহে। আলিম ২০ বছর ধরে মসজিদে আজান দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছে। তার আশা ছিল, মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র দেশ হলে তার বেতন বাড়বে, সম্মান বাড়বে। কিন্তু এক সময় তার কাছে সব মিথ্যা বলে মনে হয়েছে। সে পেটের খোরাকিতে আর নামমাত্র বেতনে মুয়াজ্জিনের চাকরি করে। তার ছুটিও কম। বাড়িতে যাওয়ার সুযোগও তাই কম। ফলে দেখা যায়, আর্থিক কষ্টে পড়ে তার স্ত্রী বাসেদা অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। একদিন বাড়িতে এসে আলিম মুয়াজ্জিন ঘরের ভেতর ‘সাহেবি টুপি’ আবিষ্কার করে। তখন সে স্ত্রীর অনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারটি বুঝতে পারে। অবশ্য তার স্ত্রী বাসেদা এ-নিয়ে আলিমকে ব্যঙ্গ করে—‘তোয়্যার মন এত ছোডো! মসজিদে শুইয়া মানুষে ফেরেশতা অয় না। আই বুঝি ন, আইজ ক্যান আইলে?’ (শওকত, ২০১৭ : ৩৪)।

আর্থিক কষ্ট ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় আলিম মুয়াজ্জিন এক সময় পাগল হয়ে যায়। লেখক দেশত্যাগী মানুষের যন্ত্রণা আলিম মুয়াজ্জিন চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। গল্পের শেষে দেশভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা যায়—‘হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই। দেশত্যাগী হব না। দাঙ্গাবাজ বরবাদ হোক’ (শওকত, ২০১৭ : ২৩)। আলিম মুয়াজ্জিন সেই মিছিলে সামিল হয় এবং এর মধ্য দিয়ে সে উপলব্ধি করে—‘চলমান মিনারবিশিষ্ট কোনও মসজিদের বরখাস্ত-পদে আবার যেন বহাল হয়েছে সে’ (শওকত, ২০১৭ :

২৩)। গল্পের প্রধান চরিত্রের ('আলিম মুযাজ্জিন') মনোচিত্তনের বিবর্তন সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য হচ্ছে :

গল্পের আলিম মুযাজ্জিন এক সময় সুস্থ, ধর্মপ্রাণ এবং আশাবাদী মানুষ ছিল। সেই আলিম মুযাজ্জিন স্বাধীনতার নামে রক্তক্ষয়ী হানাহানি আর মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা দর্শনে মানসিক ভারসাম্য হারায়—কিন্তু তখনই সে হয় মানবধর্ম উত্তীর্ণ এবং পাগল আলিম সোচ্চারে নষ্ট সমাজের বিবেকের ভূমিকা পালন করে। (সানজিদা, ২০০২ : ১৩১)

আলিম মুযাজ্জিন ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করেছে। সে শহরের অলিগলি ঘুরে বেরিয়েছে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময় উদ্বাস্তদের করুণ জীবনও সে দেখেছে। এ-জন্যেই, আলিম মুযাজ্জিন দেশভাগের ফলে যে নতুন দেশ সৃষ্টি হয়েছে তাকে 'কবর'-এর সঙ্গে তুলনা করেছে। (শওকত, ২০১৭)

২.২ সরদার জয়েনউদ্দীনের 'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা'

সরদার জয়েনউদ্দীনের 'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা' দেশভাগের প্রধান অনুষঙ্গ নিয়ে রচিত একটি গল্প। লেখক দেশভাগের প্রধান ঘটনাবলিকে (মন্ডন্তর, দাঙ্গা ও দেশভাগ) 'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ-গল্পে ইতিহাসের রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাবে ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকটের বিষয়টি শিল্পিত রূপ পেয়েছে। গল্পকার মন্ডন্তর, দাঙ্গা ও দেশভাগের ফলে ব্যক্তির মানসিক সংকট যেমন বর্ণনা করেছেন, সমান্তরালভাবে ব্যক্তির জীবনসংগ্রাম বা নতুন অভিজ্ঞতাকেও তুলে ধরেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র নিত্যানন্দ মুখার্জি, যাকে সবাই ডাকে নিতাইদা। নিতাই 'ছোট বেলায় কৃষ্ণ-যাত্রার দলে বৃন্দে সাজতো, বড় হয়ে গাঁয়ের যাত্রার দলে কমিক পাঠ করত' (জয়েনউদ্দীন, ২০১৫ : ৪৭৫)। নিতাই সব সময় হাসিমুখে থাকত। এ-গাঁয়ে, ও-গাঁয়ে যাত্রাদলে গান করে বেড়াত। ১৯৪২-৪৩ সালের মন্ডন্তরের সময় অনেক মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেল—লঙ্গরখানায় দুটো ভাত পাবে সে-আশায়। সে-সময় থেকে নিত্যানন্দের মুখ স্নান হতে শুরু করল। লঙ্গরখানায় গিয়েও মানুষ অভুক্ত থেকেছে, না-খেয়ে মরেছে। কারণ, সেখানে ব্যবসায়ী শ্রেণি ধনী হওয়ার লোভে কালোবাজারিতে ধানচাল বিক্রি করে দিয়েছে। এসব দেখে নিতাই-এর মন ভেঙে গেল। মন্ডন্তর শেষে দেখা গেল অনেক মানুষই গ্রামে ফিরে আসেনি। এদের কেউ মৃত্যুবরণ করেছে। কেউ-বা অন্য কোথাও চলে গেছে।

মন্ডন্তরের পর দেশে ফসল হল। কিন্তু, নিত্যানন্দের মন নুইয়ে পড়ল—হঠাৎ করেই সে যেন বুড়ো হয়ে গেল। মাত্র ৩৫ বছরেই তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। অবশ্য নিতাই-এর মেয়ে যোগমায়া তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার কারণ বুঝতে পারে—'কিসে যে তোমার মনটা ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, আর কেনই-বা তুমি এমন বুড়িয়ে গেলে, তা কি আমি জানি না, ভাবছো? আমি সব জানি বাবা' (জয়েনউদ্দীন, ২০১৫ : ৪৭৭)। ব্যক্তির হৃদয়, মনকে ইতিহাসের কালো ঘটনাবলি কীভাবে ক্ষতবিক্ষত করে, তাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেয় তা এখানে উপলব্ধি করা যায়।

১৯৪৫ সালে নিত্যানন্দ আবার মিন্নাত আলীকে নিয়ে গানে নামল। কিন্তু, এবারে নিতাই-এর গানের পাঠ ঠিকঠাক হল না। মানুষ বিরক্ত হয়ে, হাততালি দিয়ে তাকে বসিয়ে দিল। যদিও গানের শেষে দেখা গেল লোকজনের মুখে হাসি নেই। ৪৩'র দুর্ভিক্ষ তাদের হাসি কেড়ে নিয়েছে। মিন্নাত আলী ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সে নিতাইকে নতুন আশা দিল—‘আসছে বছরে ফের দেখা যাবে’ (জয়েনউদ্দীন, ২০১৫ : ৪৭৮)। এরপর ১৯৪৬-এর দাঙ্গা নিতাই-এর নুইয়ে পড়া মনে আবার চরম আঘাত দিল। তার হৃদয়ে ঘা আগেই ছিল, সেখানে এখন পচন ধরতে শুরু করল। ‘৪৬-এর দাঙ্গার পরিণাম হল ভয়াবহ :

যে হিন্দু-মুসলমান একেবারে আপনজনের মতো ঘর করেছে, তারা আজ কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। রাতারাতি হিন্দু পাড়া, মুসলমান পাড়া পৃথক হয়ে গেল। বিপদে পড়লে যাকে ডেকে বিপদ উদ্ধার হতো, আজ তাকে দেখলে সবচেয়ে বেশি বিপদ মনে হয়। [...] কোনদূরে কোলকাতা-ঢাকা দাঙ্গার বীজ বুনা হয়েছে, আর তারই ডালপালা সারা দেশময় কালসাপের মতো বিষ-নিঃস্রাব ছেড়ে বেড়াচ্ছে। (জয়েনউদ্দীন, ২০১৫ : ৪৭৮)

গল্পকার ১৯৪৬-এর দাঙ্গাকে চিহ্নিত করেছেন ‘মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের কারসাজি’ হিসেবে (জয়েনউদ্দীন, ২০১৫ : ৪৭৮)। এ বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে গল্পের অপর চরিত্র মিন্নাত আলীর কথায় :

[...] নিতাইদা, সুখ-শান্তি কথটা ভুলে যাও। মানুষ সব জঙ্গলের পশু হয়েছে, দেলে দয়া-মায়া নাই। দুই দিকের দুই দল কর্তা খেরু সোম আর কাজেম হাজী। এ বলে বন্দেমাতরম ও বলে আত্মাহ আকবর। এখন ঠেলা সামলাই আমি, তুমি—সব চাষাভুষা, গরিব মিসকিন। (জয়েনউদ্দীন, ২০১৫ : ৪৭৮)

অর্থাৎ, নেতাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বলির পাঠা হয়েছে সাধারণ মানুষ। খেরু সোম ও কাজেম হাজী—সেই সব সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতারই প্রতিনিধিত্ব করে। দেশভাগের পরে শান্তি-কমিটির উদ্যোগে মিটিং হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পূর্বকার সম্প্রতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু, এতে তেমন কোনও কাজ হয়নি। কারণ, ‘[...] প্রাণের বাঁধন যে আলাদা হয়ে গেছিল, তা আর ফিরে জোড়া বাঁধল না’ (জয়েনউদ্দীন, ২০১৫ : ৪৭৯)। ফলে, দেখা যায়, দেশভাগের আগের নিত্যানন্দ আর পরের নিত্যানন্দের মধ্যে বহু ফারাক—নিতাই-এর অস্তিত্বের মধ্যে যে নিত্য আনন্দের ধারা বইত এবং যা সে বিলিয়ে দিত সাধারণ মানুষের মাঝে, সে নিতাইকে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার ঘটনাবলি তথা মন্বন্তর, দাঙ্গা ও দেশভাগ কবর দিয়ে দিয়েছে। তাই, এখন যে নিতাই বেঁচে আছে ‘তা নিত্যানন্দের আসল অস্তিত্বের একটি মর্মাস্তিক বিদ্রূপ’ (জয়েনউদ্দীন, ২০১৫ : ৪৭৯)। গল্পকার আসলে দেখিয়েছেন, ‘নিত্যানন্দের এই মৃত্যু শারীরিক মৃত্যু নয়, তার প্রাণ-স্বতঃস্ফূর্ততার অবসান’। (আহমেদ, ২০২২ : ৪৬)

সরদার জয়েনউদ্দীনের ‘ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা’ গল্পে ইতিহাসের বাক্য পরিবর্তনে ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকটের বিষয়টি দারুণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র

নিতাই-এর মধ্য দিয়ে গল্পকার দেশভাগের ফলে ব্যক্তির অস্তিত্ব-সংকট তথা জীবনসংগ্রাম ও নতুন অভিজ্ঞতার বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। নিতাই চরিত্রে যে পরিবর্তন দেখা যায় তা নতুন অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করতে না-পারার জন্যেই। নিতাই পুরোনো স্মৃতিকে ভুলতে পারেনি, আবার নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গেও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। এ-জন্যে তার মধ্যে এক ধরনের শূন্যতা, হাহাকার তথা গভীর বেদনা লক্ষণীয়; যার ছাপ পড়েছে তার শরীরে ও মনে।

২.৩ সিকান্দার আবু জাফরের ‘ঘর’

সিকান্দার আবু জাফরের মূল পরিচয় কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে। তাছাড়া তিনি সঙ্গীত রচয়িতা, ছোটগল্পকার ও সাংবাদিক হিসেবেও খ্যাত। তিনি সম্পাদনা করেছেন *সমকাল* (১৯৫৭-১৯৭৫) নামক সাহিত্যপত্রিকা। দেশভাগের বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে সিকান্দার আবু জাফরের রচিত ছোটগল্প হচ্ছে ‘ঘর’। এ-গল্পে উদ্ভাস্ত জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটেছে। চরিত্রের স্মৃতিচারণও গল্পের অন্যতম দিক। এছাড়াও দেশভাগের নির্মম রাজনীতি ও তার পরিণতিতে সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব সংকট, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও মানবতাবোধও গল্পে লক্ষণীয়। ‘ঘর’ গল্পে দেখানো হয়েছে সাধারণ মানুষ কীভাবে দেশভাগের নির্মম রাজনীতির শিকার হয়েছে। এ-গল্পের চরিত্র প্রমীলা, যার নিজের একটা আশ্রয় ছিল, ঘর ছিল, সে সেটাও হারিয়েছে কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের (হিন্দু) কারণে। পাকিস্তানে হিন্দুরা থাকতে পারবে না—এই গুজবের ফলে প্রমীলা ও তার স্বামী নিজেদের ঘর, ফসলি জমি নামমাত্র দামে বিক্রি করে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য, তারা হিন্দুস্তানে চলে যাবে। কিন্তু, সবকিছু চুরি হওয়ায় তারা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। ওই সময়ে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল মুসা ও কুলসুমের পরিবার। গৃহকর্ত্রী কুলসুম প্রমীলাকে জিজ্ঞেস করে, কী করে তাদের এ-অবস্থা হয়েছে? জবাবে প্রমীলা বলে, ‘ঈশ্বরের বিধানে নয় দিদি। মানুষের বিধান আমাদের ঘর ভেঙে দিয়েছে। সপরিবারে আমাদের ভাসিয়ে দিয়েছে দুর্ভাগ্যের স্রোতে’ (সিকান্দার, ২০১৭ : ৪৫)। প্রমীলার বয়ানে উঠে এসেছে তার অতীত জীবনের স্মৃতিও—‘[...] ঘর একদিন আমারও ছিল দিদি। প্রতিবেশী ছিল, দশজন আত্মীয় ছিল। আমিও একদিন বিপন্ন লোককে তোমার মতো এমনি করেই আশ্রয় দিইছি। কিন্তু আজ আর কিছু নেই—কোনও আশা নেই। পরিচিত লোকেরা কে যে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে তারও কিছু সন্ধান রাখি না’ (সিকান্দার, ২০১৭ : ৪৪-৪৫)। প্রমীলার পরিবার এক রাত থেকেছিল মুসা সাহেবের বাড়িতে। পরের দিন কলেরা আক্রান্ত হয়ে প্রমীলা মারা যায়। মৃত্যুর আগে প্রমীলা প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট ভোগ করেছে। প্রমীলার মানসিক আঘাত তৈরি হয়েছিল আশ্রয়হীন (ঘর বা নিজের বসতভিটা হারানো) হওয়া থেকে। যে-কারণে বিকারগ্রস্ত হয়ে সে বলেছে—‘তোমাদের পায়ে পড়ি আমাদের ঘর ভেঙে দিও না।

আমার খোকা ঘুমুবে—নিশ্চিতে ঘুমুবে ওই ঘরে। ভেঙে না—ভেঙে না আমাদের ঘর’ (সিকান্দার, ২০১৭ : ৪৭)। মূলত, প্রমীলা গৃহহীন হওয়ার কারণেই মানসিক আঘাত পেয়েছে, সে-আঘাতই তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। নিজের ঘর তো নিজের অস্তিত্বেরই অংশ। তাই সে ঘর হারানোর স্মৃতি কখনোই ভুলতে পারেনি। মৃত্যু তাকে মুক্তি দিয়েছে। গল্পকার সিকান্দার আবু জাফর প্রমীলা চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা—দুটোরই প্রতিফলন দেখিয়েছেন। গৃহহীন হওয়ার পর প্রমীলাকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়েছে—আশ্রয় নিতে হয়েছে অন্যের বাড়িতে। দেশভাগের কারণেই তাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে, যে-অভিজ্ঞতার মুখোমুখি প্রমীলার পরিবার হয়েছে তা থেকে তারা আর বেরুতে পারেনি। অপরদিকে, মৃত্যুর আগে প্রমীলা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল, তবুও সে নিজের বসতভিটা তথা গৃহহীন হওয়ার স্মৃতি ভুলতে পারেনি।

২.৪ আবু রুশদের ‘হাড়’

আবু রুশদ গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। ব্যক্তির স্মৃতিতে, মনোচৈতন্যে দেশভাগ কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার পরিচয় রয়েছে আবু রুশদের ‘হাড়’ গল্পে। গল্পের কাহিনীতে দেখা যায়, ইফতিকার সাহেব রেলওয়ের সামান্য কেরানি ও মালগুদামের চাকরি শেষে অবসর নিয়েছেন। অবসরের ০৬ মাস পরেই কলকাতায় ফিরে তিনি একটা তিন তলা বাড়ি নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত বাড়ি নিয়ে প্রতিবেশীদের কৌতূহল ও গবেষণার শেষ নেই। কিন্তু, ইফতিকার সাহেব ও তার বেগম (স্ত্রী) সেসব আমলে নেননি। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময় ইফতিকার সাহেব এক জরুরি কাজে ঢাকা যান। সেখানেই তিনি প্রাণ হারান। পরিবার তার লাশ খুঁজে পায়নি। এ-দিকে তার খুন হওয়ার পরেও কলকাতায় বেগম সাহেবা বেশ সুখে-শান্তিতেই ছিলেন। তবে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় দেশভাগ। তাদের ‘তেতলা বিল্ডিং’ কোন ভাগে পড়বে তা নিয়ে বেগম সাহেবা বেশ চিন্তিত আছেন। তার ছেলে-মেয়েরাও অনিরাপদ বোধ করছে। তারপরও, বেগম সাহেবা ফ্ল্যাটের মায়া ছেড়ে ঢাকায় যেতে রাজি নন। বেগম সাহেবার ছেলের ভয় পাওয়ার যৌক্তিক কারণ রয়েছে; তারা কলকাতার দাঙ্গায় ২০ জন হিন্দুকে ঘায়েল করেছে (আবু রুশদ, ২০১৭)। অবশ্য, বেগম সাহেবার ছেলের ধারণা, ঢাকায় তাদের বাবাকে হিন্দুরাই খুন করেছে। তাই তাদের ২০ জনকে মারা তেমন কোনো পাপ হয়নি। এসব কারণে, মনে প্রবল দ্বিধা, ভয়, সংশয় নিয়ে বেগম সাহেবার পরিবার কলকাতা ত্যাগ করে।

ঢাকায় এসে বেগম সাহেবা কলকাতার ফ্ল্যাটের কথা ভুলতে পারেননি—কলকাতার ফ্ল্যাট তার প্রথম যৌবন আর ঢাকায় কেনা নতুন বাড়ি দ্বিতীয় যৌবন—যাকে তিনি ‘মেজেঘষে’ সুন্দর করে তুলতে চান (আবু রুশদ, ২০১৭)। বেগম সাহেবার ছেলের বউ অবশ্য এ-ব্যাপারটা নিয়ে তার শ্বাশুড়িকে সূক্ষ্মভাবে ব্যঙ্গও করে। নতুন বাড়ি ‘ঘষামাঝা’

হয়ে যাবার পরে মিলাদ পড়ানো হয়; ওই সময় বেগম সাহেবা বাড়ির সামনের পুকুরধারে কয়েকটা গাছের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তার মনে হয়, গাছগুলি যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে :

[...] বেগম সাহেবার অন্তর্জ্বালার তীব্রতা যখন একটু কমে তখন বাইরের দিকে তিনি চেয়ে দেখেন, পুকুরধারে কয়েকটা পরস্পরের বাহু-বন্ধ গাছপালা তাঁর দিকে অশ্লীল কটাক্ষ নিক্ষেপ করছে এবং নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করে যেন দুর্নিবার কৌতুকে হাসছে। সে-হাসি লক্ষ করে বা কল্পনা করে বেগম সাহেবার বুকে ছাঁত করে ওঠে। (আবু রুশদ, ২০১৭ : ৫৪)

পরের দিন ভোরবেলায় তিনি গাছগুলির ভেতর থেকে ‘এক টুকরো হাড়’ আবিষ্কার করেন। বেগম সাহেবার ছেলে জাফরের মনে হয়, এটা মানুষের হাড়। কিন্তু বেগম সাহেবা বাড়ি কেনার সময় জেনে নিয়েছিলেন এটা হিন্দুদের বাড়ি। সুতরাং, হাড় এসেছে কোথা থেকে?—এ-প্রশ্ন মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে বেগম সাহেবার মনোচৈতন্যে মৃত স্বামীর স্মৃতি ভেসে ওঠে। তার মনে হয়—‘[...] এ হাড় বোধ হয় তাঁর মৃত স্বামীরই দেহাবশেষ। খুন করে হয়তো এ বাড়িতেই তাঁকে এনে গোর দেওয়া হয়েছিল পাশাপাশি একসঙ্গে বেড়ে ওঠা মন্দ-স্বভাব গাছগুলির নীচে’। (আবু রুশদ, ২০১৭ : ৫৫) সেই সঙ্গে বেগম সাহেবার এ-আশঙ্কা জাগে যে, জাফরের বউ হয়তো জেনে গিয়েছে তার মনোচৈতন্যে ভয়ের কথা :

বেগম সাহেবার মনে হয় : মৃত স্বামীর কবর হয়ে বিরাজ করছে তাঁর এই এত সাধের বাড়ি, যে বাড়িকে যৌবনাঙ্কে তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। দুঃখিত প্রেমিকের মতো ভোরের আলোয় ঝকঝক করা এ বাড়ি তাঁর দিকে তাকিয়ে চুটল ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে অবিরত হেসেই চলেছে আর তাঁর সতীন হয়ে দাঁড়িয়ে বড় দুলহিন বিবি হাড়ের দিকে চেয়ে তাঁর মনের কথা জানতে পেরে নিস্তব্ধ অবজ্ঞায় চেয়ে আছে। (আবু রুশদ, ২০১৭ : ৫৫)

ঢাকার যে বাড়িটাকে তিনি দ্বিতীয় প্রেমিক মনে করেছিলেন; ভেবেছিলেন, তাকে ‘ঘেষেমেবে’ নতুন করে তুলবেন, সেই দ্বিতীয় প্রেমিকই তার স্বামী ইফতিকার সাহেবকে খুন করেছে। এ-জন্যেই বেগম সাহেবা তার বড় বউয়ের দিকে তাকাতে পারেন না।

মূলত, আবু রুশদের ‘হাড়’ গল্পে ব্যক্তির মনোচৈতন্যে দেশভাগের হিংসা ও রক্তাক্ত ঘটনাবলি কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে, কীভাবে অতীতের দুঃসহ স্মৃতিকে ব্যক্তি বর্তমানের যাপিত জীবনে বহন করে তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে গল্পের বেগম সাহেবা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। আর এটা গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়ও। ‘হাড়’ এখানে হিংসার প্রতীক, রক্তের প্রতীক। দ্বিতীয় বাড়িতে তাই বেগম সাহেবার পরিবার হিংসা আর রক্তের ওপরেই বাস করছে। গল্পে ‘হাড়’ নানামাত্রিক ব্যঞ্জনার তৈরি করে—এটি সম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের ভয়াবহতারও স্মারক-চিহ্ন।

২.৫ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’কে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ও প্রকরণশৈলী বিবেচনায় শিল্পসফল গল্প বলা যায়। চল্লিশের দশককে ক্ষতবিক্ষত করেছে

দেশভাগ। সে দেশভাগের বাস্তবতাকে নিয়ে লেখা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’ গল্পটি জায়গা করে নিয়েছে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গল্পের তালিকায়। (জাকির, ২০১২ : ২৪) কেবল উদ্বাস্ত জীবনের বাস্তবতা নয়, গল্পে শরণার্থীদের স্মৃতিও গল্পকার বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে নতুন দেশে তাদের আশ্রয় পাওয়া, আবার কিছুদিন পরে আশ্রয়চ্যুত হওয়া—দু-ধরনের অভিজ্ঞতাই তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ, শরণার্থীদের অতীত জীবনের স্মৃতি, নতুন দেশে এসে আশ্রয়ের জন্যে সংগ্রাম বা তাদের নতুন অভিজ্ঞতা গল্পকার গল্পের কাহিনিতে বর্ণনা করেছেন। এ-গল্পে দেশভাগ সংক্রান্ত অনেক প্রশ্ন প্রতীকী ব্যঙ্গনায় ব্যক্ত হয়েছে। গল্পের কাহিনি বিশ্লেষণে এ-সত্যের পরিচয় (প্রতীকী ব্যঙ্গনা) পাওয়া যায়। একটি দোতলা বাড়িতে এসেছে শরণার্থীর দল। দলের বেশিরভাগ এসেছে কলকাতা থেকে। সবাই মুসলমান। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের কারণে তারা পূর্ব পাকিস্তানে এসেছে। শরণার্থী দলের মধ্যে রয়েছে—মতিন (যার বাগান করার শখ), আমজাদ (তার ছকো টানার অভ্যাস আছে), কাদের (গল্পপ্রেমিক), অ্যাকাউন্টসের মোটা বদরুদ্দিন, রোগাপটকা ইউনুস, হাবিবুল্লাহ (বেসুরো গলায় হারমোনিয়াম বাজায়), মোদাক্বের (ছজুগে মানুষ), এনায়েত (মৌলবি ধরনের মানুষ), মকসুদ (দলের মধ্যে বামপন্থী বলে স্বীকৃত)। এরা সবাই বাস্তবচ্যুত। থাকার একটা ভালো জায়গা পেয়েছে বলে সবাই আনন্দে আত্মহারা। মোদাক্বের একদিন বাড়িতে একটা তুলসীগাছ আবিষ্কার করে। উঠানের প্রান্তে রান্নাঘরের পেছনে ইটের তৈরি একটি মঞ্চের ওপর ছিল তুলসীগাছটি। মোদাক্বের তুলসীগাছটি দেখামাত্র উচ্চ স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। বাড়ির সবাই উঠানে এসে হাজির হয়। তুলসীগাছটির দিকে তাকিয়ে মোদাক্বের হুংকার দেয়—‘উপরে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ-বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোনো হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না’। (ওয়ালীউল্লাহ, ২০১৫ : ৪৯০) কিন্তু, ইউনুস তুলসীগাছটি উপড়ে ফেলতে নিষেধ করে—‘থাক না ওটা। আমরা-তো তা পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে তুলসীগাছ থাকা ভালো। সর্দি-কফে তার পাতার রস বড়ই উপকারী’। (ওয়ালীউল্লাহ, ২০১৫ : ৪৯১) সবাই তার কথা মেনে নেয়। এমনকি মৌলবি ধরনের মানুষ এনায়েতও ইউনুসের কথা মেনে নেয়। ফলে, তুলসীগাছটি অক্ষত থেকে যায়। এক সময় সবাই এ-গাছটিকে উপলক্ষ্য করে সাম্প্রদায়িক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। মোদাক্বের দেশভাগের জন্যে হিন্দুদের দায়ী করে। অনেকে মোদাক্বেরের কথায় সমর্থন করে। কেবল মকসুদ প্রতিবাদ করে। কয়েকদিন পর দেখা যায়, তুলসীগাছটি সতেজ হয়ে উঠেছে, গাছের গোড়ায় জন্মানো আগাছাও নেই। বোঝা যায়, কেউ তুলসীগাছের যত্ন নিচ্ছে। মোদাক্বেরের এটা ভালো লাগে না। সে হাতে একটা কঞ্চি নিয়ে তুলসীগাছের ওপর চালিয়ে দেয়; তবুও তুলসীগাছটি অক্ষতই রয়ে যায়। মতিন এক সময় রেলওয়েতে কাজ করত। সে ভাবে, এ-বাড়িতে যে-মহিলাটি তুলসীগাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে এখন কোথায় আছে?

বাড়ির গৃহকর্ত্রীর কথা মনে করে মতিনের স্মৃতিতে অনেক রেলওয়ে স্টেশনের কথা স্মরণ হয়। মতিন ভাবে :

[...] হয়তো আসানসোল, বৈদ্যবাটি, লিলুয়া বা হাওড়ায় রেলওয়ে-পট্টিতে সে-মহিলা কোনো আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বিশাল ইয়ার্ডের পাশে রোদে শুকোতে-থাকা লাল পাড়ের একটি মসৃণ কালো শাড়ি সে যেন দেখতে পায়। হয়তো সে-শাড়িটি গৃহকর্ত্রীরই। কেমন বিষণ্ণভাবে সে-শাড়িটি দোলে স্বল্প হাওয়ায়। অথবা মহিলাটি কোনো চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে। তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। সে-দৃষ্টি খোঁজে কিছু দূরে, দিগন্তের ওপারে। হয়তো তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই। কিন্তু যেখানেই সে থাকুক এবং তার যাত্রা এখনো শেষ হয়েছে কি হয় নাই, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ-তুলসীতলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছলছল করে ওঠে। (ওয়ালীউল্লাহ, ২০১৫ : ৪৯১)

গল্পের পরের অংশে শরণার্থীদের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়—দু-তলা বাড়িতে উঠার কিছুদিনের মধ্যেই শরণার্থীদের আনন্দে ভাটা পড়ে; কারণ, মোদাক্বেবর খবর নিয়ে এসেছে তাদের সবাইকে বাড়ি ছাড়তে হবে। এরপরই দেখা যায়, বাড়ির সামনে পুলিশ এসে হাজির। পুলিশ দেখে ইউনুস ভাবে হয়তো এ-বাড়িতে তারা চোর ধরতে এসেছে। কিন্তু, তার ভাবনাটি নিজের কাছেই মিথ্যে বলে মনে হয়। পুলিশ অফিসার তাদের সবার উদ্দেশ্যে বলে, ‘আপনারা বে-আইনি ভাবে এ-বাড়িটা কজা করেছে’। (ওয়ালীউল্লাহ, ২০১৫ : ৪৯৩) মোদাক্বেবর পুলিশের কাছে জানতে চায় বাড়িওয়ালা নালিশ করেছে কিনা। তবে, ‘অ্যাকাউন্টস আপিসে’র মোটা বদরুদ্দিন পুলিশের মাঝে বাড়িওয়ালাকে খুঁজে পায়নি। পুলিশ অফিসার বলে, তাদের বাড়ি ছাড়তে হবে, কারণ—‘গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে’। (ওয়ালীউল্লাহ, ২০১৫ : ৪৯৩) মকসুদ অবশ্য নিজেদের গভর্নমেন্টের লোক বলে দাবি করে। মকসুদের কথা শুনে পুলিশ অফিসার ও দুই কনস্টেবল বিস্মিত হয়। তারা মকসুদের কথার উত্তর দেওয়া অপ্রয়োজনীয় মনে করে। প্রথমদিকে শরণার্থীর দল কিছুতেই বাড়ি না-ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে দশম দিনে তারা সদলবলে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় :

যেমনি ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতোই উধাও হয়ে যায়। শূন্য বাড়িতে তাদের সাময়িক বসবাসের চিহ্নস্বরূপ এখানে-সেখানে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে থাকে খবরের কাগজের ছেঁড়া পাতা, কাপড় ঝোলাবার একটা পুরোনো দড়ি, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, একটা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালি।

(ওয়ালীউল্লাহ, ২০১৫ : ৪৯৪)

গল্পে বর্ণিত ‘কাগজের ছেঁড়া পাতা’, ‘পুরনো দড়ি’, ‘বিড়ি-সিগারেটের টুকরো’ ও ‘একটা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালি’ মূলত বাস্তবচ্যুতদের জীবনকেই প্রতিকায়িত করে। গল্পে শরণার্থীদের জীবনাবিজ্ঞতা ও তাদের জীবনসংগ্রাম দারুণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শরণার্থীদের বুঝতে বাকি থাকে না যে তাদের ‘নতুন দেশ’ বলে কিছু নেই। গল্পের শেষাংশে প্রতীকী ব্যঙ্গনায় ব্যক্ত হয়েছে গল্পকারের জীবনবোধ :

উঠানের শেষে তুলসীগাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয় নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি। কেন পড়েনি সে-কথা তুলসীগাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা। (ওয়ালীউল্লাহ, ২০১৫ : ৪৯৪)

মূলত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’ গল্পে কলকাতা থেকে এদেশে (পূর্ববঙ্গ) আসা মুসলমানরা কীভাবে একটি হিন্দুর বাড়ি (যারা ১৯৪৭-এ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে গিয়েছে) দখল করে নিচ্ছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গে আসা এই মুসলমানদের তিনি বৃত্তিগত পরিচয়ও দিয়েছেন। (সন্দীপ, ২০২০ : ৫৯-৬০) তবে গল্পের ভেতরে উঠে এসেছে উন্মূলিত জীবনের স্মৃতি ও তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। ফলে, গল্পটি বহুমাত্রিক আবেদনও তৈরি করে।

২.৬ হাসান আজিজুল হকের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’

হাসান আজিজুল হকের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় এক বৃদ্ধ পিতার স্মৃতিকাতরতা ও জীবনসংগ্রাম। বৃদ্ধের অক্ষমতা, অসহায়ত্বকে বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পকার নতুন দেশে তার নির্মম জীবনাভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন। গল্পের বৃদ্ধ লোকটি অভাবের তাড়নায় নিজের আত্মজাকে (কন্যা) দেহ-ব্যবসায় নামিয়েছে। গল্পের তিন যুবক চরিত্র ফেকু, সুহাস ও ইনাম গভীর রাতে বৃদ্ধের বাড়ি মেয়ের (রুকু) সঙ্গে দেখা করতে (দুই টাকার বিনিময়ে) এসেছে। গল্পে বৃদ্ধ পিতার আত্মনাদে দেশভাগের একটা বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে—পৃথিবীর কোথাও বাস্তবচ্যুতদের সাদরে বরণ করা হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহণ করে। গল্পের বৃদ্ধ ও তার পরিবার ১৯৪৭ সালে ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে এসেছে। কিন্তু, পাকিস্তানে তাদের কেউ-ই ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। ফলে, পরিবারটি তীব্র আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে যায়। বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হয়েই বৃদ্ধ তার নিজের বাড়ি মেয়েকে (রুকু) দেহ-ব্যবসার মতো ঘণ্য কাজে নামিয়েছে। করবী গাছের বিচিত্রে ভালো বিষ হয়, সে বিষ খেলে মানুষ মারাও যেতে পারে। নিজের মেয়ের শরীরের বিনিময়ে বেঁচে থাকা বিষ পান করার মতোই—যে বিষ খেয়ে বৃদ্ধ ও তার পরিবারের অন্য সদস্যরা বেঁচে আছে। গল্পটির নামকরণেও দুটো বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বৃদ্ধ ইনাম, ফেকু ও সহাসের কাছে তার নিজের দেশের স্মৃতিচারণ করে—‘[...] ওসব তোমরা জানো। আমরা শুকনো দেশের লোক, বুইলে না? সব সেখানে অন্যরকম, ভাবধারাই আলাদা আমাদের’। (হাসান, ২০১৫ : ৫৩২) গল্পের শেষদিকে রুকুর কাছে গেছে ফেকু ও সুহাস; অন্যদিকে বৃদ্ধ তাঁর জীবনের ট্রাজিক কাহিনি বলছে ইনামকে (যে রুকুর সঙ্গলাভের জন্যে অপেক্ষারত!)। বৃদ্ধের বয়ানে উঠে আসে অতীত জীবনের স্মৃতি :

[...] এখানে যখন এলাম—আমি প্রথম একটা করবী গাছ লাগাই...তখন হু হু করে কে কঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলো, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠল নিটোল সোনারঙের দেহ—সুহাস হাসছে হি হি হি—আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে? বলে থামলো বুড়ো, কান্না গুলল, হাসি গুলল, ফুলের জন্যে নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ, করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিত্রে। আবার হু হু ফোঁপানি এলো আর এই কথা বলে গল্প শেষ না করতেই পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়ার মুখ—প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই বুঝেছ আর ইনাম ততো ততো—এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ?এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি? (হাসান, ২০১৫ : ৫৩৩)

গল্পটিতে ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে ‘উদ্বাস্ত জীবনের অর্থনৈতিক হাহাকার, জীবনযাপনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে অসমর্থ নিম্নবিত্তের বেকারত্ব, মনুষ্যত্ব বিক্রয়ে বাধ্য হওয়া প্রভৃতি বিষয়’। (সরিফা, ২০১০ : ১১২) গল্পের বৃদ্ধ ও তার পরিবারকে নতুন দেশে এসে দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে—তারা সম্রমের (রুফুর) বিনিময়ে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু, কন্যার সম্রমের বিনিময়ে অর্জিত অর্থকে করবী গাছের ফলের সঙ্গে তুলনা করা যায়; যা গ্রহণ করে তিক্তভাবে বেঁচে থাকা গেলেও বিকশিত হওয়া যায় না। (সরিফা, ২০১০ : ১১৬)

‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ গল্পে চরিত্রের দেশভাগের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কথা সমান্তরালে বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের দেশভাগের ছোটগল্পে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার রূপায়ণের ক্ষেত্রে হাসান আজিজুল হকের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ গল্পটিকে অন্যতম মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

২.৭ বুলবন ওসমানের ‘স্যামরক্স ও সহোদরা’

বুলবন ওসমানের ‘স্যামরক্স ও সহোদরা’ গল্পের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে ফ্লাশব্যাক পদ্ধতিতে। গল্পের কথক ফজল। গল্পের কাহিনিতে দেখা যায়, ছোটো বোন নফিসা তার বড় ভাই ফজলকে ‘স্যামরক্স গাছ’ ও ‘স্যামরক্সগুচ্ছ’ উপহার দিয়েছিল। একদিন বিকেলে নফিসার দেওয়া স্যামরক্স গাছ টবসহ উপরে পড়ে রয়েছে দেখে ফজল ব্যথিত হয়। তার মনে পড়ে ছোটো বোন নফিসার কথা, মায়ের কথা ও আরও অনেক কিছু—দেশভাগের সময় সময় ফজলের পরিবার ছিল পশ্চিমবঙ্গে, হুগলির সবলসিংহপুরে তাদের পৈতৃক ভিটে ছিল। ১৯৫০ সালের দ্বিতীয় দফা দাঙ্গার সময় ফজলের পরিবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে চট্টগ্রামে চলে আসে। ওই সময় নফিসার বয়স ছিল দেড় বছর। চট্টগ্রামে ফজলের পরিবার এক হিন্দু বাড়িওয়ালার বাড়িতে এসে ওঠে। দশ বছর পরে বাবার বদলির কারণে তাদের পরিবার ঢাকার রাজারবাগে আসে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ফজলের পরিবার ঢাকা ছেড়ে আগরতলায় চলে যায়। দেশ স্বাধীন হলে আবার তারা বাংলাদেশে ফিরে আসে। এক সময় নফিসার বিয়ে হয়। এখন সে চাকরি সূত্রে কানাডার টরেন্টোতে থাকে। মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে নফিসা দেশে এসেছিল। সে সময় নফিসা বড় ভাইয়ের জন্যে স্যামরক্স গাছের গাঁড় নিয়ে এসেছিল। ফজল ছোটো বোনের দেওয়া গাছের গাঁড় নিজ হাতে টবে লাগিয়েছে। কিছুদিন পরে (সাতদিনের মধ্যে) গাছে পাতা গজায়। মায়ের শরীরও ভালো হতে থাকে। নফিসা তখন কানাডা ফিরে যায়। ছয় মাসের মাথায় নফিসার মা ‘ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক’-এ মারা যায়। এবার আর নফিসা দেশে আসতে পারেনি। মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিছুদিন পর ফজল তার ভগ্নিপতি খন্দকারের ফোন মারফত জানতে পারে নফিসার ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার কথা। ক্যান্সার চতুর্থ ধাপে আছে, তাই বাঁচার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে; তাই হয়—নফিসা এক ছেলে, এক মেয়ে রেখে মারা যায়। এরপর দুই বছর কেটে গেছে। ফজল বিদেশে গিয়েছিল। দেশে ফিরে এসে দেখল, নফিসার সবুজ

স্যামরক্স গাছটা মারা গিয়েছে। হয়ত কাজের মেয়ে গাছে পানি দেয়নি। চকোলেট রঙের গাছটা মরেনি। সেটাকে ফজল রেখেছে মাথার কাছে, জানালার পাশে; সেই গাছটি উপড়ে পড়ে রয়েছে দেখে ফজলের খুব খারাপ লাগে। তার মনে পড়ে ভাগ্নি টম্পার কথা—‘মামা, মায়ের হাতের লাগানো গাছ খুব ভালো হয়। ফজল উত্তরে বলেছিল, তাহলে মামার হাতেও খুব একটা খারাপ হবে না।’ (বুলবন, ২০১৭ : ১৯৯) গল্পের ফ্ল্যাশব্যাক এখানে শেষ হয়।

গল্পের পরের অংশে দেখা যায়, ফজল উপড়ে পড়ে যাওয়া গাছগুলোকে আবার টবে বসিয়ে দেয়। কিছুদিন পরে সেগুলো আবারও জীবন্ত হয়ে ওঠে। সতেজ স্যামরক্সের গাছই যেন নফিসার প্রতিচ্ছবি—গাছে ফুল দেখে ফজলের মনে পড়ে ছোটো বোনের কথা। বড় ভাই ফজলের আশা—টরেন্টো শহরে যেতে পারলে ছোটো বোন নফিসার কবরের চারপাশে সে স্যামরক্সের গাছ লাগাবে :

শীতের গাছ বলে স্যামরক্স শীতকালে ভাল বাড়। ক’দিন বেশ শীত পড়েছে। আর স্যামরক্সের বাহার খুলছে। রোদ লেগে বাকমক। তার মনে একটা ভাব খেলা করে। আচ্ছা, ঈশ্বর কি মানুষের প্রার্থনা পূর্ণ করেন? যদি করেন, তার একটাই বাসনা, এই সম্ভরোর্থ বয়সে একবার যেন টরেন্টো শহরে যেতে পারে। তাহলে তার আশা পূর্ণ হয়। নফিসার কবরের চারপাশে স্যামরক্স দিয়ে সাজিয়ে দেবে। (বুলবন, ২০১৭ : ১৯৯)

বুলবন ওসমানের জন্ম হাওড়া জেলার ঝামটিয়া গ্রামে। পারিবারিক শিকড় হুগলির সবলসিংহপুর। ‘স্যামরক্স ও সহোদরা’ গল্পটিতে মূলত গল্পকার নিজের জীবনেরই স্মৃতিচারণ করেছেন। জীবন সায়াহ্নে লেখক তার শৈশবকে স্মরণ করেছেন, মনে করেছেন পৈতৃক ভিটের কথা। গল্পের মা, ছোটো বোন নফিসা, ছোটো ভাই হাবিব ও খলিল—এরা আর কেউ নয়; লেখকেরই আপনজন। এ-গল্পের এক জায়গায় লেখক ফজলের পারিবারিক যে-বৃত্তান্ত দিয়েছেন তা আসলে নিজের জীবনেরই শেকড়ের পরিচয় :

নফিসা ফজলের চেয়ে দশ বছরের ছোট। দেশভাগের আগে তার জীবনের দশটি বছর কেটেছে পশ্চিমবঙ্গে। হুগলির সবলসিংহপুর তার পৈতৃক ভিটা, এটা ছিল তার মথুরা, আর মামাবাড়ি হাওড়ার ঝামটিয়া ছিল ব্রজধাম। এই গ্রামে পর পর তারা চার ভাই ও বোন নফিসার জন্ম। আর একটা দৃশ্য সে এখনও ভুলতে পারে না, তৃতীয় ভাই হাবিবের জন্ম থেকে এই দৃশ্যের অবতারণা। [...] শুনেছ ফজল, তোমার আর এক ভাই হয়েছে। আমাদের খুব আনন্দ। খেলোয়াড়ের সংখ্যা বাড়ছে। একই দৃশ্য ঘটে চতুর্থ ভাই খলিলের জন্মের সময়। [...] সবশেষে তারা চার ভাই বাকুলে খেলেছে। দেশ তখন দু’বছর হল ভাগ হয়ে গেছে। তারা তখনও মামাবাড়িতে। বাবার কর্মস্থল চট্টগ্রাম যায়নি। মামি হালিমা খাতুন, তাদের জানাল, ফজল, তোমাদের এবার এক বোন হয়েছে। মামির মুখটা যেন বেশি উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল ফজলের। তারাও খেলা ছেড়ে ছুটল আঁতুড়ঘরের দিকে। তবে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হল না। শুধু নানি গোলাপজান এক মুখ হাসি নিয়ে কোলে করে একটি গোলাপকুঁড়ি এনে দেখালেন। পরদিন থেকে চার ভাইয়ের দায়িত্ব ছিল একজন করে দু’মিনিট পালাক্রমে নফিসাকে কোলে নিয়ে বসে থাকা। কী আনন্দ, কী আনন্দ... আমাদের সহোদরা এসে গেছে। সীমাহীন ছিল সে-আনন্দ। (বুলবন, ২০১৭ : ১৯১)

মূলত, ‘স্যামরক্স ও সহোদরা’ গল্পে লেখক বুলবন ওসমানের জীবনের স্মৃতিরই রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। দেশভাগের অনেক বছর পরেও গল্পকার ভুলতে পারেননি তার শৈশবকে। ভুলতে পারেননি আদরের ছোটো বোন নফিসাকে—যে এখনও তার স্মৃতিসভায় মিশে আছে।

২.৮ মাহমুদুল হকের ‘মুহূর্ত নায়িকা’

‘দেশভাগ’ মানববেদনার ইতিহাসকে করেছে ভারী। দেশভাগের ফলে যেসব পরিবার দেশ ছেড়েছে, তাদের অনেকেই নতুন দেশে গিয়ে থিতু হতে পারেনি। নিজেদেরকে তারা মনে করেছে বিদেশি, ওপারের মানুষ। নতুন দেশের সঙ্গে তাই তাদের নাড়ির সম্পর্ক তৈরি হয়নি। এই যে সংকট তৈরি হল, তার পরিণাম হল ভয়াবহ—অনেকের পরিবার ভেঙে গিয়েছে, হারিয়েছে ছেলে-মেয়ে। প্রিয়জন হারানোর বেদনা ও নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে তারা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। মাহমুদুল হকের ‘মুহূর্ত নায়িকা’ গল্পের মধ্যে সেই বাস্তবতার রূপায়ণ ঘটেছে। মাহমুদুল হক নিজেও একজন দেশত্যাগী মানুষ। নিজের শেকড়চ্যুতির যন্ত্রণা তিনি ব্যক্তিজীবনে উপলব্ধি করেছেন। এ-গল্পের মধ্যে ব্যক্তিজীবনের সে-উপলব্ধির প্রতিফলন রয়েছে।

‘মুহূর্ত নায়িকা’ গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় দুটো—দেশভাগের ফলে ব্যক্তির অস্তিত্ব-সংকট, নতুন দেশে মানিয়ে নিতে না-পারা এবং তার ফলে ব্যক্তির জীবনে নতুন অভিজ্ঞতার রূপায়ণ। গল্পকার ‘রানিমামি’র জীবনের কথা বলতে গিয়ে তুলে এনেছেন বিজলীবুবুর জীবনের ট্রাজেডি, বলেছেন অকালে ঝরে যাওয়া ইব্রাহিম ভাইয়ের কথাও। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের কারণে রাজামামা ও রানিমামির পরিবার ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছে। তারা এসে ঢাকার শাখারিবাজারের কাছে যে-বাড়িটিতে ওঠে তার নাম ‘গোলাপজান’। গল্পকার ‘গোলাপজান’ নামের বাড়িটির ইতিহাস তুলে ধরেন—প্রেমের জন্যে গোলাপজান নামের এক নারী আত্মহুতি দিয়েছিল, তখন থেকেই বাড়িটির নাম হয় ‘গোলাপজান’।

রানিমামির কড়া শাসনে তার বড়ো সন্তান ইব্রাহিম (ইব্রাহিম ভাইয়া), মেজো মেয়ে বিজলী (বিজলীবুবু), সবার ছোটো দুই মেয়ে লুসি ও টুসি সব সময় ভয়ে থাকে; এমনি রানিমামির স্বামী রাজামামাও তাকে সমীহ করে। বিজলীবুবু পুরো সংসারের দায়িত্ব নিয়েছে। সবার সেবা করতে গিয়ে সে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করেছে, তার নিজের বিয়ের বয়সও পার হয়ে যাচ্ছে। তারপরও তার মা (রানিমামি) অখুশি। রানিমামি অহেতুক বিজলীবুবুর কাজে ভুল ধরেন, এরপর গায়ে পড়ে মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেন। তাদের দুজনের ঝগড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে; এ তাদের নিত্য দিনের রুটিন। বিজলীবুবুর অবস্থা এমন যে রানিমামির কোনো কথায় উত্তর দিলেও দোষ, না-দিলেও দোষ! এ-দিকে তার বয়স ৩০ পার হয়ে গেছে। এ-নিয়ে প্রতিবেশীরাও কথা শোনায। সবমিলিয়ে বিজলীবুবুর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। রাজামামা এ-দেশের ‘বাঙাল’

ছেলেদের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিবেন না। সে-কারণে তিনি ইব্রাহিম ভাইয়ার বন্ধু মুজতবার বিয়ের প্রস্তাবকে নাকচ করে দেন। তাদের ঘরের লজিং মাস্টার (এলাহি মাস্টার) বিজলীবুবুকে পছন্দ করে। একবার কারো মারফত বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন; কিন্তু, একই সমস্যা—এলাহি মাস্টার ‘বাঙাল’ দেশের ছেলে বলে বিয়ে দেবেন না। এদিকে বিজলীবুবুর জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল—বাড়িতে তাকে স্নেহের চোখে দেখত ইব্রাহিম ভাইয়া; মায়ের মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না-পেরে সেও বাড়ি ছেড়ে মেসে চলে যায় কিছুদিন পর সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ইব্রাহিম ভাইয়ার মৃত্যু বিজলীবুবুকে আশ্রয়হীন করে দেয়। তবুও বিজলীবুবু বাঁচতে চেয়েছিল—যেদিন রানিমামি তাকে চুল ধরে মারল, বিজলীবুবু কোনো বাধা দেয়নি। সেদিন রাতে ভেজা শরীরে, খোলা চুলে বিজলীবুবু এলাহি মাস্টারের ঘরে গিয়েছিল। সে জানিয়েছিল বেঁচে থাকার আকুতি—‘পারবে আমাকে নিয়ে এই রাতে, এক্ষুনি পালিয়ে যেতে?’ (মাহমুদুল, ২০১৭ : ১৮৪)। বেঁচে থাকার তাগিদে, বিজলীবুবু সে-রাতে হয়ে উঠেছিল ‘মুহূর্ত নায়িকা’। কিন্তু, এলাহি মাস্টার বিজলীবুবুর আবেদনে সাড়া দেয়নি—যে-বাড়িতে সে এতদিন ধরে আশ্রিত, সে-বাড়ির অসম্মান সে করতে পারবে না। কারণ, তার দৃষ্টিতে এটা ছিল কৃতঘ্নতা। এলাহি মাস্টার বিজলীবুবুর হৃদয়ের আকুতি শোনেনি, লোকসমাজের নিয়ম তথা সংস্কার তাকে বেঁধে ফেলেছিল। এলাহি মাস্টারের প্রত্যাখ্যানে বিজলীবুবু বলেছে—‘যাদের কাছে মানুষের প্রাণের, মানুষের আবেদনের তার একান্ত নির্ভরশীল বিশ্বাসের কোনও মূল্য নেই খোদা তাদের ক্ষমা করুন।’ (মাহমুদুল, ২০১৭ : ১৮৫) বিজলীবুবু সবার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছে—সে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে তার দেহ।

ইব্রাহিম ভাইয়া ও বিজলীবুবুকে হারিয়ে রানিমামির এ-উপলব্ধি হয়েছে যে, তার জন্যে সংসার ছারখার হয়ে গিয়েছে। তিনি তার দুঃখের বৃত্তান্ত কথককে বলছেন। সন্তান হারানো একজন মায়ের হৃদয়ের আকুতি তার কথায় ফুটে উঠেছে—‘নিজের মেয়েকে খেলাম, ঘর-সংসার সবই খেলাম, আমি আবার মা’। (মাহমুদুল, ২০১৭ : ১৮৮) মেয়ের এমন মৃত্যুর জন্য তিনি তার স্বামীকেও দায়ী করেছেন—বিজলীকে তিনি অত্যাচার করেছেন বটে, কিন্তু তার স্বামী কেন মেয়ের পক্ষ নিল না? কেন এ-দেশের (পূর্ব পাকিস্তান) কোনো ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারল না? তার কণ্ঠে আক্ষেপ বারে পড়ে :

[...] এত লোক পাত্র পাচ্ছে আর তুমি পেলো না! কেন এ দেশের ছেলেরা বুঝি মানুষ নয়? তারা অফিস-আদালত করছে না? আমার সোনার সংসার ছারখার করে দিল তোর মামা। আচ্ছা তুই-ই বল, মা তো চিরদিন মেয়েদের বকাবকি করে, আর তাদের বাবারা নেয় মেয়েদের পক্ষ। কোনও দিন বিজলীর হয়ে তোর রাজামামা একটা কথা বলে থাকে! ও বাপ নয়, রাক্ষস। আমার সোনার প্রতিমা মেয়েকে খুন করল ওই বাহাদুরে বুড়ো। (মাহমুদুল, ২০১৭ : ১৮৮)

অনেক কথা বলার পর রানিমামি তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে কথককে বলেছে, ‘দেখিস তুই আবার তোর রাজামামার সম্বন্ধে এ সব কথা কাউকে বলিসনে। তোকে ছেলের মতো মনে করি তাই বললাম।’ (মাহমুদুল, ২০১৭ : ১৮৮)

মাহমুদুল হকের কথাসাহিত্যে (বিশেষভাবে, উপন্যাসে) ‘স্মৃতি’ একটা উপাদান হিসেবে উঠে আসে। এই ‘স্মৃতি’ কেবল অতীতে নিয়ে নয়, সেটা অনেকক্ষেত্রে সময়কেও ছাড়িয়ে যায়। ‘স্মৃতি’র পাশাপাশি ‘শৈশবের নির্মল সারল্য’ও তাঁর কথাসাহিত্যে লক্ষ করা যায়। (অরুণ, ২০১০) ‘মুহূর্ত নায়িকা’ গল্পের মধ্যেও কথকের ‘সারল্য’ লক্ষণীয়। ‘মুহূর্ত নায়িকা’ গল্পে ইব্রাহিম ভাইয়ার অকাল মৃত্যু ও বিজলীবুর্বুর আত্মহত্যা—এসবের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী তাদের মা (রানিমামি)। কিন্তু, গল্পটি গভীরভাবে পাঠ করলে বোঝা যায়, পুরো পরিবারের ট্র্যাজিক পরিণতির নিমিত্তে কাজ করেছে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ। দেশভাগের কারণেই পরিবারটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢাকায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। তাই, দীর্ঘদিন এক জায়গায় বসবাসের ফলে নতুন দেশের নতুন স্থানে এসে তারা থিতু হতে পারেনি। এ দেশের (‘বাঙাল দেশ’) মানুষদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাসও করতে পারেনি। এ-কারণেই মেয়ের (বিজলীবুর্বু) বিয়ের জন্যে তারা ‘ওপারের ছেলে’ (পশ্চিমবঙ্গ) খুঁজেছেন। দেশভাগের ফলে একটা পরিবার নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে থিতু হতে না-পেরে কীভাবে তাদের সাজানো সংসার তছনছ হয়ে গিয়েছে তার আখ্যান হচ্ছে এ-গল্প। মানুষ তার পুরোনো সংস্কার, পুরোনো স্মৃতিকে ভুলতে পারে না—এ-গল্পের রাজামামা ও রানিমামিও পারেনি। এ-জন্যেই তারা নতুন অভিজ্ঞতাকে ভালোভাবে নিতে পারেনি। ফলে, তাদের জীবন হয়ে উঠেছে ট্র্যাজিক।

২.৯ হরিপদ দত্তের ‘নরকযাত্রা’

হরিপদ দত্তের ‘নরকযাত্রা’ গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসহায়ত্ব ও দেশত্যাগের নির্মম অভিজ্ঞতা। একটা সংখ্যালঘু পরিবারের মানসিক পীড়নভোগ এবং বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করার প্রসঙ্গ গল্পের কাহিনিতে উঠে এসেছে। দেশত্যাগের আগে গল্পের চরিত্ররা পুরোনো স্মৃতিকে মনে করেছে। গল্পের কাহিনিতে আছে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৫ বছরের কথা। ১৯৪৭ সালে দেশত্যাগ (পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গ) করে বনমালীর পরিবার। দেশত্যাগের অব্যবহিত পরে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে বনমালীর পরিবার দেখল তাদের বাড়ির অর্ধেকটা দখল হয়ে গেছে। বাড়ির বাকি অর্ধেকটাও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরা ‘শত্রু সম্পত্তি’ আইনে দখল করতে চায়। গল্পের বনমালী ও তার পুত্র ধীমান তাদের সঙ্গে পেরে উঠতে না-পেরে একেবারে দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়।

হরিপদ দত্তের ‘নরকযাত্রা’ গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, বনমালী তার ছেলে ধীমানকে দেশ ছাড়তে নিষেধ করছে; কারণ, বনমালী নিজ দেশেই মরতে চান। কিন্তু, ধীমানের দেশ ছাড়ার কারণ বোঝা যায় তার স্ত্রী অদিতিকে যখন সে বলে, ‘[...] সমাজটা যদি সুস্থ থাকত তবে তোমাকে আমাকে কেন দেশ ছাড়তে হয় বলো?’ (হরিপদ, ২০১৭ :

২১৩) ধীমানের এক বোন আছে। নাম পুতুলি। পুতুলি পালিয়ে বিয়ে করেছে আরিফ নামের এক মুসলমান ছেলেকে। ধীমানের পরিবার লজ্জায় পুতুলিকে জানাতে পারছে না যে, তারা কলকাতায় চলে যাচ্ছে। ধীমান-অদিতির কথোপকথনে পরিষ্কার হতে থাকে তাদের দেশ ছাড়ার কারণ। বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় এ-দেশে মন্দিরের ওপর আক্রমণ হয়েছে, তখনও লজ্জা পেয়েছে ধীমান। অদিতি ধীমানকে বলে, ভারতের হিন্দুরা কেন বাবরি মসজিদ ভাঙতে গেল, ওরা কেন বাংলাদেশের হিন্দুদের কথা চিন্তা করল না? জবাবে ধীমান বলেছে, ‘ওরা চায় বাংলাদেশে রায়ট হোক। ওদের ভয় ওয়েস্ট বেঙ্গলকে নিয়ে, ওদের পলিটিক্স বড় জটিল’। (হরিপদ, ২০১৭ : ২১৩) ধীমানের মতে, সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হচ্ছে, বাংলাদেশের মুসলমানেরা মনে করে হিন্দুদের দেশ ভারত, আর হিন্দুরাও ভারতকে তাদের শেষ আশ্রয় মনে করে— ‘অদিতি, দুঃখ কী জানো, এ দেশের শিক্ষিত মুসলমানেরাও মনে করে আমাদের দেশ ইণ্ডিয়া, হিন্দুরাও মনে প্রাণে ভাবতে শিখেছে তাদের শেষ আশ্রয় ভারত।’ (হরিপদ, ২০১৭ : ২১৪) ধীমানের কথায় উঠে এসেছে তার বাবার জীবনসংগ্রামের কথা, দীর্ঘ সময় মানসিক পীড়নভোগের কথা; তবুও তিনি এ-দেশে ‘শান্তি আর নিরাপত্তা’ পাননি। সংখ্যাগুরু কৃষ্টি, সংস্কৃতি সংখ্যালঘুর কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করে। ভারত ও বাংলাদেশ—উভয় দেশেই তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ধীমান-অদিতির কথায় সেসব প্রসঙ্গও এসেছে। এরপর গল্পকার দেশভাগের সময় মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর সম্পত্তি দখল করার প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন। সেখানে উঠে আসে গল্পের মূল প্রেক্ষাপট :

ওই উঠোন আর পাঁচিল হচ্ছে কালের ইতিহাস। দেশ ভাগের দাঙ্গায় ধীমানের জ্যাঠামশাই চলে যান কলকাতা। বাড়ির অর্ধেকটা দখল করে নেয় সেকান্দর আলি নিরানবাই বছরের লিজ নিয়ে। উঠোন আর বারান্দা বরাবর উঠে যায় পাঁচিল। এক সময় দেখা যায় পুরোটা বাড়িই ঘোষিত হয় শত্রু সম্পত্তি হিসেবে। গুরু হয় কোর্ট আদালত আরও কত কী? পঁয়তাল্লিশ বছর বছর বনমালী কেবল কোর্টে ছুটেছে, উকিলের ছেলে উকিল হয়েও সুরাহা করতে পারেনি তার মোকদ্দমা। পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রতীক্ষা গোপনে প্রতিশোধের তীব্র দহনে বিষাক্ত একটা কেউটেতে পরিণত হয় যা টেরও পায়নি বনমালী। আদতে তা ছিল বিষাক্ত কেউটের নিষ্পন্দ মৃত খোলস মাত্র। (হরিপদ, ২০১৭ : ২১৫, ২১৬)

বনমালী তার বড় ভাইয়ের সম্পত্তি যে গ্রাস করেছিল তার শত্রুর কাছে (আলি মোহম্মদ) বাড়ি বিক্রি করে। সেকান্দর আলিই বনমালীর বৈধ সম্পত্তি গ্রাস করার উদ্দেশ্যে ‘শত্রু সম্পত্তি’র মামলা করেছিল। তাছাড়া, বনমালী ৪৫ বছর মামলা পরিচালনা করে বুঝে গিয়েছিলেন—‘এনিমি প্রপার্টির মামলা হচ্ছে ঈশ্বরের মতোই অমর এবং অমীমাংসিত সত্তা’ (হরিপদ, ২০১৭ : ২১৬)। এ-কারণেই বনমালী অল্প দামে বাড়িটি আলি মোহম্মদের নিকট বিক্রি করে দেয়। দেশ ছাড়ার আগে ধীমানের মনে অবিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে। সে কাউকে না-জানিয়েই দেশ ছাড়তে চায়। ধীমান বুঝতে পারে না—এমনটা সে কেন ভাবছে। গল্পকার ধীমানের মনোজগত তুলে ধরেন, বর্ণনা করেন তার স্মৃতির জগতকে :

তার স্মৃতিতে মরা মাছের মতো ভেসে ওঠে কবে কাকে ‘মালাউন’ বলে গাল দিয়েছিল, কবে কে কোথায় বিদ্রূপ করেছিল সন্ধ্যাপূজার উলুধ্বনিকে, কবে কোন রাস্তায় কে ধুতিপরা বুড়োটাকে ‘জ্যাঠা’ বলে ঠাট্টা ছুড়ে দিয়েছিল। আবার এক সময় ধীমানের মনে হয়, ও সব যারা করেছে ওরা সবাই তো বালক। ওটা ছিল তাদের আনন্দ। মোটেই বিদ্রূপ নয়। এই বালকেরা তো আলখাল্লা আর টুপি-পরা বুড়াদেরও ঠাট্টা করে। তবে এর অর্থ কী? আদতে এর অর্থ কোনও কালেই ধীমান খুঁজে পাবে না। বুড়ো পিতা একবার ধীমানকে বলেছিল, তাদের গাঁয়ের কোনও এক আত্মীয় নাকি ঘরে বাতি জ্বালিয়ে রেখে এমনি করে পালিয়ে চলে গিয়েছিল। পড়শিরা সকালবেলা বাড়িতে নতুন মুসলমান আগন্তুকদের দেখে আনন্দের বদলে পলাতক বিধবীদের জন্য কেঁদেই ফেলে। হাজার বছরের প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের প্রতিবেশী এমনি করে পালাল? এক মুহূর্তের জন্যও কেন তারা বুঝতে পারেনি ওরা যে পালাবে? যদি পারত তবে তো যাবার বেলা জিজ্ঞেস করতে পারত, ‘ও বলাই, ও ছিদামের বাপ, কই যাবি, কেন যাবি? যেখানেই যাস পারবি মওত ফিরাতে? পাবি শান্তি?’ (হরিপদ, ২০১৭ : ২১৬-২১৭)

বনমালী আরও কয়েকটা দিন নিজের বাড়িতে থাকতে চায়। কারণ, তার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে স্ত্রীর কথা—‘খোকা, কটা মাস বাদে গেলেই কি নয়? ক’দিন বাকি পূজার, নবমী পূজার রাতে তোর মা মরেছিল, শেষ বারের মতো...।’ (হরিপদ, ২০১৭ : ২১৭) সকালবেলায় আলি মোহম্মদ বনমালীর বাড়িতে আসে। আলি মোহম্মদ নির্বিঘ্নে বনমালীর পরিবারকে কলকাতা পৌঁছে দিতে চায়। তবে তার মূল উদ্দেশ্য সেকান্দার আলির নিকট থেকে ‘শত্রু সম্পত্তি’ উদ্ধার করা। আলি মোহম্মদ দুই হাজার টাকা বনমালীর হাতে গুঁজে দেয় এবং বলে, ‘ধরেন দাদা, দোয়া করেন কেইচে যেন জিতা যাই, আমি নিজে গিয়া আপনারে কলিকাতা থেকে নিয়া আসব, কয়টা দিন বেড়াইয়া যাইবেন’। (হরিপদ, ২০১৭ : ২১৮) বনমালীর মনে পড়ে, বাড়ি বিক্রির ৩৮ হাজার টাকা বাকি; সে বলে, ‘দুই হাজার কেন? বাকি টাকা কই?’ (হরিপদ, ২০১৭ : ২১৮) তারপর বনমালী আটত্রিশ হাজার টাকার কথা ভুলে যায়। এদিকে আলি মোহম্মদের লোকেরা বনমালীর পরিবারকে এগিয়ে দিতে ব্যাগ, সুটকেস টেনে নিয়ে যায়। আর বনমালীর মনে পড়ে তুলসী বেদির কথা :

বনমালী পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া নোনা ধরা ইটের তুলসী বেদির পাশে হাঁটু ভেঙে বসে ছ ছ কান্নায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এই তো সেই তুলসী বেদি যাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে দিত তার স্ত্রী, তার মা আর ছেলের বউ। তখন তুলসীতলায় পুরনো শহরের পুরনো গলির পুরনো অন্ধকার। যে প্রদীপ শেষ বারের মতো জ্বালিয়ে দিয়েছিল অদিতি, সে-ই কখন তা নিভে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে তুলসী গাছটা অস্পষ্ট। পুরনো সুরকি ইট আর তুলসী গাছের গোড়ার পুরনো ভেজা মাটির গন্ধ বুড়ো টেনে নেয় বুক ভরে। (হরিপদ, ২০১৭ : ২১৮)

লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, গল্পকার উল্লিখিত অনুচ্ছেদে ‘পুরনো’ শব্দটা বারবার ব্যবহার করেছেন। নিজের বসতভিটার ওপর নিজের আর অধিকার নেই, তখন তো পুরোনোই! আর ‘ভেজা মাটির গন্ধ টেনে নেওয়া’ এক অর্থে নিজের অস্তিত্বকে পুনরায় উপলব্ধি করা। বনমালীর জীবনে সবকিছু এখন অতীত (‘পুরনো’) হয়ে গেছে। সামনে পড়ে আছে কেবলই দীর্ঘশ্বাস। তবুও বনমালী অতীত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, স্মৃতিকাতরতা তাকে ঘিরে ধরে; তার মনে পড়ে বাবার কপালের পবিত্র হাড়ের কথা :

হঠাৎ বনমালীর মনে পড়ে পিতার কপালের সেই পবিত্র অস্থির কথা। এই বেদির মাটির তলায়ই লুকিয়ে রয়েছে অস্থিটা। শ্মশান থেকে তুলে এনে গঙ্গায় বিসর্জনের অপেক্ষায় সেই হাড়ের খণ্ডটা বনমালী এখানেই পুঁতে রেখেছিল। ভেবেছিল সুযোগ পেলেই তা তুলে নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আসবে। বুড়ো কম্পমান হাতের দশটা আঙুল দিয়ে তুলসী বেদির মাটি খামচে ধরে, আঁচড়ায়, গভীরে আরও গভীরে একেবারে বেদির শেষ স্তরে। নেই, কোথাও নেই সেই হাড়। বুড়োর স্বরে ভয়ানক শব্দ, ‘খোকা, খোকা তোর দাদুর সেই অস্থি?’ (হরিপদ, ২০১৭ : ২১৮-২১৯)

বাড়ি ছাড়ার আগে বনমালী একমাত্র কন্যা পুতুলিকে খোঁজে, সবাই যাচ্ছে তার কন্যা যাবে না? তখন অদिति বলে, ‘কী বলছেন বাবা! পুতুলি কেন যাবে? পুতুলি তো মুসলমান’। (হরিপদ, ২০১৭ : ২১৯) বনমালীর আবার পুরোনো ক্ষত, পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে। সে তার আত্মজাকে ক্ষমা করে। যাবার সময় নাতি (ধীমানের ছেলে) বনমালীকে জিজ্ঞেস করে, ‘দাদু আমরা কোথায় যাচ্ছি?’ (হরিপদ, ২০১৭ : ২১৯) বনমালী কোনো জবাব দেয় না। তার হৃদয় ভেঙে গেছে। বিড়বিড় করে সে ধীমানকে বলে, ‘পাঁজিতে দিনক্ষণ ভাল, যাত্রা শুভ। কিন্তু আমার যাত্রার শেষ কোথায়? অ খোকা, তুই আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?’ (হরিপদ, ২০১৭ : ২২০) আসলে, দেশ ছেড়ে যেখানে ধীমানের পরিবার যাচ্ছে সেখানেও আলো নেই (ভবিষ্যত নেই)। তাই তাদের যাত্রা নরকের দিকে—‘পাঁচিল-ঘেরা গলি পথটা তখন অন্ধকার। বুড়ো হাঁটছে, নরকের অখণ্ড রাস্তায় পা রেখে হাঁটছে। ঈশ্বর নেই কোথাও, যমদূতের অট্টহাসি। বুড়োর দু’পা সামনেই নরকের অগ্নিকুণ্ড’। (হরিপদ, ২০১৭ : ২২০) যেখানে জন্ম হয়েছে, সেটা যদি স্বর্গ না-হয়, তবে আর স্বর্গ কোথায় পাওয়া যাবে? শান্তিই-বা কোথায় মিলবে? এসব জেনেও মানুষকে তার জন্মভূমি, দেশ ত্যাগ করতে হয়। কেন করতে হয় তার উত্তর গল্পের ভেতরেই আছে—সংখ্যালঘুদের কি আসলে দেশ আছে? গল্পকার স্পষ্টতাই ইঙ্গিত করেছেন, দেশের আইন-কানুনও সংখ্যালঘুদের পক্ষে নয়। এ-জন্মে আদালতে ৪৫ বছরেও ‘এনিমি প্রোপার্টি’র মামলার নিষ্পত্তি হয় না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও সংখ্যালঘুরা কেন দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তার কারণও এ-গল্পে উপলব্ধি করা যায়। দেশ স্বাধীন হলেও সংখ্যালঘুরা কি সত্যিই স্বাধীনতা পেয়েছে?—গল্পকার হরিপদ দত্ত এমন প্রশ্ন পরোক্ষভাবে গল্পের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

২.১০ সেলিনা হোসেনের ‘শেষ ভিটার আঁচড়’

দেশভাগের কারণে অনেক মানুষ হারিয়েছে তার বসতভিটা, নিজ দেশে হয়েছে পরবাসী। নতুন দেশে গিয়ে আশ্রয়হীন হয়েছে। এই উন্মূলিত জীবনের যন্ত্রণা নিয়ে অনেক ছোটগল্পকার গল্প লিখেছেন। সেলিনা হোসেনের ‘শেষ ভিটার আঁচড়’ গল্পটিতেও বাস্তব জীবনের নির্মম বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আসলাম গণি। দেশভাগের সময় বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যেতে হয় আসলাম গণির পরিবারকে। গোবরা মিয়ার বাড়িতে এসে আসলাম গণি উপলব্ধি করে, আগের মতো আর কিছুই নেই—নতুন জায়গায় সে একজন আগন্তুক মাত্র। পুরোনো ভিটা, পুরোনো স্মৃতি তার সত্তার সবটুকু; দেশ বলতেও তাই। নতুন জায়গার মানুষও

তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। নিজ বাসভূমি থেকে আশ্রয়চ্যুত হওয়ার কারণে তার জীবন এলোমেলো হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে অভিবাসীদের কেউ সাদরে গ্রহণ করে না, জীবনের সঙ্গে তাই তাকে আপস করতে হয় :

[...] আসলাম গণির নিজের দিনগুলোতে জোড়াতালি দিতে হয়। কাজ খোঁজে। দু'চার টাকা তো উপার্জন করতে হবে। কিন্তু দিনমজুরির কাজ তো করতে পারবে না। ছেলেমেয়েদের পড়াতে চায়, কিন্তু তাও হয় না। তার বদমেজাজের জন্য কেউ তার কাছে ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠাতে চায় না। উল্টো মুখ বাঁকায়। বলে, রিফুজি বেটা।

এখানে আসার আগে গাঁয়ের লোকেরা বলত মাস্টারসাহেব। কেউ বলত স্লামলাইকুম স্যার। কেউ বলত, আদাব স্যার। এখন এই গাঁয়ের মানুষের কাছে ও একজন শরণার্থী। ভাবতেই আসলাম গণির দাঁত কিড়মিড় করে। বুকের ভেতরে প্রবল যন্ত্রণা তড়পায়। (সেলিনা, ২০১৭ : ২২৬-২২৭)

দেশত্যাগের ফলে, উদ্ভাস্ত হওয়ার কারণে পূর্বের মাস্টার আসলাম গণি এখন হয়েছে মুদি দোকানদার। সৌম্যকান্তিভাবের আসলাম গণি এখন হয়েছে বদমেজাজি। আসলাম গণির বদমেজাজের কারণেই তার ছেলে জব্বার আত্মহত্যা করেছে। জব্বারের আত্মহত্যা প্রতীকী—দেশভাগের কারণে অনেক মানুষের আত্মিক ও মানসিক মৃত্যু হয়েছে যা শারীরিক মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। আসলাম গণি শত কষ্টের মধ্যেও ‘শেষ ভিটার আঁচড়’ টুকু ভুলতে পারে না। গল্পকার সেলিনা হোসেন ‘শেষ ভিটার আঁচড়’ গল্পের মধ্যে কেবল উন্মূলিত হওয়ার যন্ত্রণা নয়, ব্যক্তির (আসলাম গণি) মনোচৈতন্যে দেশভাগের প্রভাবকেও তুলে ধরেছেন।

২.১১ পূর্ববী বসুর ‘স্থলপদ্ম ও ভীমনাগের সন্দেশ’

পূর্ববী বসুর ‘স্থলপদ্ম ও ভীমনাগের সন্দেশ’ গল্পটির মূল উপজীব্য বিষয় দেশভাগোত্তর স্মৃতিকাতরতা। তবে, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পরিচয়ও গল্পে রয়েছে। দেশভাগের সময় যতীন ঘোষ তার বিশাল বাড়িটি বশির সাহেবের কাছে বিক্রি করে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। অনেক বছর পরে, যতীন ঘোষের ছোট ছেলে মলয় তার স্ত্রী-সন্তানসহ পিতৃভূমিতে এসেছে। মলয় তার বন্ধু সামাদের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেনি, তার নিজের ইচ্ছা ছিল সন্তানদের শেকড়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার—সে-জন্যেই সে পরিবারসহ চলে এসেছে। বশির সাহেব তাদেরকে কীভাবে গ্রহণ করে তা নিয়ে মলয়ের মনে শঙ্কা ছিল। তবে, মলয়ের আশঙ্কা অমূলক বলে প্রমাণিত হয়। বশির সাহেব আন্তরিকতার সঙ্গে মলয় ও তার পরিবারকে গ্রহণ করেন। বশির সাহেবের বর্তমান বাড়িতেই বেড়ে ওঠেছে মলয়। তার শৈশব কেটেছে এই গ্রামে। বশির সাহেবের সঙ্গে আলাপের সময় মলয়ের পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে। তার মনে হয়, পৈতৃক ভিটেতে আসতে পেরে সে নিজের অস্তিত্বকেই অনুভব করতে পেরেছে। গল্পকার মলয়ের পুরোনো দিনের স্মৃতি ও অস্তিত্বের অনুভবকে তুলে ধরেন :

‘এ বাড়িতে—এই ঘরেই আমার জন্ম। যদিও চার ভিটায় তখন চারখানা ঘর ছিল। এই ঘরের সামনে একটা আতা গাছ ছিল। বাড়ির পিছনে ছিল একটা ডেউয়া গাছ। এত বিরাট বিরাট ওদ্রা খোদ্রা ডেউয়া হত গাছটির পাতায় পাতায়।’ বলে দুই হাত ফাঁক করে ডেউয়ার বিশাল আকার

বাঝাবার চেষ্টা করে মলয়। এ ছাড়া, অনেকদিন পর ‘ওদ্রাখোদ্রা’র মতো একটি বিক্রমপুরী শব্দ ব্যবহার করতে পেরেও বেশ ভাল লাগছে তার। ‘কিন্তু এত টক ছিল ডেউয়াগুলো যে কাক ছাড়া ওগুলো কেউ মুখে দিতে পারত না।’ বলে নিজে নিজেই হাসে মলয়। মুখের ভেতর যেন এখনও ডেউয়ার সেই টক টক, আঠা আঠা, রোয়া রোয়া স্বাদ লেগে আছে। (পূরবী, ২০১৭ : ২৭৬)

মলয় কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া ‘ভীমনাগের সন্দেশ’ বশির সাহেবকে উপহার দেয়। বশির সাহেবের একমাত্র ছেলে বাশার আগন্তুক পরিবারটিকে বড় দুটি স্থলপদ্ম দিয়ে স্বাগত জানায়। বাকপ্রতিবন্ধী বাশারের কাছ থেকে এমন উপহার পেয়ে বীণা (মলয়ের স্ত্রী) ও মৌটুসি (মলয়ের মেয়ে) খুব খুশি হয়। বীণা তখন স্থলপদ্মের স্মৃতিচারণ করে :

বীণা জানে, শুনেছে স্বামীর কাছে, বাড়ির পিছন দিকটাতে তার শাশুড়ির লাগানো স্থলপদ্ম গাছে অনেক বড় বড় পদ্ম হত এক সময়। দুর্গাপুজোয়, লক্ষ্মীপুজোয় বারোয়ারি পুজোমণ্ডপে এই বাড়ির পদ্ম-ই যেত সব সময়। তাদের কলকাতার বাসার দেওয়ালে এখনও টাঙানো রয়েছে, বড় বড় সেই পদ্মপাতার পাশে চেয়ারে উপবিষ্ট তার শাশুড়ির একখানা সাদা-কালো ছবি। কেবল বিশাল বিশাল পাতাই ছিল তখন পদ্মবাগানে, ফুল ফোটার মৌসম ছিল না তখন। কে জানে, বীণার শাশুড়ির সেই পদ্ম গাছগুলোরই কাচাবাচ্চা থেকে এই পদ্মের জন্ম কিনা, নাকি আজকের পদ্মগুলোও সরাসরি এসেছে সেই বুড়ো পদ্মগাছগুলো থেকেই? (পূরবী, ২০১৭ : ২৭৭)

পূরবী বসুর ‘স্থলপদ্ম ও ভীমনাগের সন্দেশ’ গল্পের উল্লেখযোগ্য আরও একটি দিক হল হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি। গল্পের শেষে দেখা যায়, বাশারের মা (বশির সাহেবের স্ত্রী) আগন্তুক মলয়ের পরিবারে সবাইকে দুপুরের খাবারের জন্যে ডাকছে :

[...] অতিথিদের জন্যে তাড়াহুড়া করে রাঁধা মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে সকলকে আবার ঘরের ভেতর আহ্বান করে বাশারের মা। দূরে দাঁড়ানো স্বামীকে হাত দিয়ে এ দিকে আসার ইশারা করে বীণা তার ছেলেমেয়ে-সহ বাশারদের ঘরে ঢোকে। (পূরবী, ২০১৭ : ২৭৮)

দেশভাগকে উপজীব্য করে লেখা গল্পে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বিষয়টি খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। দেশভাগের গল্পে সাধারণত দেখা যায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সংকট তথা সাম্প্রদায়িক মনোভাব। এদিক দিয়ে এ-গল্পটিকে ব্যতিক্রম বলা যায়। গল্পকার পূরবী বসু ‘স্থলপদ্ম ও ভীমনাগের সন্দেশ’ গল্পে মূলত মলয় ও বীণা চরিত্রদ্বয়ের মাধ্যমে স্মৃতিকাতরতা প্রকাশ করেছেন। মানুষ তার শেকড়ের কথা ভুলতে পারে না — ‘স্থলপদ্ম ও ভীমনাগের সন্দেশ’ গল্পে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

২.১২ জাফর তালুকদারের ‘পিতৃভূমি’

মানুষ তার জন্মভূমি (পিতৃভূমি) ছেড়ে যতই দূরে চলে যাক, এর টান সে কখনও অগ্রাহ্য করতে পারে না। কারণ, ব্যক্তির স্মৃতির অনেকটা দখল করে থাকে তার শৈশব, তার বেড়ে উঠার স্মৃতিসমূহ — জাফর তালুকদারের ‘পিতৃভূমি’ গল্পের মহিনের ক্ষেত্রেও এমনটাই দেখা যায়। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময় ঢাকা ছেড়ে কলকাতা চলে গিয়েছিল মহিনের পরিবার। ওই সময় মহিন ছিল যুবক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক পরে মহিন বাংলাদেশে এসেছে মেয়ে (হিমি), মেয়ের জামাই (হিরেণ) ও অন্যদের নিয়ে। বাংলাদেশ মহিনের পিতৃভূমি। নাড়ির টানেই সে বাংলাদেশে এসেছে। হিরেণকে সঙ্গে নিয়ে মহিন ঢাকা শহরের নানান জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছে। হিরেণের কাছে গল্প করেছে

তার শৈশবের, বলেছে বাংলাদেশের ইতিহাসও। মহিন নিজের জন্মের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছে :

হিরেণ, ওই যে ঘরটা দেখছ, ওখানেই জন্ম হয়েছিল আমার। ডানদিকে নীলচে আলো আসছে যে ঘরটা থেকে ওটা ছিল শোবার ঘর। তড়িঘড়ি চলে যাবার সময় দেওয়ালে গ্রুপ ফোটোটো পর্যন্ত খুলে নেওয়া হয়নি। পরে, মা অনেক আফসোস করেছেন ফোটোটোর জন্য। (জাফর, ২০১৫ : ১৭৬)

মহিনের শৈশবের স্মৃতিকে গল্পে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গল্পকার মহিনের পুরোনো স্মৃতির যে বয়ান দিয়েছেন তা মাহমুদুল হকের *কালো বরফ* (১৯৯২) উপন্যাসের ‘পোকা’ চরিত্রটিকে মনে করিয়ে দেয়। মহিনের স্মৃতিকাতরতার দৃষ্টান্ত পেশ করা যাক :

তারও একটা সাপঘুড়ি ছিল সেই বয়সে। বুনু দিয়েছিল। সাপের মতো পৈঁচিয়ে ঘুড়িটা উড়ে যেত আকাশে। তার হাতে লাটাই ঘুরত বনবন করে। কেমন যেন একটা উদ্বেজনা পেয়ে বসত তখন। মনে হত সেও যেন উড়ে চলেছে ঘুড়ির পিঠে চড়ে। তার পায়ের নীচে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে লালবাগ দুর্গ, আহসান মঞ্জিল, বড়-কাটরা, বুড়িগঙ্গা...। কিন্তু তাদের বাড়িটা কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কদম গাছ গাছটাও বা গেল কোথায়? তার হাতে দ্রুত টান পড়ে। লাটাই থেমে যায়। আকাশের মাঝে সেই টুকটুকে বিন্দুটা আর দেখা যায় না। এক ধরনের কষ্টে তখন বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসত। সে সব কতদিন আগের কথা। অথচ সে দিনের ছোট্ট কষ্টটুকু এখনই যেন ফুডুত করে উড়ে এল বুকের ভেতর। (জাফর, ২০১৫ : ১৭৭)

মহিনের স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে তার বন্ধু শরিফ সাহেব ও আবু, শৈশবের স্কুল শিক্ষক অনন্ত স্যার, অর্চনা ও তার পাগলাটে দাদার কথা। অনন্ত স্যারকে একান্তরে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। মহিন ১৯৭১ সালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগতড়িত হয়ে যায়। মহিন হিরেণকে লালবাগ ফোর্ট, বুড়িগঙ্গা নদী, চাকেশ্বরী মন্দির প্রভৃতি দেখিয়েছে। মহিন তার স্মৃতির ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে খুঁজে বেড়িয়েছে তার শৈশবকে—পুরোনো স্মৃতির মধ্যে সে ডুবে গিয়েছে, হয়েছে আবেগতড়িত। এ-দেশ মহিন ছেড়ে গিয়েছে বহু আগে, তবু বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের প্রতি তার টান কমেনি। শহিদ মিনার দর্শন করে সে বাংলা ভাষার প্রতি দরদকে অনুভব করেছে। গর্বিত স্বরে মহিন হিরণকে বলেছে—‘বাংলা ভাষা আর বাংলাদেশকে বুঝতে হলে এখানে অন্তত একবার আসা দরকার।’ (জাফর, ২০১৫ : ১৮৩)

২.১৩ সাদ কামালীর ‘দেহত্যাগের পর যে দিন বগুড়ায় এলেন শৈলেশ্বর ঘোষ’

সাদ কামালীর ‘দেহত্যাগের পর যে দিন বগুড়ায় এলেন শৈলেশ্বর ঘোষ’ গল্পটি ‘হাংরি আন্দোলনের’ প্রেক্ষাপটে লিখেছেন। তবে গল্পে পরোক্ষভাবে দেশভাগ ও দেশত্যাগের স্মৃতির বয়ানও আছে। গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত হয়েছে। গল্পের কথক লেখক নিজেই। ‘হাংরি আন্দোলনের’ অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন শৈলেশ্বর ঘোষ। লেখকের (কথক) মনে হয়েছিল—শৈলেশ্বর ঘোষকে পাওয়া যাবে তাঁর জন্মস্থান

বগুড়াতে। লেখক সেখানেই গিয়েছেন। শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে লেখকের দেখা হল। নানান বিষয় (দেশভাগ, শৈলেশ্বর ঘোষের বগুড়া ত্যাগ করা ও ‘হাংরি আন্দোলন’) নিয়ে অনেক কথা হল। ‘হাংরি জেনারেশন’ বা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বেশিরভাগ লেখকের জন্ম বাংলাদেশে। দেশভাগের কারণে (সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্যে) তাদেরকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। গল্পকার শৈলেশ্বর ঘোষ ছাড়াও এ-আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় অনেক লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন—বাসুদেব দাশগুপ্ত (ফরিদপুর), অবনী ধর (ফরিদপুর), প্রদীপ চৌধুরী (কুমিল্লা), সুবো আচার্য (ফরিদপুর), সুভাষ ঘোষ (ফরিদপুর), সুভাষ কুণ্ডু (ঢাকা), বিজন রায় (কুমিল্লা), সমীরণ ঘোষ (ময়মনসিংহ), সুনিতা ঘোষ (ঢাকা) প্রমুখ লেখকেরা সবাই বাংলাদেশের। দেশভাগের পর এঁরা কলকাতায় চলে গিয়েছেন (সাদ, ২০১৭)। গল্পকার শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে আলাপের সূত্রে জানতে পারেন—দেশভাগের সময় তিনি বগুড়া ছেড়ে চলে গেলেও এ-শহরের স্মৃতি এখনও তার মনে জীবন্ত হয়ে আছে। শৈলেশ্বর ঘোষের কাছে দেশ হচ্ছে মায়ের মতো। মায়ের মুখ যেমন স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা যায় না, তেমনি দেশের স্মৃতিও কখনও ভোলা যায় না :

করতোয়া নদীর পারে আমাদের বাড়ি ছিল, রায়পুর গ্রাম। সেখানে আমার জন্ম হয়। বাড়ির কাছে বিরাট অরণ্যও ছিল জানো। জ্বালানির জন্য কারও সঙ্গে খড়ি কুড়াতে ওই অরণ্যে যাওয়ার সুযোগ হত। করতোয়া নদী, জঙ্গল, রায়পুর, বগুড়া শহর, ছেলেবেলার সঙ্গী গাছপালা পাখি সব আমার মনে আছে, মনে পড়ছে আরও কত কিছু। আমার স্মৃতিতে সে দিনের হবিগুলির আর কোনও পরিবর্তন হয়নি। তো শহরের দালানবাড়ি, অনেক গাড়ি, রাস্তা, দোকানপাটের চেহারার বদল হলেও আমার স্মৃতিতে তার বদল হয়নি কিন্তু, আজ আমি ওই স্মৃতির জনপদই দেখতে এসেছি, দেখছি। মায়ের মুখ কারও স্মৃতিপট থেকে মুছে যায় না। (সাদ, ২০১৭ : ৩৫৭-৩৫৮)

আলাপের শেষে কথক চায়ের বিল দিতে গেলেন; ফিরে এসে দেখেন, শৈলেশ্বর ঘোষ নেই। পরে জানা গেল—শৈলেশ্বর ঘোষ দেহত্যাগ করেছেন। কথকের মনে প্রশ্ন জাগে—তাহলে কি শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে বগুড়ায় সাক্ষাতের বিষয়টি অতিবাস্তব ব্যাপার ছিল? সাদ কামালীর ‘দেহত্যাগের পর যে দিন বগুড়ায় এলেন শৈলেশ্বর ঘোষ’ গল্পে চরিত্রের স্মৃতিচারণকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গল্পের নামকরণেও বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

২.১৪ সালাম আজাদের ‘সীমান্ত’

‘সীমান্ত’ গল্পের শুরুতে সালাম আজাদ পরিচয় করিয়ে দেন স্কুল শিক্ষক পবিত্র সাহার সঙ্গে। পবিত্র সাহার পরিবারের সামাজিক বন্ধনের টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করেই গল্পের ঘটনার বিস্তার লাভ করে। গল্পের কাহিনিতে দেখা যায়, সাতচল্লিশের দেশভাগের পর পবিত্র বাবুর শ্বশুর সপরিবারে করিমগঞ্জে চলে গেছেন। কাঁটাতারের ওপার থেকে গতকাল পবিত্র বাবুর টেলিগ্রাম এসেছে। চিঠি-বাহকের সাত বছরের মেয়েটি কলোয় মারা যাওয়ার কারণে চিঠি পৌঁছাতে বিলম্ব হয়। চিঠির বাহক পবিত্র সাহার কাছে পত্র

নিয়ে এসে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে; সে তার মেয়ের মৃত্যুর ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলে :

মেয়েটি নাকি পানি খেতে চেয়েছিলো। কিন্তু কলেরা রোগীকে তো পানি দেওয়া যায় না। ডাক্তারের বারণ। মেয়েটির মাথায় পানি ডালা হচ্ছিলো। সেখানে হাত বাড়িয়ে পানি খেতে চেয়েছিলো। তার হাত দুটি চৌকির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছিলো। যাতে সে পানি স্পর্শ করতে না পারে। (সালাম, ২০১৫ : ৪৮২)

সাত বছরের কন্যার মৃত্যুকালেও এক ফোটা পানি জোটেনি—এই করুণ মৃত্যুর কাহিনি শুনে পবিত্রবাবু বার্তা বাহককে সান্ত্বনা দেন। এদিকে পবিত্রবাবুর শ্বশুর নিজের মেয়েকে শেষবারের মতো দেখতে চেয়ে করিমগঞ্জ থেকে চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু দেশভাগের বিভেদ রেখার কারণে ভিসা-পাসপোর্ট ছাড়া পার হওয়ার কোনো উপায় নেই—‘কেন যে দেশভাগ, বোর্ডারের প্রহরা। এক মাকে দুই-টুকরা করে কী লাভ হলো। তা ভেবে পায় না পবিত্র সাহা’। (সালাম, ২০১৫ : ৪৮৩) পদ্মানদীর তীর ঘেষে ভাগ্যকুল বাজার। এখনো সিটির শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে বাবার কথা মনে পড়ে নীলিমার; কারণ, বাবাই তাকে প্রথম স্টিমার দেখিয়েছিল। বাবার মাথাটা নিজের কোলে রাখার জন্যে নীলিমার হৃদয় হাহাকার করে ওঠে। সীমান্তে কড়া পাহারার জন্যে কোনোভাবেই করিমগঞ্জ যেতে না-পেরে নীলিমার বুকের ভিতরে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসে। সীমান্তের অমানবিক বাঁধার কাছে অসহায় হয়ে নীলিমা সিদ্ধান্ত নেয়—লাল শাড়ি পড়ে নদীর এপারে দাঁড়াবে, তার অসুস্থ বাবাকে যেন নদীর ওই পাড়ে আনা হয়। নীলিমা দূর থেকে বাবাকে দেখে আবেগাপ্ত হয়ে যায়—‘[...] হায় রাজনীতি, হায় ধর্ম, হায় দেশভাগ। হায় এই সীমান্ত। বলতে বলতে সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না। চোখ ফেটে প্রবল বেগে কান্না বেরিয়ে এলো’ (সালাম, ২০১৫ : ৪৮৫)। কুশিয়ারা নদীর ওই পাড়ে দাঁড়ানো অসুস্থ বাবাকে নীলিমা জীবনের শেষ দেখা দেখছে নদীর ওই পাড় থেকে। দেশভাগের রাজনীতির শিকার অসহায় মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেছে নীলিমা ও পবিত্র সরকারের পরিবার। গল্পের শুরুতে বার্তা বাহকের কন্যার মৃত্যুকালে পানি না-পেয়ে মৃত্যুর নির্মমতার সঙ্গে নীলিমার বাবাকে দেখতে না-পারার বিষম বেদনার তুলনা করা যায়। বার্তাবাহকের কন্যার বাঁধা হাতের মতোই সীমান্তের কাটাটারের বেষ্টনী নীলিমা অতিক্রম করতে পারেনি। সীমান্তের বেষ্টনীর কাছে মানুষের হৃদয়ের সকল আর্তি স্তান হয়ে যায়—‘এপারের দুটি অসহায় মানুষের চোখের জল, বুকের ভিতরের অব্যক্ত কষ্ট সবই ঢাকা পড়ে যাচ্ছিলো সীমান্তের বেষ্টনীতে’। (সালাম, ২০১৫ : ৪৮৫) ভৌগোলিকভাবে দেশভাগ হলেও মানব সম্পর্কের কোনো ভাগ হয়নি। দেশভাগের কারণে মানব মনের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের টানাপোড়েন ও অভিজ্ঞতার চিত্র ‘সীমান্ত’ গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে।

২.১৫ প্রশান্ত মৃধার ‘সোনার গোপাল’

তুলসীতলার মাটি নিতে এসেছে আশিস; আর গোপাল জোড়া নিয়ে এসেছে ললিত। দুজনই ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছে। এ-প্রেক্ষাপট থেকে গল্পকার প্রশান্ত মৃধা ‘সোনার গোপাল’ গল্পের কাহিনি নির্মাণ করেছেন। গল্পের চরিত্ররা পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করেছে, হয়ে উঠেছে আবেগতড়িত। পাশাপাশি গল্পে দেশভাগোত্তর অভিজ্ঞতার কথাও উঠে এসেছে। গল্পের কাহিনিতে দেখা যায়, কমলার ছোট ভাই আশিস ভারত (কলকাতা) থেকে এসেছে পৈতৃক ভিটে থেকে তুলসীতলার মাটি নিতে। ভারতে আশিসের পরিবার একটা বাড়ি করেছে। নতুন বাড়িতে তারা একটা তুলসীতলা বানাবে—এ-জন্যে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) রেখে যাওয়া পুরোনো তুলসীতলা থেকে মাটি নিতে এসেছে। পুরোনো তুলসীতলার মাটি নতুন তুলসীতলায় দিবে। মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার টান মানুষ সহজে ভুলতে পারে না। সে-জন্যেই এতদিন পরে আশিস বাংলাদেশে এসেছে পৈতৃক ভিটের (তুলসীতলা) মাটি নিতে। অনুভার কাছ থেকে লীনা এসব কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়। সে বিশ্বাস করতে পারে না অন্যদেশ থেকে কেবল মাটি নেওয়ার জন্যে কেউ এদেশে এসেছে! তখন অনুভা লীনাকে বলে :

‘আসে না। কত জন গেল, কত মানুষ। কত জনের সঙ্গে পড়িচি, আইজ কত জন নেই—দেশ ছাইড়ে চাইলে গেইচে। আমার ভাইবোন অর্ধেক ওই দেশে অর্ধেক এই দেশে—এ রকম কত জনের আছে—তার পর আমার মা মরল ওই দেশে—ভাগ্য ভাল তহোন ভাইবির বিয়ের জন্যি ভিসে কইরে রাহিলাম দেখতি তাই পারিচি। কত মানুষ খালি খবর পায়, কিন্তু চোখের দেহাও দেখতি পারে না।’ (প্রশান্ত, ২০১৭ : ৪৩৯)

অন্যদিকে, অনুভার আপন ছোটোভাই ললিত এসেছে তার জেঠিমার গোপাল জোড়া ও গোপালের কাপড়-বালিশ নিয়ে। গোপাল জোড়া দেখে অনুভার তার মায়ের কথা মনে পড়ে; সে স্মৃতিকাতর ও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে :

[...] অনুভা গোপালটা বের করে গালে চেপে ধরল, ‘মায়ের হাতের তা—গোপাল—কত দিন না খাইয়ে আছে জানে কেডা—স্নান করাইচে নাকি—ভোগ দেছে—মায়ের গোপাল!’ একটা গোপালকে খাটে রেখে পরেরটা বের করার জন্য হাত দিল। অনুভার চোখে জল। সেটা বের করেও গালে চেপে ধরে, ‘আহারে কী রং হইচে, মাজেও নাই—মায়ের সোনার গোপাল—’ (প্রশান্ত, ২০১৭ : ৪৪৮)

প্রশান্ত মৃধার ‘সোনার গোপাল’ গল্পে অনুভা চরিত্রের স্মৃতিকাতরতাই মুখ্য হয়ে ওঠেছে। অনুভার অনেক স্বজন ভারতে চলে যাওয়ার পরও সে খণ্ডিত অস্তিত্ব নিয়ে কীভাবে বাংলাদেশে বাস করছে গল্পে তারও বর্ণনা পাওয়া যায়।

উপসংহার

বাংলাদেশের ছোটোগল্পে দেশভাগের ‘স্মৃতি’র রূপায়ণে গল্পকারগণ গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তির মনোচৈতন্যকে—ব্যক্তি কীভাবে দেশভাগের ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং সে-সব ঘটনা তার স্মৃতিতে কীভাবে লালন করেছে সেটাই মূল উপজীব্য বিষয়। অবশ্য

দেশভাগের ‘স্মৃতি’ ও ‘অভিজ্ঞতা’কে গুরুত্ব দেওয়ার যৌক্তিক কারণও রয়েছে। প্রথমত, দেশভাগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে ধারণ করা সম্ভব নয়, সে-জন্যে লেখকেরা দেশভাগের টুকরো স্মৃতি, টুকরো অভিজ্ঞতাকে গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, দেশভাগের ঘটনাবলির মধ্যে রয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটের মতো বিষয়াবলি। দেশভাগের বাস্তবতা নিয়ে লিখলে পাছে ‘সাম্প্রদায়িকতা’ প্রশ্ন পেয়ে যায়, এই ভয়েই যেন একটা সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য শিটিয়ে ছিল। বাংলা সাহিত্যে তাই অনেক কথাই অকথিত থেকে গেছে। (অশ্রুফুমার, ২০২১ : ২০৮) বাংলাদেশের ছোটগল্প লেখকেরাও দেশভাগের বিষয় নিয়ে লিখতে কম আগ্রহী হয়েছেন। কারণ, তাঁদেরও ‘সাম্প্রদায়িক তকমা’ লেগে যাওয়ার ভয় ছিল। ফলে, বাংলাদেশের ছোটগল্প লেখকেরা দেশভাগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নিয়ে কম গল্প লিখেছেন; তাঁরা দেশভাগের ‘স্মৃতি’ ও ‘অভিজ্ঞতা’র ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের যেসব ছোটগল্প লেখকের দেশভাগের অভিজ্ঞতা আছে (যেমন—হাসান আজিজুল হক, মাহমুদুল হক, কায়স আহমেদ প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যায়), তাঁরা নিজের জীবনেরই ‘স্মৃতি’ ও ‘অভিজ্ঞতা’র বিবরণ লিখেছেন। তাঁদের রচিত গল্প এক অর্থে নিজেদের ‘স্মৃতিকথা’ হয়ে ওঠেছে। যাহোক, বাংলাদেশের ছোটগল্পে দেশভাগের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার রূপায়ণ কীভাবে হয়েছে তার বিশ্লেষণ ও আলোচনার শেষান্তে বেশকিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়।

প্রথমত, দেশভাগের ‘স্মৃতি’ দু-ধরনের—লেখকের স্মৃতি ও লেখকের বয়ানে গল্পের চরিত্রের স্মৃতি। দেশভাগের ‘অভিজ্ঞতা’র ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। বাংলাদেশের যেসব ছোটগল্পকার দেশভাগের কারণে ভারত (কলকাতা) থেকে এসেছেন তাঁদের গল্পে যে বয়ান আছে তা মূলত নিজেদেরই স্মৃতিকাতরতার প্রকাশমাত্র; আবার নতুন দেশে এসে তাদেরকে নানান অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে, গল্পে সে-সব নতুন অভিজ্ঞতার প্রতিফলনও দেখা যায়। যে সব লেখকের দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, তারা দেশভাগ নিয়ে যে-সব গল্প লিখেছেন তাতে চরিত্রের ‘স্মৃতি’ ও ‘অভিজ্ঞতা’র বয়ানই প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ, তারা গল্পের উপাদান নিয়েছেন ইতিহাসের রক্তক্ষয়ী ঘটনা থেকে—তারা দেশভাগের করুণ ইতিহাস পড়েছেন, দেশভাগের কারণে যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনেছেন। সেসব অভিজ্ঞতার কথাই তাঁরা গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের চরিত্রের স্মৃতিকাতরতার সঙ্গে অনেকক্ষেে লেখক একাত্ম হয়ে গেছেন। এ-ক্ষেে গল্পের চরিত্রের ‘স্মৃতি’ই গল্পকারের স্মৃতি। বিশেষ করে যেসব গল্প উত্তম পুরুষে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোতে লেখকের ‘স্মৃতি’ই গল্পের চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—মাহমুদুল হকের ‘মুহূর্ত নায়িকা’ পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না—গল্পকার যে ‘রানিমামি’র গল্প বলেছেন সে আসলে তার আপন

কেউ। অর্থাৎ, এই গল্পের চরিত্রের স্মৃতিচারণ (‘রানিমামি’র) মূলত গল্পকারেরই স্মৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বুলবন ওসমানের ‘স্যামরক্স ও সহোদরা’ গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত না-হলেও লেখকের জীবনী পড়ে বোঝা যায়—গল্পের প্রধান চরিত্র ফজল মূলত গল্পকার নিজেই। এ-জন্যে ফজলের ‘স্মৃতি’ মূলত লেখকেরই ‘স্মৃতি’ হয়ে ওঠেছে। অপরদিকে, দেশত্যাগের অভিজ্ঞতা, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও সংখ্যালঘু হিসেবে বাঁচার অভিজ্ঞতা—এসব বিষয় নিয়ে যেসব গল্প লেখা হয়েছে সেগুলোতে চরিত্রের জীবনসংগ্রামই মুখ্য হয়ে ওঠেছে। যেসব গল্পকারের দেশত্যাগের অভিজ্ঞতা ছিল, তাদের গল্পের বয়ানে ‘দেশভাগের অভিজ্ঞতা’ বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠেছে।

দ্বিতীয়ত, দেশভাগের ‘স্মৃতি’ উঠে এসেছে এমন গল্পগুলো হচ্ছে সিকান্দার আবু জাফরের ‘ঘর’, আবু রুশদের ‘হাড়’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’, হাসান আজিজুল হকের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’, বুলবন ওসমানের ‘স্যামরক্স ও সহোদরা’, মাহমুদুল হকের ‘মুহূর্ত নায়িকা’, সেলিনা হোসেনের ‘শেষ ভিটার আঁচড়’, পূর্বী বসুর ‘স্থলপদ্ম ও ভীমনাগের সন্দেশ’, জাফর তালুকদারের ‘পিতৃভূমি’, সাদ কামালীর ‘দেহত্যাগের পর যে দিন বণ্ডুয়ায় এলেন শৈলেশ্বর ঘোষ’ ও প্রশান্ত মৃধার ‘সোনার গোপাল’। এ-গল্পগুলোতে চরিত্রের ‘স্মৃতি’ই প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পের চরিত্রসমূহ দেশভাগের ঘটনাবলিকে প্রত্যক্ষ করেছে; অনেকে দেশত্যাগ করেছে, অনেকে হারিয়েছে বসতভিটা, কেউ হারিয়েছে স্বজন। তাই, চরিত্রের স্মৃতিচারণায় এসব বিষয়ই প্রাধান্য লাভ করেছে। যেমন—‘স্থলপদ্ম ও ভীমনাগের সন্দেশ’ গল্পের মলয় ও ‘পিতৃভূমি’ গল্পের মহিনের স্মৃতিকাতরতার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়—দুটো চরিত্রই দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারত (কলকাতা) চলে গিয়েছে। বহু বছর পরে এরা ফিরে এসেছে নিজের জন্মভূমিতে, শেকড়ে। এসেছে নাড়ির টানে। মলয় নিজের নিজের পৈতৃক ভিটা দেখে স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠেছে; অপরদিকে মহিনের ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ব্যাপার—নিজের দেশকে অনেক দিন পরে দেখে সেও আবেগতাপ্ত হয়েছিল। দুটো গল্পেই লেখক দেশভাগকে কেন্দ্র করে চরিত্রের স্মৃতিকে প্রকাশ করেছেন। একই মন্তব্য করা যেতে পারে সাদ কামালীর ‘দেহত্যাগের পর যে দিন বণ্ডুয়ায় এলেন শৈলেশ্বর ঘোষ’ গল্পের ‘শৈলেশ্বর ঘোষ’ চরিত্রের ক্ষেত্রেও—দেশভাগের সময় তিনি ভারতে চলে গেছেন, পরে তার জন্মস্থান বণ্ডুয়ায় এসে স্মৃতিকাতর হয়ে উঠেছেন।

তৃতীয়ত, দেশভাগের ‘অভিজ্ঞতা’ উঠে এসেছে শওকত ওসমানের ‘আলিম মুয়াজ্জিন’, সরদার জয়েনউদ্দীনের ‘ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা’, সিকান্দার আবু জাফরের ‘ঘর’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’, হাসান আজিজুল হকের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’, মাহমুদুল হকের ‘মুহূর্ত নায়িকা’, হরিপদ দত্তের ‘নরকযাত্রা’, সেলিনা হোসেনের ‘শেষ ভিটার আঁচড়’, সালাম আজাদের ‘সীমান্ত’ ও প্রশান্ত মৃধার ‘সোনার গোপাল’ প্রভৃতি গল্পে। দেশভাগের পর অনেক হিন্দু পরিবার পূর্ব পাকিস্তান

থেকে ভারতে চলে গিয়েছে, আবার অনেক মুসলিম পরিবার ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছে। নতুন দেশে আসা পরিবারগুলোকে নানান অভিজ্ঞতা তথা জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। যেমন—পূর্বের জায়গায় তাদের জীবনে যে স্থিতিশীলতা ছিল নতুন দেশে তারা সেটি হারিয়েছে। নতুন দেশে তারা ‘শরণার্থী’, ‘রিফিউজি’, ‘ঘটি’ প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত হয়েছে। এ-বিষয়টা মেনে নেওয়া তাদের জন্যে কষ্টকর ছিল। এই মনোবেদনা নিয়েই তারা নতুন দেশে বাস করেছে। নতুন দেশে আসা পরিবারগুলো তাদের বসতভিটা ও আবাদি জমি বিক্রি করে এসেছে, কেউ-বা এসব ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। তবে নতুন জায়গায় এসে তারা আগের মতো বাঁচতে পারেনি—অনেকেই নির্মাণ করতে পারেনি ঘর, কিনতে পারেনি আবাদি জমি। এ-ক্ষেত্রে পেশার পরিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ। কেউ আগে ছিল শিক্ষক, নতুন দেশে এসে হয়েছে মুদি দোকানদার (যেমন—সেলিনা হোসেনের ‘শেষ ভিটার আঁচড়’ গল্পের আসলাম গণি চরিত্র)। দেশত্যাগী মানুষ নতুন দেশে এসে যেসব তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে উল্লিখিত গল্পগুলোতে তারই রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে, গল্পের প্রধান চরিত্রের মধ্য দিয়েই জীবনসংগ্রাম বা অভিজ্ঞতার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। যেমন—সিকান্দার আবু জাফরের ‘ঘর’ গল্পের প্রমীলা ও ‘আলিম মুয়াজ্জিন’ গল্পের আলিম মুয়াজ্জিন। এ-দুটো চরিত্র দেশভাগের কারণে স্বাভাবিক জীবন থেকে ছিটকে গিয়েছে। প্রমীলা তার ঘর বা বসতভিটা হারিয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে; অন্যদিকে আলিম মুয়াজ্জিন দেশভাগের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে পাগল হয়ে গিয়েছে। গল্পের দুটো প্রধান চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিক্ত জীবনাভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে। কিছু সংখ্যালঘু পরিবার দেশভাগের অনেক পরেও তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে দেশত্যাগ করেছে। যেমন—হরিপদ দত্তের ‘নরকযাত্রা’ গল্পের বনমালীর পরিবার। বনমালীর পরিবার ‘শত্রু সম্পত্তি’ আইনের মারপ্যাচে পড়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

চতুর্থত, দেশভাগের কিছু গল্পে একই সঙ্গে ‘স্মৃতি’ ও ‘অভিজ্ঞতা’—দুটোরই রূপায়ণ হয়েছে। যেমন—সিকান্দার আবু জাফরের ‘ঘর’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’, হাসান আজিজুল হকের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’, মাহমুদুল হকের ‘মুহূর্ত নায়িকা’, হরিপদ দত্তের ‘নরকযাত্রা’, সেলিনা হোসেনের ‘শেষ ভিটার আঁচড়’ ও প্রশান্ত মৃধার ‘সোনার গোপাল’ প্রভৃতি গল্প। এসব গল্পে চরিত্রের স্মৃতির বয়ানের সঙ্গে তাদের জীবনাভিজ্ঞতার বর্ণনাও সমান্তরালে উঠে এসেছে। যেমন—হাসান আজিজুল হকের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ গল্পে দেশ ছেড়ে আসা বৃদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা (নিজের মেয়ের সম্বন্ধের বিনিময়ে বাঁচার প্রসঙ্গ) হচ্ছে গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়; একই সঙ্গে গল্পে বৃদ্ধের স্মৃতিচারণের বয়ানও গল্পে পাওয়া যায়—বৃদ্ধ তার পূর্বের দেশের কথা মনে করেছে, নিজের দেশকে ‘শুকনো দেশ’ বলে আখ্যায়িত করেছে; আবার নতুন দেশে আসার পর করবী গাছ লাগানোর স্মৃতির

বর্ণনা ও এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। মাহমুদুল হকের ‘মুহূর্ত নায়িকা’ গল্পটি ব্যতিক্রম। এ-গল্পে একই সঙ্গে লেখক ও গল্পের চরিত্রের ‘স্মৃতি’ ও ‘অভিজ্ঞতা’ বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চমত, দেশভাগের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার রপায়ণে হিন্দু ও মুসলমান লেখকদের গল্পের বয়ান ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। হিন্দু লেখকদের গল্পে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব-সংকটের বিষয়টি বেশি এসেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে হরিপদ দত্তের ‘নরকযাত্রা’ গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। গল্পকার বনমালীর পরিবারের দেশত্যাগের কারণ হিসেবে ‘শত্রু সম্পত্তি’ আইনকে দায়ী করেছেন। সংখ্যালঘু হিসেবে বনমালীর পরিবারকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম ও রূঢ় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। আবার, বাঙালি হিন্দু লেখকের গল্পে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। এ-ক্ষেত্রে পূরবী বসুর ‘স্থলপদ্ম ও ভীমনাগের সন্দেশ’ গল্পটির কথা বলা যায়। বেশিরভাগ বাঙালি হিন্দু লেখকের গল্পে দেশত্যাগের (পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতায় চলে যাওয়া) একই রকম বয়ান পাওয়া যায়। উপরের দুটো গল্পকে এ-ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা যায়। তবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেসব ‘মোহাজের’ পূর্ববঙ্গে এসেছে তাদেরকেও (‘মুসলমান’ পরিচয়ের জন্যে) সাদরে বরণ করা হয়নি। বাঙালি মুসলমান লেখকদের গল্পে এই বাস্তবতার প্রমাণ রয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’, মাহমুদুল হকের ‘মুহূর্ত নায়িকা’, হাসান আজিজুল হকের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ ও সেলিনা হোসেনের ‘শেষ ভিটার আঁচড়’ প্রভৃতি গল্পের কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি (বিশেষত, বাঙালি হিন্দু) মুসলমান লেখকদের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন—জাফর তালুকদারের ‘পিতৃভূমি’ গল্প; এ-গল্পে আশ্রয়চ্যুত সংখ্যালঘু পরিবারটিকে বাড়িতে জায়গা দিয়েছে একটি মুসলিম পরিবার।

পরিশেষে বলা যায়, দেশভাগকে উপজীব্য করে বাংলাদেশের সাহিত্যে কবিতা, উপন্যাসের চেয়ে ছোটোগল্পই বেশি লেখা হয়েছে। ছোটোগল্পে দেশভাগের বিচিত্র বিষয়েরও প্রতিফলন হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শরণার্থী সমস্যা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব-সংকট, মনোজগতের সাম্প্রদায়িকতা, দেশত্যাগ, স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা, খুন, হত্যা, ধর্ষণ, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সংকট, অবাঙালি মোহাজেরদের জীবনচিত্র, সীমান্তের বাস্তবতা ও মানবতার জাগরণ—প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অনেক গল্পকার গল্প লিখেছেন। তবে, বিষয় বিভিন্ন হলেও বেশিরভাগ গল্পে লেখকের বয়ানে প্রাধান্য পেয়েছে চরিত্রের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার বিবরণ; এমনকি অনেক ক্ষেত্রে লেখকের ‘স্মৃতি’ আর ‘অভিজ্ঞতা’ই গল্পের চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের ছোটোগল্পে দেশভাগের মর্মবেদনা তথা ‘স্মৃতি’ ও ‘অভিজ্ঞতা’ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

টীকা

১. ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরপরই পাকিস্তান সরকার 'এনিমি প্রপারটি অ্যাক্ট' বা 'শত্রুসম্পত্তি আইন' জারি করে। এই আইন অনুযায়ী হিন্দু মানেই শত্রু। পাকিস্তান হচ্ছে মুসলমানদের দেশ। তাই এখানে হিন্দুদের বাড়ি-ঘর, জমিজমা সবকিছুই শত্রুর সম্পত্তি। এই আইনকে ব্যবহার করেই হরিপদ দত্তের 'নরকযাত্রা' গল্পের সেকান্দার আলি বনমালীর বৈধ বসতিভিটা দখল করতে চেয়েছে।
২. 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন'ের লেখকেরা তথাকথিত আধুনিকতার নগ্নরূপকে সাহিত্যে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কারণ, তারা মনে করেন, আধুনিকতায় নবজাগরণ, 'এনলাইটমেন্ট' ঘটলেও তারই অন্যদিকে 'ডিহিউম্যানাইশনের' প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল রয়েছে। 'হাংরি আন্দোলন'ের প্রক্ষাপটেই ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে শৈলেশ্বর ঘোষ লেখেন তাঁর বিখ্যাত 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' নামক কবিতা (সাদ, ২০১৭ : ৩৫৭, ৩৫৯)। কবি মলয় রায়চৌধুরী দাবি করেছেন, তিনি 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন'ের পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে দেবী রায়ের সম্পাদনায় *Weekly Manifesto of the Hungry Generation* বের হয়। ওই সময়ই 'হাংরি আন্দোলন' জোরালো হয়ে ওঠে। এ-আন্দোলনের সঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মলয় রায়চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সমীর রায়চৌধুরী, উৎপলকুমার বসু ও প্রদীপ বসু প্রমুখ লেখকেরা যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মে (মলয় রায়চৌধুরীর মতে) 'হাংরি আন্দোলন' ভেঙে যায়। এ-আন্দোলন বাংলা সাহিত্যকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। এখনও এর প্রভাব শেষ হয়ে যায়নি। (জাহিরুল, ২০১৪ : ১৯২)

সহায়কপঞ্জি

- অরুণ সেন (২০১০)। 'নির্বাসিত শৈশব, ছিন্নমূল যৌবন'। *আলোছায়ায় যুগলবন্ধি*। মাহমুদুল হক স্মরণে, [সম্পা. আবুল হাসনাত ও অন্যান্য], সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৫৮।
- অশ্রুকুমার সিকদার (২০২১)। 'ভাঙা বাঙলার সাহিত্য'। *দেশভাগ : স্মৃতি আর স্তব্ধতা* [সম্পা. সেমন্তী ঘোষ], গাঙচিল, কলকাতা।
- আবু রুশদ (২০১৭)। 'হাড়'। *দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ* [সম্পা. সুশীল সাহা], গাঙচিল, কলকাতা।
- আহমেদ মাওলা (২০২২)। *দেশভাগের সাহিত্য*। গাঙচিল, কলকাতা।
- জাফর তালুকদার (২০১৫)। 'পিতৃভূমি'। *দুই বাংলার নির্বাচিত গল্পে দেশভাগ* [সম্পা. সজল আহমেদ, মধ্যমা, ঢাকা]।
- জাকির তালুকদার (২০১২)। 'বাংলাদেশের গল্প : ভূমিকা'। *হালখাতা* [বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা], [সম্পা. শওকত হোসেন ও শরমিন নিশাত], ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা : ১ম ও ২য়, ঢাকা।
- জাহিরুল হাসান (২০১৪)। 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন'। *বহুযুগ্মী সাহিত্যকোষ*। পূর্বা, কলকাতা।
- বুদ্ধদেব ঘোষ (২০২০)। 'যাপনে দেশভাগ : দেশভাগের গল্প'। *সাতচল্লিশের দেশভাগ* [সম্পা. বুদ্ধদেব ঘোষ ও দেবব্রত বিশ্বাস], কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
- বুলবন ওসমান (২০১৭)। 'স্যামরক্স ও সহোদরা'। *দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ* [সম্পা. সুশীল সাহা], গাঙচিল, কলকাতা।
- পূর্ববী বসু (২০১৭)। 'স্থলপদ্ম ও ভীমনাগের সন্দেশ'। *দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ* [সম্পা. সুশীল সাহা], গাঙচিল, কলকাতা।

- প্রশান্ত মৃধা (২০১৭)। ‘সোনার গোপাল’। *দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ* [সম্পা. সুশীল সাহা], গাউচিল, কলকাতা।
- মননকুমার মণ্ডল [সম্পা.] (২০২১)। ‘প্রাক্কথন’। *পার্টিশন সাহিত্য : দেশ-কাল-স্মৃতি*। গাউচিল, কলকাতা।
- মাহমুদুল হক (২০১৭)। ‘মুহূর্ত নায়িকা’। *দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ* [সম্পা. সুশীল সাহা], গাউচিল, কলকাতা।
- শওকত ওসমান (২০১৭)। ‘আলিম মুয়াজ্জিন’। *দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ* [সম্পা. সুশীল সাহা], গাউচিল, কলকাতা।
- শহীদ ইকবাল (২০২০)। ‘পার্টিশন’ প্রপঞ্চ ও ফর্মের বুননকাঠামো’। *দেশকাল পত্রিকা* [সম্পা. ইলিয়াস উদ্দিন পলাশ], ৩য় বর্ষ, সংখ্যা : ৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০, ঢাকা।
- সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০২০)। ‘ভাঙা বাঙলা, ভাঙা মন’। *দেশভাগ-দেশত্যাগ*। অনুষ্টিপ, কলকাতা।
- (২০০১)। *দেশভাগ : স্মৃতি আর সত্তা*। প্রফ্রেসিড পাবলিশার্স, কলকাতা।
- সরদার জয়েনউদ্দীন (২০১৫)। ‘ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা’। *দুই বাংলার নির্বাচিত গল্পে দেশভাগ* [সম্পা. সজল আহমেদ], মধ্যমা, ঢাকা।
- সরিফা সালোয়া ডিনা (২০১০)। *হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প : বিষয় ও প্রকরণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- সাদ কামালী (২০১৭)। ‘দেহত্যাগের পর যে দিন বগুড়ায় এলেন শৈলেশ্বর ঘোষ’। *দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ* [সম্পা. সুশীল সাহা], গাউচিল, কলকাতা।
- সানজিদা আখতার (২০০২)। *বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- সালাম আজাদ (২০১৫)। ‘সীমান্ত’। *দুই বাংলার নির্বাচিত গল্পে দেশভাগ* [সম্পা. সজল আহমেদ], মধ্যমা, ঢাকা।
- সিকান্দার আবু জাফর (২০১৭)। ‘ঘর’। *দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ* [সম্পা. সুশীল সাহা], গাউচিল, কলকাতা।
- সুশীল সাহা [সম্পা.] (২০১৭)। ‘গ্রন্থ নির্মাণ প্রসঙ্গে’। *দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ*, গাউচিল, কলকাতা।
- সেলিনা হোসেন (২০১৭)। ‘শেষ ভিটার আঁচড়’। *দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ* [সম্পা. সুশীল সাহা], গাউচিল, কলকাতা।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (২০১৫)। ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’। *দুই বাংলার নির্বাচিত গল্পে দেশভাগ* [সম্পা. সজল আহমেদ], মধ্যমা, ঢাকা।
- হরিপদ দত্ত (২০১৭)। ‘নরকযাত্রা’। *দেশভাগের গল্প : বাংলাদেশ* [সম্পা. সুশীল সাহা], গাউচিল, কলকাতা।
- হাসান আজিজুল হক (২০১৫)। ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’। *দুই বাংলার নির্বাচিত গল্পে দেশভাগ* [সম্পা. সজল আহমেদ], মধ্যমা, ঢাকা।

মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ

মাহিতি

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬ ব. ৥ ১৯৫৯ খ্রি.

ru.ac.bd/bangle/bangle-journal-shahittyki

Print : ISSN 1994-4888

বর্ষ : ৬৬ সংখ্যা : ৫৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ ৥ মে ২০২৫

প্রকাশকাল : মে ২০২৫

প্রবন্ধ জমা : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রবন্ধ গৃহীত : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পৃষ্ঠা : ১৪৯-১৬৮

জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য : অর্থময়তার সূত্র-সন্ধান

শাকিলা আলম

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

ই মেইল : shakila@ban.ku.ac.bd

সারসংক্ষেপ

জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য গভীর ও গাঢ় ভাবব্যঞ্জনায় অভিনবই বটে। এ-রচনা বিবিধ অনুষঙ্গের তীব্রতায় জটিল ও বিস্তৃত। এ বিস্তৃতি ও উপাদানগত প্রসারতায় এক ধরনের ভাববাচকতা সৃষ্টি হয়— যা বিশেষ শিল্পরীতিতে অনন্য। লেখকের রচনায় গদ্যকাঠামোর স্বরূপ ও স্বকীয় ভাববোধ পাঠ করার ক্ষেত্রে এর অভিনব কিছু উপাদানও গভীর মনোযোগ দাবি করে। এমন রীতিকৌশলে জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য নতুন অর্থময়তায় দ্যোতিত হয়। এসব উপলব্ধির সারাৎসার থেকে এ-প্রবন্ধের অনুসৃত উদ্দেশ্য রচিত।

মূল শব্দ

জীবনানন্দ দাশ, কথাসাহিত্য, কথাবস্তু, শব্দচয়ন, অর্থদ্যোতনা, রীতিকৌশল।

‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ [জীবনানন্দ, ২০১৭ : ৮] চরণটির মধ্যদিয়ে জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) বাংলার প্রকৃতির দর্শনোপলব্ধির উর্ধ্বে আরো একটি ভিন্নবোধও প্রকাশিত হয়। এই সূত্রে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম পরিপাঠের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁর সাহিত্যকর্মে বাংলার প্রকৃতিকে উপকরণ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়; যার মাধ্যমে বাংলার সাংস্কৃতিক অস্তিত্বও উপলব্ধির গোচরীভূত হয়। ‘প্রকৃতি দাশের অভীষ্ট নয়, জীবনবোধ প্রকাশের উপায়।’ (আজাদ, ২০২৩ : ৮৭) পূর্বোক্ত বাংলার অস্তিত্ব ও জীবনবোধ উপলব্ধির এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় রচনায় অন্তর্নিহিত তাঁর সাহিত্যবোধের মাধ্যমে। তাঁর এই স্বেপলব্ধি অর্থাৎ সাহিত্যবোধ তাঁর নিজের অস্তিত্ববোধের অন্তরেই নিহিত রয়েছে। ব্যক্তি জীবনানন্দ দাশের অবস্থান ছিলো বাংলার বিশ শতকীয় সাংস্কৃতিক পরিণতির উত্তোরাদিকারী প্রতিবেশে। এই যুগপরিবেশ তাঁর লেখকসত্তার স্বকীয় বোধের বিশেষ উৎস। তাঁর সাহিত্য পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায় যে, এই লেখকের চিন্তাকাঠামো ভারতীয় দর্শনজাত। আর এই কাঠামো-জারিত উপলব্ধি অবিশ্রান্ত বিবরণে উপস্থাপিত হয় তাঁর কথাসাহিত্যে। তাতে যে ভাব অভিব্যক্তি লাভ করে, তা বিষয়গত দিক থেকে ব্যক্তিমানুষেরই আত্মসংকট জাত। আর তা মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের উপনিবেশিত রাজনৈতিক পরিবেশে উনিশ শতকীয় জীবনবোধের উপজাত। এই সংকটবোধ কেবল দূরতিক্রম্যই নয়, অনতিক্রম্যও। কিন্তু সংস্কৃতিসচেতন আত্মপরিচয় উন্মুখ ব্যক্তিমানুষ ক্রমাগত এই সংকটকে অতিক্রম করে যেতে সচেষ্ট থাকে। এই অতিক্রমণ প্রয়াসের বিবিধ সম্ভাব্য পৃষ্ঠ তার পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে উপস্থিত রয়েছে জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যে। ফলে, আপাতদৃষ্টে যে সাহিত্যকর্মসমূহকে গল্পবস্তুর বৈচিত্র্যহীনতার সংকটে জর্জরিত মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা বিচিত্রমুখী সম্ভাব্য গল্পের আকরিক। এই আকরিক কথাসাহিত্য যে প্রক্রিয়ায় স্বকীয়তা লাভ করে, তা-ই এই সন্দর্ভের অস্থিষ্ট জিজ্ঞাসা।

১ কবিতার চিন্তাসূত্রে কথাসিঙ্গের প্রকরণ : মানব

জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য তাঁর কবিতার মতই গভীর ও গাঢ় ভাবব্যঞ্জক। কিন্তু গদ্যসাহিত্য বিশেষত কথাসাহিত্য এর কাঠামোগত কারণে অর্থাৎ, কথার সাহিত্যে কথা কখনো হয় জীবনের প্রকার, আবার কখনো হয়ে ওঠে জীবনের প্রকাশ। যদিও জীবন কোনো ক্ষেত্রেই গুরুত্বহীন নয়; কিন্তু জীবনের প্রকারে আসে উপকরণ আর বৈচিত্র্যের সমারোহ। অপরদিকে, জীবনের প্রকাশে উপাদান আর প্রভাবনা হয়ে ওঠে সাহিত্যকর্মের অভিপ্রেত, অভিলক্ষ্য। এই দ্বিতীয়োক্ত ধারার উৎসমূলে রয়েছে জীবনের বোধ। কথাসাহিত্যে জীবনের এই বোধের অবস্থান কী রূপ হতে পারে সে বিষয়ে অভিমত পাওয়া যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সীমারেখা গ্রন্থে। ভাবসংহতির ভিত্তিতে গল্প এবং কবিতার সাযুজ্য স্বীকার করতে তিনি উল্লেখ করেন :

গল্পলেখকের সঙ্গে কবির মানসিক-সহমর্মিতা নিকটতম। জীবনের বস্তুরূপ থেকে তাঁদের প্রেরণা সঞ্চারিত হলেও কবিরা যেমন বস্তুর সাংকেতিকতা আহরণ করেন, গ্রহণ করেন তার ভাবনির্যাস— তেমনি ছোটগল্পলেখকের কাছেও প্রত্যক্ষ পরিপার্শ্ব তার অবলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাব মাত্র। কবিতা জীবনের ভাবরূপ, ছোটগল্প জীবনের প্রতীকী প্রকাশ। কিন্তু ভাবময় রূপায়ণ আর প্রত্যক্ষতার আলম্বন প্রতীকের দ্যোতনা-শিল্প-মননের দিক থেকে এ দুটির সম্পর্ক অত্যন্ত নিকট। (নারায়ণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ : ১০)

অর্থাৎ সাংকেতিকতার সৃষ্টিপ্রয়াস গল্পকার ও কবির রচনাপ্রক্রিয়াকে তুলনীয় করে তোলে। ছোটগল্পে কবিতার অনুরূপ ভাব-দ্যোতনা সৃষ্টি হয়। সেটিই উদাহরণ হিসেবে তাঁর ‘সৌরকরোজ্জ্বল’ কবিতায় প্রতীক ও উপমা প্রয়োগের প্রগাঢ়তায় পরিলক্ষিত হয়। এখানে ‘মানুষ’ আর ‘মানব’ শব্দদুটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাব নিয়ে উপস্থিত হয় :

মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়

শেষ হবে; তৃতীয় চতুর্থ— আরো সব

আন্তর্জাতিক গ’ড়ে ভেঙে গ’ড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব। [জীবনানন্দ, ২০১৭ : ৪৭]

‘মানুষ’ শব্দটি আভিধানিকভাবে [মনু+(য্)+য], এবং এটি সাধারণ অর্থে মানুষ এবং তার কৃতকর্মকে নির্দেশ করে। আর অন্যদিকে, ‘মানব’ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে মানুষকে নির্দেশ করে, যার মূলে রয়েছে ‘মনু+মঃ’। ‘মঃ’ প্রত্যয় অপত্য বা সন্তান অর্থে প্রয়োগ করা হয়। ‘মঃ’ প্রত্যয় ‘শিবের’ সঙ্গে যুক্ত হলে ‘উপাসনা’ এবং ‘শিশুর’ সঙ্গে যুক্ত হলে ‘ভাব’ অর্থ নির্দেশ করে। কিন্তু ‘মঃ’-প্রত্যয়ের সূত্রে ‘মানব’কে মানুষের ভাবযুক্ত বা বিবেকযুক্ত চিন্তাশীল সত্তা অর্থে গ্রহণ করলে, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ‘মানব’ শব্দটিকে একটি ‘প্রতীক’ হিসেবে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এই সত্তার সঙ্গে রুচি, ঐতিহ্য, সূচেতনা এবং সর্বোপরি প্রগাঢ় বোধকে প্রতীতি হিসেবে গ্রহণ করা হলে কবিতায় মানুষের মধ্যে বোধের ক্ষেত্রেই ব্যাপক বিস্তৃত শ্রেণিবিভাজন খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের রচনাসমূহে এই মানবের অস্তিত্ব ও সত্তাকে বিচিত্র প্রতিবিম্বে উপস্থিত থাকে। এক্ষেত্রে কবিতাটিতে ‘মানুষ’ দ্বারা সেই মানুষদেরকে নির্দিষ্ট করা হয় যারা কবিতার প্রথমাংশে ‘পরের ক্ষেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে’ লাগায়। অর্থাৎ এরা একটি আত্মসী শক্তি যারা অপরের প্রতি শোষণযন্ত্র পরিচালনা করে। কবিতার ভাষ্যানুসারে এই আত্মসী মানুষেরা এমন সমাজে বসবাস করে যা ‘পথের বাঁকে’, ‘ভাঙনের নদীর শিরে’ অবস্থিত। এরূপ সমাজ ও এর মানুষের অস্তিত্ব তাদেরই স্বনির্মিত অর্থব্যবস্থার কারণে আসু-বিলীয়মান পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, এমনই অভিলাষ কবিতাতে পরিস্ফুট হয়। কবিতাতে পুঁজিতন্ত্রের শোষণব্যবস্থার বিপরীতে উপস্থিত রয়েছে একটি প্রত্যাশা। আর তা হলো কৃষিভিত্তিক সমাজ ও অর্থব্যবস্থা। অর্থাৎ, এমন অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যেখানে পুঁজিতন্ত্রের মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণি এবং এর নিপীড়ণ লুপ্ত হবে। বিলুপ্ত হবে মানুষে মানুষে বৈষম্য। কৃষি, মাটি, ‘নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল’ ইত্যাদির সান্নিধ্যে মানুষের জীবন গড়ে ওঠার অভিব্যক্তি বিভাসিত হয় ‘সৌরকরোজ্জ্বল’ কবিতায়। সেখানে পরিবর্তিত সমাজের

মানুষেরাই ‘মানব’ হিসেবে চিহ্নিত হয়। জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যেও এই ‘মানব’ের জীবনের বিবিধ বোধই নানা দৃষ্টিকোণ প্রকরণ এবং আলোর প্রক্ষেপে বিভাসিত হতে দেখা যায়। মূলত তাঁর ছোটগল্পে এই ‘মানব’ের জীবনকেই সনাক্তকরণ প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

১.১ ছোটগল্পের আঙ্গিকে ‘মানব’ অভিনিবেশন

সু-বোধ ও সু-চেতনা সমৃদ্ধ মানুষের মনন কীরূপ হতে পারে? এই প্রশ্নের মীমাংসা অন্ত্রেষণ করা যায় জীবনানন্দ দাশের ‘মেয়েমানুষ’ শীর্ষক গল্পে। এখানে দুই রুটির দুজন নারী এবং দুজন পুরুষকে উপস্থাপন করা হয়। চপলা এবং লীলা, হেমেন এবং দ্বিজেন। নামকরণেই চরিত্রগুলোর গতিপ্রকৃতি এমনভাবে নিদেশিত হয় যে, নামগুলোই একেকটি ভাবাবস্থানের প্রতীক হয়ে ওঠে। চপলা চঞ্চলমতি, কামগন্ধযুক্ত এই নারী তার সহধর্মী হেমেনের সঙ্গে সর্বদা প্রতারণারই আশ্রয় নেয়। অপরদিকে, লীলা ভীষণভাবে প্রেমাকাজক্ষী কিন্তু অর্থকষ্টে রক্ষাচারী। একইভাবে, হেমেন কামনাবাসনার আকাঙ্ক্ষায় হিমশীতল নির্লিপ্ত এবং দ্বিজেন দ্বিচারী, সহধর্মী লীলাকে প্রতারিত ও অতিক্রম করে গিয়ে সে চপলার কামসঙ্গ আকাঙ্ক্ষী। ‘প্রেমিক স্বামী’ গল্পের ‘মলিনা’, ‘ভূজঙ্গ’, ‘বিস্ময়’ গল্পের ‘সুবোধ’ ইত্যাদি নামকরণও চরিত্রসমূহের অবস্থান ও ভাবের প্রতীক। অপরদিকে, ‘ভূজঙ্গ’ বা সাপের মতো করেই এই গল্পে দেখা যায় ভূজঙ্গবাবু মলীনাতে ‘তাঁর লম্বা চওড়া শরীরের ভেতরে’ [জীবনানন্দ (প্রথম খণ্ড), ২০১৭ : ৫৭৪] আবদ্ধ করে রাখে।

নামকরণের পাশাপাশি গল্পটির ভাবপ্রবাহের একটি বিশিষ্ট ধরন উপলব্ধি করা যায়। স্ত্রী মলিনা প্রভাতের সংসারে প্রবল অর্থকষ্টে প্রাণশক্তিহীন হয়ে পড়ে। তাই প্রভাত তাকে একটি ‘সূচনার ভিতরে পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছে’। [জীবনানন্দ (প্রথম খণ্ড), ২০১৭ : ৫৬৪] জীবনানন্দ দাশের প্রথম পর্যায়ের (১৯৩১) গল্পসমূহের মধ্যে এই গল্পটিতে অন্তঃসারশূন্য মানব সম্পর্কে নতুনভাবে গড়ে তোলার চিন্তা উন্মোচিত হয়। গল্পের গল্পবস্তু এর ঘটনাপ্রবাহে অবস্থান করে না। কিন্তু চরিত্রগুলোর বাচনের প্রতি মনোনিবেশ করলে প্রতিভাত হয় যে, এগল্পের গল্পবস্তু নিহিত রয়েছে এর বাচনের ধারাবাহিকতার মধ্যেই। গল্পের চরিত্র প্রভাতে বাচনের মাধ্যমে তার অর্থাৎ গল্পের ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

নিজের এই চার পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে মলিনাকে জীবনের কোনো দিক দিয়েও কোনো প্রবোধ দিতে পারেনি যে সে, কোনোদিনও যে এই মেয়েটিকে এমন দিনরাত সংগ্রাম অধীনতা অভিমান অপমানের জ্বালা থেকে উঠিয়ে নিয়ে একটা গরুর ঘরের খড় বিচালির ভেতরে একটা বাছুরের মতোও সহায় সঙ্গ আশ্রয় উষ্ণতা দিতে পারে না যে সে? আহা শীতের রাতের একটা বাছুরও—পৃথিবীর পাখি, ফড়িং কীট—এমন শীতের রাতে সকলের জন্যই, হোক না তা খুব নির্বোধ—তবু একটা পরম পরিতৃপ্তি রয়েছে তো। [জীবনানন্দ (প্রথম খণ্ড), ২০১৭ : ৫৬৩]

একটি মৃতপ্রায় দশা থেকে একজন মানব (প্রভাত) তাঁর সহধর্মীকে (মলিনা) একটি নতুন শুরুর প্রতি আগ্রহী করে তুলতে চায়। এর মাধ্যমে মলিনা যে মুক্তি লাভ করবে

তার ভাবই প্রভাতের বাচনের সূত্রে গল্পের ভাবপ্রবাহকে ধারণ করে। সংসার ও দারিদ্রের নিগড় থেকে মুক্তির অনুভূতি মলিনার জন্য কেমন হবে তা প্রকাশিত হয় প্রভাতের বাচনে, তারই প্রভাবনায় :

মলিনা নেই আজ যার—জীবনের ভারাক্রান্ত ডানা দুটোর অজস্র পালকের বিষাক্ত কলমের সুখ জীবনটাকে বিধছে না আজ আর তত। ডানা দুটো বুজে রয়েছে যেন। কোনো অশ্রুয়ে প্রয়োজন নেই আজ আর। না শিষ্টে না মুখে। কেমন একটা নিশ্চিত আরাম। [জীবনানন্দ (১ম খণ্ড), ২০১৭ : ৫৬৬]

অর্থাৎ, প্রভাতের প্রত্যাশা, মলিনা যেন অন্য একরকম জীবনের অনুরোধ নিজের থেকেই বোধ করতে পারে। একইসূত্রে গল্পকারের অভিপ্রায়, গল্পের পাঠকও যেন সমভাবপন্ন হয়ে উঠতে পারে। প্রভাতের ভাবনা তার বাচনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, সে মলিনাকে উপলব্ধি করাতে চায়, ‘আকস্মিক মৃত্যুর চেয়ে জীবনটাকেই যে বরং সহ্য করে ক্ষমা করে উপলব্ধি করে যাওয়া দরকার’। আর, ‘প্রত্যেক স্বাধীন মানুষেরই পৃথিবীটাকে নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে দেখবার অধিকার আছে। তারপর নিজের ধর্ম সে নিজেই তৈরি করে।’ [জীবনানন্দ (প্রথম খণ্ড), ২০১৭ : ৫৭২] জীবনানন্দ দাশের প্রথম পর্যায়ের এই গল্পটির সমগ্র অংশই এই দ্বিধা এবং দ্বিধা থেকে ক্রমমুক্তি ধারাপ্রবাহ। ফলে নিশ্চিত থাকা যায় যে, জীবনানন্দ দাশের গল্প বস্তুগত পৃথিবীর আখ্যানমাত্র নয়। এর গল্পবস্তু মানুষের ও মানবের আত্মার ধারাপ্রবাহের উপলব্ধি, আখ্যানকথা।

পাশাপাশি ‘হিসেব-নিকেশ’ গল্পেও ‘মেয়েমানুষ’ গল্পের মত পুঁজিপতি, নব্য ধনিক শ্রেণির প্রতিভূ চরিত্রগুলো উপস্থিত হয় তাদের কদর্য প্রতিকৃতি নিয়ে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ব্যবহৃত ‘নষ্ট শশা’, ‘পঁচা চালকুমড়া’র উপমা এসকল চরিত্রের অন্তর্জগতের দশা প্রকাশের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়। গল্পে এই শ্রেণির চরিত্রগুলো মেদযুক্ত শরীর নিয়ে উপস্থিত হয়। ‘হিসেব-নিকেশ’ গল্পের অবনীশ সম্পর্কে লেখকের বিবরণ এমন :

সমস্ত মেদ চর্বির শরীরটা যেন একটা তুলোর গদি; গালদুটো তুলোর গদি; পুরু ঠোঁট তুলোর কোলবালিশ; খাঁদা নাক—তুলোর গদি; চোখের বড় বড় ডালা দুটোও যেন দুটো গদি—তুলোর অথবা ভুসির।

এমনই চিত্রের মাধ্যমে নব্যধনিক শ্রেণির মানুষগুলোর শরীরের সাথে সাথে তাদের মনের নিষ্ফলতা, কদর্যতা উন্মোচিত হয়। একইসঙ্গে এই নিষ্ফলতা যে সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং লেখকের নিকট ঘৃণার তা সুস্পষ্ট হয়। কারণ পুঁজিতান্ত্রিক চরিত্রগুলো বাহ্যিকভাবে পরিপাটি হলেও অন্তর্গতভাবে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সুরাচি, সুনীতি বিবর্জিত। ফলে এদের অন্তরাত্মা অর্থাৎ ‘ভেতরটা পঁচে উঠেছে’। জীবন ও জগতের প্রয়োজনে এরা সম্পূর্ণই মূল্যহীন। নিষ্ফল এদের জীবনযাত্রা। ‘কথা শুধু- কথা কথা কথা কথা’ গল্পে এতো কথা বা কথার বাহুল্য কেবল টাকার হিসেব ঘিরে। গল্পের চরিত্র ভবশঙ্কর এবং গঙ্গাধর। তারা ব্যবসায়ী। ভবশঙ্কর চিকিৎসা আর গঙ্গাধর ব্যারিস্টারি ছেড়ে গ্রহণ করেছে ব্যবসাকে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই, অগাধ অর্থ

উপার্জন। যেই ব্যবসায় প্রতিনিধি বেশি নীতিবিরজিত হলেও সেই ব্যবসায় এদের কোনো অর্পণ নেই। পাশাপাশি ভবশঙ্কর ইস্তুরেস কোম্পানির চেয়ারম্যান। অফিসের সেক্রেটারির কাছে ক্রমাগত অপমানিত হলেও সে তার ‘পরম প্রতিষ্ঠা’র চাকুরিটি ছাড়তে চায় না। আত্মমর্যাদার বিনিময়ে সে কেবল কামনা করে অর্থনৈতিক সফলতা। আবার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাও তার কাম্য। ‘কংগ্রেসের লেফটদের’ সামনে বক্তৃতা করতে গিয়ে নিজেকে ‘বলশেভিক নয়’ দাবি করায় যখন শ্রোতাদের মধ্যে ধিক্কার ওঠে, তখনই সে তার বক্তব্যের দিক পরিবর্তন করে নেয় এবং বলশেভিকদের জয়কার করতে শুরু করে। গল্পে প্রকাশিত হয় যে, রাজনীতি ভবশঙ্করের কাছে কেবলই প্রতিষ্ঠা লাভের একটি উপায় মাত্র। রাজনীতির জন্য আবশ্যকীয় উপাদান ভাবাদর্শ, যার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না ভবশঙ্করের চিন্তে। চরিত্রগুলোকে এক একটি সামাজিক অবস্থান হিসেবে কল্পনা করা গেলে এর মাধ্যমে প্রতিভাত হয় যে, এই সামাজিক অর্থাৎ ভাবাবস্থানগুলোর সংকটের উৎস যুগপৎভাবে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এবং এই অর্থব্যবস্থাই উপজাত স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরূপি; যেখানে জীবনের উদ্দেশ্য কেবল অর্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ। এই প্রক্রিয়ার পরিসীমানা কেবলই আত্মস্বার্থপরতা, যা তৎকালের নব্য-ধনিক শ্রেণির আত্মরই চিহ্নায়ন। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার নিমর্মতার শিকার অপর শ্রেণি ‘কামনাবাসনার গন্ধ’ গল্পের কনক, ‘প্রেমিক স্বামী’র মলিনা, ‘বিস্ময়’ গল্পের সতী-দম্পতি ইত্যাদি। এরা মনে করে ‘জীবনের একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই’। [জীবনানন্দ (তৃতীয় খণ্ড), ২০১৭ : ৪৯৭] অর্থাৎ গল্পগুলোতে মূলত পারস্পরিকভাবে বিপরীত চিন্তার আধার মানুষগুলোকে পাশাপাশি উপস্থাপন করা হয়। বিপরীতধর্মী চরিত্রগুলোর মাধ্যমে এরা একে অপরের সঙ্গে কী কী প্রতিক্রিয়া দেখায় তা নির্ণিত হয়; যা গল্পগুলোর বয়ান (narrative) সৃষ্টিতে সহায়তা করে। মার্কসবাদী উপন্যাস-তাত্ত্বিক গেওর্গে লুকাচ শিল্পসৃষ্টিতে নজর দিতে বলেন— চরিত্রচিত্রণের দিকে আখ্যানের গঠন বা ঘটনার দিকে নয়। (রামকৃষ্ণ, ২০১৫ : ১০৫) জীবনানন্দ দাশের গল্পে উপস্থিত চরিত্রগুলোর বাচনের (Voice) মাধ্যমেই গড়ে ওঠে এর স্বকীয় বয়ান। গল্পকার কথক হিসেবে গল্পে উপস্থিত থাকেন, সমান্তরালভাবে তিনি সেখানে ‘ন্যারেটর’ বা বয়ানকারী হিসেবেও উপস্থিত থাকেন। জীবনানন্দ দাশের গল্পের চরিত্রগুলোর সংলাপ বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই ন্যারেটরের উপস্থিতি সর্বক্ষেত্রেই বজায় থাকে। এর মাধ্যমে মূলত লেখকের বক্তব্য উপস্থাপনের সবগুলো স্থান সর্বোচ্চ পরিমাণে ব্যবহারের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। যেমন ‘আর্টের অত্যাচার’ গল্পে অবিনাশ, নিখিল, দেবকুমার, অমিতা ইত্যাদি চরিত্রের সংলাপ বিনিময়ের ক্ষেত্রে ন্যারেটর প্রায়শই চরিত্রগুলোর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। বিশেষত নিখিল এবং গল্পকার বয়ানকারী হিসেবে ক্রমাগত একে অপরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আর, গল্পকার সতর্কভাবে ন্যারেটর এবং চরিত্রের সংলাপকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করেন। কিন্তু, চরিত্রগুলোর মনের চিত্র ন্যারেটর এমনভাবে বর্ণনা করতে থাকেন যে সর্বত্রই তা বিশ্লেষণের পর্যায়ে উন্নীত হয়। ফলে, গল্পের চরিত্র নিখিল এবং ন্যারেটরের

বলার রীতি এবং স্বর সমরূপে অভিব্যক্ত হয়। উভয়ের দর্শন এবং চিন্তার যে নিম্নোক্ত উদাহরণে অন্বেষণ করা যায় [জীবনানন্দ (প্রথম খণ্ড), ২০১৭ : ৬২২, ৬২৫] :

- i. সাহিত্য কী, এবং সাহিত্য কী নয়, অনেক নামজাদা সস্তা লেখক ও সম্পাদকের চেয়ে ঢের বেশি করেই সে তা জানে, তার নিজের মতামতকে সে খুব গভীর মনে করে, নিখুঁত বিশ্বাসীর ভগবানের চেয়েও কবিতা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের মনের নিপুণ ব্যবহারকে সে ঢের বেশি শ্রদ্ধা করে।
- ii. কালে ক্রমে দেখল ‘আছে, সবই আছে, এক একটা ইশারা এসে তাকে গভীর অন্ধকার রাতে ঘুমের থেকে জাগিয়ে দিয়েছে তারপর বলেছে আমি ছায়া শুধু কতগুলো এলোমেলো শব্দ, একটা দুঃসাধ্য চিন্তা, তুমি আমাকে সাজিয়ে দাও, গুছিয়ে দাঁড় করার(করাও) তুমি ছাড়া কেউ তা পারবে না, তোমায় আমি ছাড়ব না।’
- iii. সাহিত্য মানুষকে ভিড় থেকে টেনে আনে, তারপর ছবি দেখতে বলে, তারপর ছবি আঁকতে বলে। এ সবই কী গভীর অসহ্য।

উদ্ধৃতিসমূহে প্রতীয়মান প্রক্রিয়ায় গল্পের বয়ানকারী ও গল্পের চরিত্র নিখিলের স্বর ও সুর একীভূত হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যের সর্বত্রই এই ধরনের সমন্বয়রীতি উপস্থিত হয়েছে। লেখক ও ন্যারেটরের সংমিশ্রণ কথাবস্তুতে প্রাণজ্বলতা সৃষ্টি করে। আবার লেখকের দর্শনের সঙ্গে গল্পগুলোকে তুলনামূলকভাবে পাঠ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। এই পাঠ গল্পের অর্থময়তাকে বিস্তৃত করে এবং লেখকের সমকালের বাস্তবতাকে আবিষ্কার করার ভাব-আবহও সৃষ্টি করে। একইসঙ্গে তা পাঠককে সরবরাহ করে মানুষের ‘মানব’ হয়ে ওঠার অর্থ ও বোধ অর্জনের স্বাধীনতা, বৈচিত্র্যও। এটি লেখকের অনন্য শিল্পশক্তিরই পরিচায়ক।

১.২ কথাসাহিত্যের দর্শনমুখ্যতা

কথাসাহিত্যে লেখক ও ন্যারেটরকে সম্মিলিত করে নেওয়ার প্রক্রিয়া বয়ান সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরো একটি সম্ভাবনার সূচনাবিন্দু উন্মোচন করে। এই সম্মিলনের মাধ্যমে কথা বা বর্ণনাংশ কেবল কথোপকথন বা আলাপচারিতার (conversation) সীমানায় পরিসীমিত হয়ে থাকে না। জীবনানন্দ দাশের গল্পে চরিত্রের সংলাপ বা বয়ানের ভেতরে গল্পকার ন্যারেটর হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এর ফলে ন্যারেটরের স্বরের মধ্যে চরিত্রের চিন্তাজগত ও ভাবজগত প্রথিত হয়। আর একারণে জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যের পাঠের (Text) প্রায় আশি ভাগ কথা সংলাপ বা উক্তি অর্থাৎ ডায়ালগে (Dialogue) উন্নীত হয়।

কথোপকথন এবং সংলাপ দুটি স্বতন্ত্র ধারণা। কথোপকথনের মধ্যে অবাধ তথ্য আদান-প্রদান এবং নিত্যকার জীবনের প্রাত্যহিক বক্তব্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। অপরদিকে, সংলাপ সেই কথোপকথন ও বক্তব্য যা স্থান-কাল-পাত্র অতিক্রম করে যায়। এই রীতির

বক্তব্য ভাব ও বোধগত ক্ষেত্রে গভীর ও সামগ্রিক অর্থময়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। আবার, এই সংলাপধর্মী বক্তব্যে বিশেষ শব্দ-সংহতির মাধ্যমে শিল্পোত্তীর্ণ হতে পারে। এক্ষেত্রে সংলাপ চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারে, আবার তা থাকতে পারে লেখক বা ন্যারেটর বা বয়ানকারীর বাচনেও। যেমন প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশের একটি সংলাপ হলো, ‘সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি’; [জীবনানন্দ (তৃতীয় খণ্ড), ২০১৭ : ৫৪৯]। এছাড়াও, পূর্বোল্লিখ উদ্ধৃতিসমূহের তৃতীয়টি একটি সংলাপ বা ডায়ালগ। বাকি দুটি লেখক ও লিখিত চরিত্রের বয়ান। আর ডায়ালগ বা সংলাপ সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে মিখাইল বাখতিন তাঁর ‘Discourse in the Novel’ রচনায় উল্লেখ করেন যে :

The living utterance, having taken meaning and shape at a particular historical moment in a socially specific environment, cannot fail to brush up against thousands of living dialogic threads, woven by socio-ideological consciousness around the given object of a utterance, it cannot fail to become an active participant in social dialogue. After all, the utterance arises out of this dialogue as a continuation of it and as a rejoinder to it—it does not approach the object from the sidelines. (Bakhtin, 1981 : 277)

অর্থাৎ, কথোপকথনের মধ্যদিয়েই নির্দিষ্ট সামাজিক ও ঐতিহাসিক বোধ থেকে উৎসারিত বক্তব্য বা বয়ান সংলাপ হয়ে উঠতে পারে। এটিকে রচনার স্বকীয় ও সামগ্রিক দর্শনের স্বতন্ত্র সারবত্তা হিসেবে উপলব্ধি করে নেওয়া যায়। সুতরাং, জীবনানন্দ দাশের রচনা অংশত নির্ভরশীল এর গল্পবস্তুর এবং সামগ্রিকভাবে নির্ভরশীল তাঁর দর্শনভাবনার শিল্পিত প্রকাশে। এভাবেই, তাঁর দার্শনিকতা কথাসাহিত্যে সাহিত্যিক প্রতিরূপ হিসেবে সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে।

২ উপন্যাসের প্রকরণে ভাবপ্রাধান্য

লেখক এবং ন্যারেটরের অবস্থান বা দৃষ্টিকোণ এবং তাদের বয়ানের সংশ্লেষের কারণে জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসে ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসরের কথোপকথন তৈরি হয়। আর সেখানে লেখক বা ন্যারেটর এবং চরিত্রগুলো স্থান-কাল ভেদে ক্রিয়াকলাপ সীমিত হয়ে পড়ে। তাই, তাঁর উপন্যাসে আখ্যানের বিকাশ কেবল ঘটনা বা বস্তুগত বা স্থান-কাল-পাত্রের ভেদেই সাধিত হয় না, পাশাপাশি তা সাধিত হয় কথা, কথোপকথন, বক্তব্য ইত্যাদির ধারাবাহিকতার মাধ্যমেও। *কারুবাসনা* (১৯৩৩), *জীবনপ্রণালী* (১৯৩৩), *মাল্যবান* (১৯৪৮), *জলপাইহাটি* (১৯৪৮), *বাসমতীর উপাখ্যান* (১৯৪৮) প্রভৃতি উপন্যাসে আখ্যান বস্তুগত ধরাপ্রবাহের তুলনায় কথোপকথন বা ভাবগত ধরাপ্রবাহের মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়। জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্পের ভাবগত স্বরূপ উপস্থাপন প্রসঙ্গে সমালোচক উল্লেখ করেন :

জীবনানন্দ রূপকে পেরিয়ে কীভাবে ভাবকে অবলম্বন করেছেন, সেই ভাব যেখানে স্বামী আর সমাজ বারংবার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে, যেখানে প্রকাশের লীলা থেকে কেবলই বেরিয়ে আসতে চায় প্রকাশের লয়। (সুভাষ, ২০১৭ : ১২৯)

একইভাবে জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসের অভিপ্রেত শৈলী প্রসঙ্গে বলা যায় যে, উপন্যাসগুলোর অবলম্বন এর ভাব, কাহিনির বৈচিত্র্য নয়। আর, তাঁর কথাসাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসসমূহে ঘটনার ধারাপ্রবাহ মুখ্য নয়। এর অভিপ্রেত হলো ভাবের ধারাপ্রবাহ বা বিকাশ। তাঁর বিবেচনায় নভেল বা উপন্যাসের দুটি স্পষ্ট ধরন রয়েছে। ‘The Novel in Bengali’ প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ‘one, almost wholly occupied with the story and the other, a trifle perfunctorily with it, choosing to transmit a variety of discourses through it.’ [জীবনানন্দ (৪র্থ খণ্ড), ২০১৭ : ৬৬৪] জীবনানন্দ দাশ তাঁর পথ হিসেবে কোনটিকে পরিগ্রহণ করেন তা-ই আলোচ্য।

২.১ প্রकरणে নভেল-চিন্তা

উপন্যাস সংরূপগত কারণেই নাটকের সংলাপধর্ম, কবিতার কাব্যময়তা, গল্পের ভাবসংহতি প্রভৃতি শক্তিকে নিজের কাঠামোতে ধারণ করতে পারে। শিল্প ও সাহিত্য মানুষের মনজগতেরই প্রতিভূ। উপন্যাসে সক্রিয় মনোজগত তৈরি হয় সমাজ, সংস্কৃতি, স্থান-কাল, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সমন্বিত প্রতিক্রিয়ায়। জীবনানন্দ দাশ তাঁর ‘The Future of the Novel’ শীর্ষক রচনায় উপস্থাপন করেন যে, ‘it is a story of deep human interest.’ [জীবনানন্দ (৪র্থ খণ্ড), ২০১৭ : ৬৭৩] উপন্যাস ও নভেলের মধ্যেও এই উৎসমূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। পাশ্চাত্যের যন্ত্রসভ্যতার শিল্পবিপ্লবের মধ্যদিয়ে উৎপন্ন হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যার প্রতিচর্চার সূত্রে শুরু হয় নভেল রচনা। অপরদিকে, বাংলা সাহিত্যে নভেলের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে উপন্যাসচর্চা শুরু হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় উপন্যাস আর নভেলের অন্তর্গত স্বভাব ভিন্ন ধারণা হাজির করে। উনিশ শতকে উপন্যাস নগরকেন্দ্রিক জীবনের সংকট ভাবনা, উপনিবেশ নিয়ন্ত্রিত শাসনযন্ত্রের উপজাত অর্থনীতি ও সমাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিপতিত মানুষের জীবন সংকট, দ্বিধাগ্রস্ত মনন থেকে উদ্ভূত হয়। ‘উপন্যাস’ শব্দের ব্যুৎপত্তিতে পাওয়া যায় {উপ+নি+অস্+অ(ঘঞ)}, এর মধ্যে ‘ন্যাস’ বা {নি+অস্+অ(ঘঞ)} দ্বারা নির্দেশ করা হয় গচ্ছিত বিষয় বা বস্তু, বা এগুলো রক্ষা করা বা এগুলো রক্ষা করার ভার, বা ভার অর্পণ করা; এর পূর্বে ‘বি’ উপসর্গ যুক্ত হলেই নির্দেশিত হয় সুন্দরভাবে রচনা বা গ্রন্থন (এনামূল হক, ২০১০ : ১৬৬, ৭০৭, ৮৭৭) ইত্যাদি। আর এই সূত্রে যদি ‘উপ+ন্যাস’ দ্বারা বিশেষভাবে কোনো ভাব বা ভাষা বা শিল্প সংরূপের গ্রন্থন ও সমন্বয়কে নির্দেশ করা হয়, তাহলে উপন্যাস একটি উদার ও বিস্তৃত ধারণার শিল্পসংরূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ শতকের রুশ চিন্তক মিখাইল বাখতিন [Mikhail Bakhtin (1895-1975)] তাঁর ‘Discourse in the Novel’ প্রবন্ধে উপন্যাসকে সংজ্ঞায়িত করতে উল্লেখ করেন যে :

The novel can be defined as a diversiry of social speech types sometimes even diversiry of languages and a diversiry of individual voices, artistically organized. (Bakhtin : 1981 : 262)

জীবনানন্দ দাশের সমকালীন এই চিন্তক মনে করেন যে, উপন্যাসের ভাষা হতে পারে সামাজের ভাষিক রূপ বা কোনো গোষ্ঠীর ভাষাচেতনাজাত বা কর্তৃত্বের ভাষা ইত্যাদি। একইসঙ্গে, উপন্যাসের ভাষা এমন একটি ভাষা-সমগ্র যা নির্দিষ্ট সময়ের সমাজ-রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করে। এটির একটি সময়গত অন্তিত্ব বা গুরুত্ব থাকতে পারে এবং তা সমাজমানসের অভ্যন্তরীণ স্তরবিন্যাসকে রূপায়িত করতে পারে। দুটি ভিন্ন ভূখণ্ডে অবস্থান করে সমসময়ে মিখাইল বাখতিন এবং জীবনানন্দ দাশ নভেলের অন্তর্গত স্বভাবকে পর্যালোচনা করেন। মিখাইল বাখতিন নভেলের কন্টেস্ট ও সমাজ-রাজনৈতিক ভূমিকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। আর জীবনানন্দ দাশ সেখানে অন্বেষণ করেন ‘deep human interest’। অর্থাৎ, গল্পের আড়ম্বর নয়, তাঁর অভিপ্রেত বিষয় ও প্রকরণ হলো ‘মানুষ’ ও ‘মানব’। একারণে তিনি জ্যাঁ পল সার্ত্রের [Jean-Paul Sartre (1905-1980)] ‘Stream of consciousness’র শিল্পমূল্য নির্দেশ করেন। নির্দেশ করেন তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকর্মের ‘singleness of purpose’ যা অর্জিত হয়েছে তাঁর ‘individual talent’র মাধ্যমে। জীবনানন্দ দাশ সচেতনভাবে নভেল রচনা করতে প্রচেষ্টা ছিলেন। তিনি তাঁর লেখনিতেই নভেল ও উপন্যাসকে স্বতন্ত্র শব্দে উপস্থাপন করেন। তাঁর *কারুবাসনা* উপন্যাসে লিখিত আছে যে :

গত বছর কলকাতায় যখন পঁচিশ টাকা টিউশন করি, ট্রাম-সিনেমা ও চায়ের পথ এড়িয়ে, খুব একটা সাদাসিধে মেসের জীবন্যুত অবস্থার ভিতরে থেকে কয়েকখানা বই কিনতে পেরেছিলাম: ইংরেজ কবিতার বই দুটো, একখানা আমেরিকান উপন্যাস গত শতাব্দীর, একখানা নভেল এবং আরো দু-তিনখানা বই। [জীবনানন্দ (২য় খণ্ড), ২০১৭ : ২৩৯]

উদ্ধৃতাংশ থেকে প্রতিভাত হয় যে, লেখকের নিকট ‘নভেল’ এবং ‘উপন্যাস’ দুটি স্বতন্ত্র শিল্পকাঠামো।

এদের মধ্যে ধারণাগত স্বাতন্ত্র্যও বিদ্যমান। ‘উপন্যাস’ের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘Novel’এর উৎস ইতালীয় শব্দ ‘Novella’র মত কেবল ‘the plural of Latin novellus, a late variant of novus, meaning “new”’ অর্থাৎ স্বকীয় সৃষ্টি মাত্রেরই ধারণা। পাশাপাশি এই সাহিত্য সংরূপে তাঁর সমকালকে ও সময়ের বোধকে হাজির করার প্রয়াস লক্ষণীয়। একটি সময়কে সম্পূর্ণভাবে ধারণা করার অভিপ্রায় তার নভেলে লক্ষণীয়। উপন্যাসের মতন ডায়ালগ আখ্যান, তথ্য, কাল ও সময়ের বিস্তার প্রভৃতি তার উপন্যাসের উপাদান নয়। তার উপন্যাসের উপাদান ভাব বা একটি সক্রিয় চিন্তারূপিণী এবং Novelty of Life. টমাস হার্ডি [Thomas Hardy (1840-1928)] যেমন মনে করতেন সাহিত্যকর্মে জীবনদর্শন প্রকাশিত হওয়াটা একটা ব্যথির মতন, তেমনি জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসে দর্শনের পূর্ণরূপ হাজির হয় না। জীবনানন্দ দাশের দিনলিপিতে টমাস হার্ডির সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে ব্যাপক পরিসরে পর্যবেক্ষণ উপস্থাপিত আছে। তাঁর চিন্তার সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের চিন্তাসম্বন্ধ নিরীক্ষণ করলে চিন্তাগত পারম্পর্য উপলব্ধ হয়। ফলে, *কারুবাসনা*র হেম তথাকথিত ‘বার্থ’ ব্যক্তিসত্তা, কিন্তু তার

বিশ্বাসে জীবনের সার্থকতা কেমন বা কারাবাসনা মানুষে জীবনকে কোন পথে পরিচালিত করতে পারে, বা কোন স্থানে স্থাপন করতে পারে তার কোনো নির্দেশা বা উপস্থাপনা উপন্যাসে নেই। জলপাইহাটিতেও ‘পরিশেষে’ কোনো মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেই। সেখানে প্রতিভাত হয় যে, জীবন কেবল যাপন করে যাওয়ার প্রক্রিয়া মাত্র। সত্তার অন্বেষণে কেবল আত্মবিশ্লেষণ করে যাওয়া। ফলে, জীবনানন্দ দাশের অভিলক্ষ্য নভেল, উপন্যাস নয়।

২.২ প্রকরণে ভাষিক ভাবচিত্র

মানুষের জীবনের নাগরিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক বিবিধ কোণের ভাষা ও বাণীভঙ্গি স্থান লাভ করতে পারে উপন্যাসে। এর বহুকৌণিক ভাষা বা ‘heteroglossia’ তৈরি হয় লেখকের ভাষা, কথকের ভাষা, চরিত্রসমূহের ভাষা এবং সর্বোপরি বিবিধ সাহিত্য সংরূপ (কাব্যময়তা, সংলাপধর্মিতা ইত্যাদি) এবং ক্ষেত্রবিশেষে দার্শনিক যুক্তিতর্কমূলক ভাষারূপ বা সংবাদপত্রের ভাষা, স্লোগান বা প্রপাগান্ডাধর্মী ভাষা-প্রকৃতির সমন্বয়ে। (Bakhtin : 1981 : 263) মিখাইল বাখতিনের চিন্তাসূত্রেই প্রকাশ হয় যে, উপন্যাসে একক বা একরৈখিক ভাষারূপ যেমন থাকতে পারে, আবার থাকতে পারে বহুকৌণিক ভাষারূপ। মূলত এদুই রীতির যৌথতাতেই উপন্যাসের ভাষা প্রকৃতি নির্ধারিত হতে পারে। জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসে যখন চরিত্রগুলোর চিন্তাজগতের অবিশ্রান্ত প্রবাহ উপস্থাপিত হয়, তখন এই উপস্থাপনা বাংলা উপন্যাসের বিশতরঙ্গী ধারবাহিকতায় একটি অনিবার্য শিল্পস্বাতন্ত্র্য ধারণ করে। তাঁর প্রথম পর্যায়ে (১৯৩১) লিখিত উপন্যাস *জীবনপ্রলালী*তে লেখক এর কথক চরিত্র শতাব্দীর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বিলীন হতে সচেষ্ট। এই ভাষিক অবস্থান থেকেই অপর বিচিত্র চরিত্র অঞ্জলি, রাজেন, অভয় ইত্যাদির সঙ্গে কথোপকথন উপস্থাপিত হয়। উপন্যাসের বিকাশচিত্র অন্বেষণের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যে, কথোপকথনের সূত্রেই আখ্যানের ক্রমবিকাশ সম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু, এই বিকাশ মূলত ভাবগত ক্রমবিকাশ। আর কথোপকথন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতি হয় সংলাপে। যেমন অঞ্জলির সঙ্গে কথকের মিলা আর্জলিসের উদ্দেশ্যে রচিত গ্যায়টের চিঠি ও মিনার উদ্দেশ্যে রচিত সাদের চিঠির প্রতিলিখন বিষয়ক কথোপকথনের ক্ষেত্রে কথক উক্তি করে, ‘—‘আমরা অত্যন্ত চামার হয়ে পৃথিবীর পথে ফিরছি’—’ [জীবনানন্দ (২য় খণ্ড), ২০১৭ : ৩৯৯] আবার একই কথার সূত্রে কথক চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে উক্তি করে, ‘—‘আমার অনেক সময় কিন্তু মনে হয় একটা শালিখ বা চড়াইও অনেক মানুষের চেয়ে ঢের বড়ো’—’ [জীবনানন্দ (২য় খণ্ড), ২০১৭ : ৩৯৯] উল্লিখিত দুটি বক্তব্যই স্থান-কাল আর পাত্রের পরিসীমা অতিক্রম যায়। এর মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় বিশেষ বোধ ও শিল্পব্যঞ্জনা। জীবনানন্দ দাশের প্রতিটি গদ্যসাহিত্যে বিশেষত তাঁর কথাসাহিত্যে এই ভাষারীতি ও অর্থদীপ্তি বিদ্যমান। তাঁর উপন্যাস *মাল্যবানের* শিল্পরীতি প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেন :

প্রকৃত প্রস্তাবে *মাল্যবান* উপন্যাস নিজেই একটা কন্টেক্সট। উপন্যাসের ছককে অতিক্রম করে যাওয়ার একটি কন্টেক্সট। বাংলা ভাষায় এখনো অদি সবচেয়ে গভীর, জটিল এবং তীব্র শিল্পী জীবনানন্দ দাশ সে কন্টেক্সটকে অবলম্বন করে তাঁর নিজের লেখা লিখে চললেন। লেখা, যা একটা উপন্যাসকে অতিক্রম করে যায়, সব উপন্যাসকে, শুধুই নতুন-নতুন অর্থের জন্ম দিতে থাকে, লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও। (ত্রিদিব, ২০২৩ : ৮১৬)

সমালোচকের উদ্ধৃত কন্টেক্সট হলো লেখকের চেতনার প্রগাঢ়তা। উপন্যাসে লেখকের কবিচেতনার প্রগাঢ়তা এবং একই সঙ্গে অভিজ্ঞতাজাত প্রজ্ঞা তাঁর এই ভাষাদর্শন সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। ফলে, কন্টেক্সট ও রচনার ভাবচেতনাই উপন্যাসের কাঠামোর ও এর অর্থশৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণ করে, অতিক্রম করে যায়। লেখক গদ্যসাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর ‘লেখার কথা’ শীর্ষক রচনায় উল্লেখ করেন যে, ‘গদ্য শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা ছাড়া প্রায়ই সময়েরও প্রয়োজন হয়।’ [জীবনানন্দ (৪র্থ খণ্ড), ২০১৭ : ৬০৩] কালকে অতিক্রম করে যেতে লেখককে সব চেয়ে বেশি কালসচেতন হতে হয়। আর, ‘সুন্দর ‘বিশেষ’-কে আশ্রয় ক’রে বিশেষ কালের দ্বারা ‘বিশেষ’-রূপে চিহ্নিত হয়। শিল্পের উপজীব্য সামান্য নয়, বিশেষ মাত্র।’ (সুধীর, ২০১৪ : ৪৬) ফলে, জীবনানন্দ দাশের সমকালের জীবনসংকটই তাঁকে কেবল বস্তুগত কাহিনি ও চরিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্যের প্রতি মনোযোগী হতে বাধা দেয়। তাই তাঁর কথাসাহিত্য বস্তুগত কাহিনির ও চরিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্যের সামান্যতাকে অতিক্রম করে যায়। আর এর স্থলে রুচি আর জীবনদর্শনের উন্মোচনকারী ভাব লেখকের সমগ্র কথাসাহিত্যের অভিলক্ষ্যে পরিণত হয়। মূলত ভাষা জীবনানন্দ দাশের রচনাকর্মের আধার ও আধেয়, যা তাঁর কথাসাহিত্যের অন্যতম সাবজেক্ট।

উপন্যাসের অপর একটি উপস্থাপন শৈলী হলো স্বর সৃষ্টি করা। সাধারণত চরিত্রের কথোপকথন এবং লেখক বা কথকের দৃষ্টিকোণ, দর্শন উপলব্ধির সাপেক্ষে প্রতিভাত স্বতন্ত্র অবস্থানগুলোই উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন স্বর ও সুর সৃষ্টি করে। যেমন *জীবনপ্রণালী*তে কথকের দৃষ্টিকোণ থেকেই উপন্যাসের পরিবেশ ও ভাবাবহের উপস্থাপন অভিব্যক্ত হয়। যুগপৎভাবে অঞ্জলি, অমল, অভয়, চন্দ্রনাথ প্রমুখের স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণও ভিন্ন ভিন্ন স্বর সৃষ্টি করে। যেমন চন্দ্রনাথের বিবেচনায় কথকের লেখার সমালোচনা উপস্থাপিত হয় :

...বালগঙ্গাধরের সম্বন্ধে লিখেছিলে—তাঁর মৃত্যুর তারিখ ছিল সেদিন। সে লেখা তোমার আমি পড়েছিলাম—ইংরেজির ভুল ছিল না—কিন্তু বিচারের চেয়ে কল্পনার চাতুরি ছিল ঢের বেশি; নিজেকে ঢের আত্মপ্রতারিত করেছিলে—’ [জীবনানন্দ (২য় খণ্ড), ২০১৭ : ৩৬৫]

এক্ষেত্রে সমালোচনার মাধ্যমে দৃষ্টিকোণের ভিন্নতা উপস্থাপিত হয়। যদিও সবগুলো চরিত্রের ভাষাভঙ্গি আর বাক্যগঠনের প্রণালী অভিন্ন, কথকের অনুরূপ (যা মূলত লেখকেরই ভাষারীতি), কিন্তু জীবনানন্দ দাশের প্রতিটি রচনাতেই এমনকি কবিতার ভাষাভঙ্গি, বাক্যগঠন প্রণালীও অভিন্ন রীতির। এই রীতিতে ‘সে লেখা তোমার আমি পড়েছিলাম’ বাক্যটি বাংলা বাক্যের প্রচলিত পদক্রমানুগ হলে হবে, আমি তোমার সে/

সেই লেখা পড়েছিলাম। ত্রিয্যাপদটিকে বাক্যের শেষে যথাস্থানে রেখে বাক্যমধ্যে কর্তা, কর্ম ইত্যাদিকে ভাবানুসারে সজ্জিত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় বাক্য তৈরি করা হলে, বাক্যের অর্থের নানা মাত্রা ও বিশেষ অর্থপূর্ণতা উৎপন্ন হয়। যেমন, কর্তা বাক্যের শুরুতে থাকলে সেখানে কর্তার বা বস্তুর ভাবের প্রতি বিশেষ ঝোঁক সৃষ্টি হয়। কিন্তু কর্মপদ ‘তোমার’ এবং ‘তোমার সে লেখা’ বাক্যের শুরুতে থাকায় বাক্যের ঝোঁকের স্থানটি যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমনি কর্মটিই হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ অভিলক্ষ্য। একইসঙ্গে এই রীতির বাক্য রচনাকর্মে ভাববাচ্য এবং যুগপৎভাবে ভাবপ্রধান্য তৈরি করে। এই ভাষাভঙ্গির পাশাপাশি বিশেষ কিছু শব্দের ব্যবহার এই লেখকের রচনায় বিদ্যমান। যেমন পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে ‘ঢের’ শব্দটি স্বল্প পরিসরেই দুইবার ব্যবহৃত হয়েছে। অপর উপন্যাস *কারুণ্যবাসনা*তে লেখক ও কথকের যৌথস্বরে সৃষ্ট চরিত্র হেম। তাকে তার পিতা জীবন সম্পর্কে প্রগাঢ় মন্তব্য করার উদ্দেশ্যে বলেন :

পৃথিবীতে টিকে থাকবার নিজের আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও আত্মার কাছে মর্যাদা পেয়ে টিকে থাকবার এই রকম সব বিধিব্যবস্থা আছে, এসব না থাকলে জীবনের নিঃসম্বলতা বড়ো ভয়াবহভাবে দুর্বিসহ হয়ে উঠত। শুধু কথা ভাবা, শুধু স্বপ্ন নিয়ে খেলা করা। কিন্তু তবুও এসবের ঢের মূল্য আছে।
[জীবনানন্দ (২য় খণ্ড), ২০১৭ : ২৬৯]

এখানেও রয়েছে জীবনানন্দ দাশের স্বকীয় বাকরীতি। একইসঙ্গে ভাষার অন্তর্গত ভাবনায় রয়েছে জীবনের গতিপ্রকৃতি ও অভিযাত্রার ভাবোন্মোচন। শব্দ ও ভাব প্রয়োগের এসব রীতির সমন্বয়ে তৈরি হয় তাঁর নিজস্ব ভাষাশৈলী। আর ভাষাশৈলীর বিশিষ্ট প্রয়োগে জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যে উন্মোচিত হয় স্বকীয় দার্শনিক বোধ। ‘লেখার কথা’ শীর্ষক রচনায় যদিও জীবনানন্দ দাশ উল্লেখ করেন যে, ‘গদ্য লেখবার সময় লেখকের চেতনার অতটা গাঢ় মছন প্রায়ই হয় না—কবিতা লেখার সময় যেমনটা হয়।’ [জীবনানন্দ (চতুর্থ খণ্ড) ২০১৭ : ৬০৩] কিন্তু, তাঁর কথাসাহিত্যে এই ‘চেতনার গাঢ় মছন’ বিশেষভাবেই প্রতিফলিত হয়, কিন্তু তা গদ্যমাত্রায়। লেখকের রচনাকর্মে চেতনার গাঢ় মছন জীবনের সফলতা ও নিষ্ফলতা, চেতনার ও বোধের পরিচর্যা সর্বোপরি সংস্কৃতির চর্চাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। যেমন *কারুণ্যবাসনা* উপন্যাসে পিতার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে উপন্যাসের প্রটোগনিস্ট চরিত্র হেমের জীবনচেতনার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হেম ও তার পিতার কেথোপকথন নিম্নরূপ :

—‘মুহুর পর কী আর থাকে?’

—‘থাকে বৈকি; সমস্তই থাকে; আরো গভীর অধ্যাত্মিকভাবে থাকে, উপনিষদের—’

—‘উপনিষদ যাঁরা তেরি করেছেন তাঁরা পরলোক থেকে ফিরে এসে রচনা করেননি তো; রক্তমাংসের শরীরে ইহকালে বসে যে ধারণা তাদের ভালো লেগেছে তাই ব্যক্ত করে গেছেন; তাদের বিশ্বাসে আশস্ত হবার কোনো কারণ দেখি না।’ [জীবনানন্দ(দ্বিতীয় খণ্ড), ২০১৭ : ২৬৬]

জীবনের উদ্দেশ্য আর কর্মপরিধির উপলব্ধি প্রসঙ্গিতা পায় উদ্ধৃতাংশে। জীবনের ভাবোন্মোচনই জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যের বিশেষ প্রাণপ্রতীমা। ভাষাভঙ্গি এর আশ্রয়। এক্ষেত্রে উদ্ধৃতাংশের সূত্রানুসারে উপনিষদ জীবনানন্দ দাশের জীবন ও শিল্পের বিশেষ আখর।

২.৩ অঙ্গিকের উৎসমুখে উপনিষদ

উপনিষদভারতীয় জীবনবোধের বিশেষ আকড়। এর প্রসঙ্গ জীবনানন্দ দাশের রচনায় বারবারই ব্যবহৃত হয়েছে। *কারু বাসানা* উপন্যাসে হেমের পিতাকে উপনিষদের উল্লেখ করতে দেখা যায়। আবার *জীবনপ্রণালী* উপন্যাসে কথককে বিশেষভাবে ঈশোপনিষদের উল্লেখ করতে দেখা যায়। এর সূত্রসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে দেখা যায় যে, জীবনানন্দ দাশের জীবনবোধের বিকাশে উপনিষদের একটি বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। ‘আমার বাবা’ শীর্ষক রচনায় দেখা যায় তিনি পিতা সত্যানন্দ দাশ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে :

ভারতীয় দর্শন ও ভারতবর্ষের উপনিষদই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের বিষয় ছিল। ...প্রায় রোজ শেষরাতে—বিশেষত হেমন্ত ও শীতকালে উপনিষদের শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে তিনি আমাদের অপরূপ সূর্য-চেতনার প্রভাবে নিয়ে আসতেন। [জীবনানন্দ (চতুর্থ খণ্ড) ২০১৭ : ৬০০]

এটি কেবল পিতা সম্বন্ধে লেখকের তথ্যমাত্রই নয়। এটি একইসঙ্গে লেখক জীবনানন্দ দাশের মানসবিকাশের সূত্রও। কারণ উপনিষদের জীবনবোধ জীবনানন্দ দাশের মনোবিকাশের উৎসেই প্রথিত ছিলো। এর দর্শন তাঁকে সত্যদর্শী জীবনবোধে উন্নীত হতে বিশেষ সহায়তা করে। সাহিত্যকৃতির প্রতিটি পর্বে এবং পর্যায় লেখক জীবনানন্দ দাশের সংকটাকীর্ণ অন্ধকার সময়েবোধের সঙ্গে যুযুৎসা পাওয়া যায়। আত্মকে বুঝে নিয়ে তার উন্মোচনকে ধরে রাখার জন্য মানুষকে দারিদ্র্য তাড়িত, উপনিবেশ শাসিত সময়ের বিরুদ্ধে অবস্থান করতে হয়। বিরোধে অবতীর্ণ হতে হয় এর বিনষ্টীবোধের সঙ্গে। জীবনানন্দ দাশের এই শিল্পপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গে বলা যায় :

উপনিবেশিকতা সত্ত্বেও রেনেসাঁস-এনলাইটেনমেন্ট-রোমান্টিসিজমের উজ্জ্বল রশ্মি ও শক্তিমত্তাকে ব্যক্তিত্বসবল রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছিলেন আধুনিক নিঃসঙ্গ অথচ কর্মোদ্যোগী চরিত্রবত্তার মধ্যে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জীবনানন্দের নিমগ্নচেতন আবির্ভাব অরোমান্টিক প্রহরে, উপনিবেশের দীর্ঘস্থায়ী শোষণ-ক্ষয়ের বিনাশপটে; তাই তাঁর ক্ষেত্রে রাবীন্দ্রিক সূর্যচেতনা [উপনিষদিক প্রতিতিও বটে] জীবনের উত্তরণ ও অমৃত অভীক্ষার জন্য কোনো রকম কসমিক সত্তার অস্তিত্ব-আলোক অনুপস্থিত। (আকতার, ২০২৪ : ৭৪)

অনন্তবোধ জীবনানন্দে সময়ের স্বভাবেরই অনুরূপ। ভারতীয় অতীত উজ্জ্বল দর্শন ‘হাল ভেঙে’ দিশা হারানো নাবিক অন্বেষণ করেন বর্তমানতারই বিনির্মাণার্থে। ফলে, কসমকি সত্তার অনুসন্ধান অনুপস্থিত থাকলেও জীবনানন্দ দাশের প্রতিটি রচনাকর্মের ভাবগত পরিচালনা সেই বিরোধের প্রতিই পরিচালিত হতে দেখা যায়। কর্মকর্তব্য প্রসঙ্গে ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লেখ করা আছে যে :

কুর্বন্নেহে কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।

এবঙ তুয়ি নান্যথোহন্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

সরলার্থে : এই সংসারে যথাবিহিত কর্তব্য অনুষ্ঠান করিয়াই মানুষ শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে। হে মনুষ্য, এই প্রকারে কর্ম করিলে তুমি কর্মবন্ধনে লিপ্ত হইবে না। ইহা ব্যতীত অন্য পথ নাই। (উপনিষদ, ২০১৫ : ৮)

সুতরাং, মানুষের বিশেষ কর্ম মানুষকে ভাবায়। ভাবনা বা আত্মচেতনা মানুষের জীবনধারণের সার্থকতাকে উন্মোচিত করে। এই কর্ম মানুষকে দেয় সময়কে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রেরণা। অপরদিকে, আত্মচেতনাহীন শরীরী কর্মসংগ্রাম কেবল মানুষকে বস্তুজীবনের প্রতি করে তোলে প্রলুব্ধ। জীবনানন্দ দাশের জীবন ও সাহিত্য পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, যে কর্মবন্ধ আত্মাকে সংকীর্ণ করে ফেলে, যে কর্মের মাধ্যমে কেনো আত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয় না, তেমন কর্মবন্ধনকে তিনি এড়িয়ে চলেন, তার বিরোধিতা করেন। যে কর্ম কেবল বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনে করা হয়, তেমন কর্ম তিনি ও তাঁর কথাসাহিত্যের চরিত্ররা অস্বীকার করে সর্বদাই।

৩ শিল্পীমনে ব্রাহ্মসমাজ ও উপনিবেশিত সংস্কৃতির পটভূমি

জীবনানন্দের নায়কদের সংকটের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো নগর ও গ্রাম জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা। এর বিপরীতে, তাঁর চিন্তার উৎকর্ষ সাধিত হয় অভিজ্ঞতা আর প্রজ্ঞার সুসমন্বয়ে। সেখানে কবিতার চর্চায় প্রয়োজন হয় চেতনার গাঢ় মন্বনের। চেতনার চর্চা, ভাবনার চর্চা করাই লেখকের জীবনের একটি প্রকৃষ্ট কর্ম। *কারু বাসনায়* হেমের পিতা নিতান্ত অর্থনৈতিক দীনতাকে স্বীকার করে হলেও আত্মা ক্ষতিগ্রস্ত ‘চিমসে হয়’ এমন কর্মে প্রবৃত্ত হতে হেমকে নিরুৎসাহিত করেন। এর সূত্রে প্রতিভাত হয় যে, জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য যে দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত হয়, সে দ্বন্দ্ব মূলত উপনিবেশিত সময়ের সংস্কৃতি ও অর্থনতির সংকটজাত। লেখকের বয়ানে উন্মোচিত সংকটচিত্র তাঁর সাংস্কৃতিক রুচিরই বহিঃপ্রকাশ। এই রুচি মূলত তাঁর জীবন ও চেতনার ‘সত্য দর্শনের’ও অভিপ্রায়। [জীবনানন্দ (চতুর্থ খণ্ড), ২০১৭ : ৬০০] রুচি আর সুচেতনার দৈন্য জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যের চরিত্র সৃষ্টিকে গভীর ও বিচিত্র করে তোলে। নরনারীর পারস্পরিক হৃদয়গত ও পারিবারিক সম্বন্ধ এক্ষেত্রে একটি বিস্তৃত গল্পবস্তু। কিন্তু প্রাত্যহিক সম্পর্কের তুচ্ছ অভিঘাত ও তার কোলাজধর্মী সংমিশ্রণে বোধনির্মিতির কেন্দ্রীয় আকর্ষণ অনুভব করা যায়। এক্ষেত্রে অন্তর্ভবনে গভীরতর চেতনানিমগ্ন মানুষের বর্হিবাস্তব ও অন্তর্বাস্তবতার সমন্বয় অন্যতম শৈল্পিক প্রশ্ন ও মীমাংসা। এছাড়াও পারিবারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ বিবিধ চরিত্র এবং সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ তাঁর সাহিত্যকর্মের আখ্যানে উপস্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় সীমানাও বজায় রাখা হয়। যেমন শিক্ষক, বিগত সময়ের রাজনীতিকর্মী, অর্থনৈতিক দিক থেকে সফল চাকুরিজীবী বা ব্যবসায়ী, গার্হস্থ্য নারী, স্বল্পমাত্রায় কর্মজীবী নারী, কলেজ পড়ুয়া নারী প্রভৃতি। এসকল চরিত্রের মধ্যে কেবল রুচি ও চেতনার দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যে কথক বা বয়ানকারী চরিত্রগুলো বা প্রটাগনিস্ট শক্তিসমূহ যেমন হেম, নিশিথ, সিদ্ধার্থ, মাল্যবান, শচীন এরা অর্থনৈতিক মানদণ্ডে ভীষণভাবে দীন হলেও এদেরকে রুচিগত বিচারে দীন হিসেবে স্তরভুক্ত করা যায় না। এরা নগর কলকাতার মধ্যবিত্ত মানুষ যারা একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী। একটি ঐতিহ্যময়,

সমৃদ্ধ অতীত চরিত্রগুলোকে আত্মিক শক্তি সঞ্চার করে। এই শক্তি নগরজীবনের নাগরিকতার সঙ্গে মধ্যবিন্ত মানসকে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হওয়ার উৎসাহ যোগায়। এক্ষেত্রে গ্রামজীবনকে অতিক্রম করে নগরজীবনে প্রথিত হওয়ার সংকট যেমন সক্রিয় থাকে, তেমনি পাশাপাশি বিদ্যমান থাকে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য এবং দেশভাগের, দেশত্যাগের অর্থাৎ আত্মভাগের যন্ত্রণাও। সেই সূত্রে লক্ষণীয় যে, জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যে সময় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়। এক্ষেত্রে সেখানে দুইটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। প্রথমটি হলো, প্রত্যক্ষভাবে সময়ের উপস্থাপন, যেমন ১৯৩৩ সালে রচিত *জীবনপ্রণালী* উপন্যাসে ১৯২৩, ১৯২৫ সালের স্মৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। একইসঙ্গে তা যে আট বছর পূর্বের প্রসঙ্গ তারও সবিশেষ উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও, ১৯৪৮ সালে রচিত *জলপাইহাটিতে* উল্লেখ করা হয়েছে ‘বড় দাঙ্গা’র প্রসঙ্গ। এটি মূলত ১৯৪৬ সালে সংঘটিত কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তাঁর উপন্যাসে সময় উল্লেখের সূত্রে লেখকের আখ্যানবস্তুর স্থান-কালকে সুনির্দিষ্টভাবেই চিহ্নিত করা যায়। দ্বিতীয়ত, পরোক্ষভাবে সময়ের উপস্থাপন, যেমন প্রটাগনিস্ট চরিত্রগুলোর নির্মাণে লেখকের ব্যক্তিজীবনের কাঠামো এবং তথ্যের ব্যবহার করেন। এটি সর্বক্ষেত্রেই গল্পে ও নভেলে একটি আত্মজীবনীমূলক শৈলীকে আভাসিত করে। একে একটি শিল্পকৌশল হিসেবে বিবেচনা করা গেলে প্রতিভাত হয় যে, আত্মজৈনিকতা রচনাসমূহে স্বকীয় অর্থমাত্রা সৃষ্টির মাধ্যমে মনোযোগ-কেন্দ্র নির্মাণ করে। এটি বিশেষত লেখকের সমকালের সঙ্গে টেক্সটের আখ্যানকালকে সমন্বিত করে পাঠ করার সূত্র সৃষ্টি করে। পাঠ সাপেক্ষতা এবং পাঠকের প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে অনিবার্য। বাংলা কথাসাহিত্যে সাহিত্যিকর্মকে পাঠে উন্নীত করার এই প্রকৌশল শিল্পের সম্ভাবনা আর ক্ষেত্র উভয়কেই সৌকর্যমণ্ডিত করে তোলে। ফলে, এই দুটি সূত্রে, জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যকে তাঁর সমকালের সঙ্গে সমন্বিত করে পাঠ করা হলে, এর অন্তর্গত ঐতিহ্যসূত্রকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন বিশ শতকের প্রথমভাগে জটিলতর হয়ে ওঠে। এর অধ্যয়ন সূচিত হয় উনিশ শতক থেকেই। এই সাংস্কৃতিক অধ্যয়নকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা তৎকালের রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮), শ্রী অরোবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) প্রমুখের দর্শন ও চিন্তাসূত্রে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ তৎকালের সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার বিপরীতে বিশেষ প্রভাবক ভূমিকা পালন করে। ভারতীয় জীবনবোধের মূল অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বোধকে উপনিবেশিত করার প্রক্রিয়াকে ব্রাহ্মসমাজ বাধাগ্রস্ত করতে সচেষ্ট ছিলো। এটি যেমন তৎকালে ভারতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে বিনির্মাণমূলক ভূমিকা পালন করে, তেমনি সামগ্রিক উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়াকেও করে বাধাগ্রস্ত।

ব্রাহ্মসমাজের দর্শনের একটি অন্যতম প্রধান আকড় উপনিষদ, জীবনানন্দ দাশের জীবন ও সাহিত্যকর্মে যার প্রভাব প্রক্রিয়া পূর্বোল্লিখিতভাবে সক্রিয় থেকেছে। জীবনের চিন্তাপ্রকৃতি নির্ধারণে (বিশেষত একটি এমন জটিল ও উদ্ভাস্তরাজনৈতিক সময়ে; যখন উপনিবেশের প্রক্রিয়া মানুষকে হীনমন্যতা আর পরাধীনতার মানসিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে) এমন সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ তৎকালের মানুষকে মানসিক আশ্রয় নিশ্চিত করেছে। ‘এই পরিবর্তনের সারথি হয়েছিলেন উনিশ শতকে আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল মধ্যবিভ্র সম্প্রদায়। ... নতুন যুগের নতুন শহর কলকাতা হল পরিবর্তনের কেন্দ্র।’ (রাখালচন্দ্র নাথ, ২০১৬ : মুখবন্ধ) ফলে, এর সুফল ও অগ্রযাত্রায় তৎকালের সুবৃহৎ পরিসরের মানুষই বিযুক্ত ছিলো।

বাংলার চিন্তাকাঠামো ও দার্শনিক ভিত্তি নির্ধারণ এবং সাহিত্যিক প্রাঙ্গসরতা সৃষ্টিতে এই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বা পরিবর্তীত সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানসের ব্যক্তিবর্গ যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), রামতনু লাহিড়ি (১৮১৩-১৮৯৮), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। জীবনানন্দ দাশের পিতা, পিতামহ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত থেকে তৎকালে বরিশালের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং জ্ঞানচর্চায় ভূমিকা পালন করেন। (সিলি, ২০১১ : ২৩-২৭)। এছাড়াও, জীবনানন্দ দাশের মাতা তৎকালের একজন শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল ব্যক্তি। লেখকের মাতামহও সঙ্গীত ও দর্শনচর্চায় নিরত ছিলেন। [জীবনানন্দ, ‘আমার মা’ : ২০১৭ (চতুর্থ খণ্ড) : ৫৯৪-৫৯৭] ফলে, লেখকের মানসবিকাশের প্রক্রিয়ায় তৎকালের সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গসরতা বিশেষভাবে প্রথিত ছিলো। ফলে, উপনিবেশিত সমাজ আর রাজনীতি এবং এসবের উপজাত অধঃগামী বৃহত্তর পুঁজিবাদী সমাজমানসের ইত্যাদির অসামঞ্জস্যের আখ্যান তাঁর সাহিত্যচিন্তার গভীরে লালিত হয়।

৪ প্রগাঢ় মনীষার শিল্পভাষ্য

কথাসাহিত্যে আখ্যানের স্থানগত ও কালগত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূত্রে এর ভাষ্য বা বয়ান সৃষ্টি হয়। এই সূত্রের রূপান্তর মানুষের স্থানকাল সম্পর্কিত বোধেরই রূপান্তরের ফল। আর, বোধের রূপান্তর মানুষের প্রকৃত জীবনধারার পরিবর্তনের ফলেই ঘটে। বিপরীতক্রমে, মানুষের মূল জীবনধারার পরিবর্তন মানুষের বোধের সঙ্গে দ্বন্দ্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এখান থেকেই সৃষ্টি হয় জীবনানন্দ দাশের সাহিত্য সৃষ্টির প্রগাঢ় মনীষা।

জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যে উক্ত প্রগাঢ়তা তাঁর সাহিত্যদর্শনকে করে সত্যদর্শী আর তাঁর সাহিত্যভাষা হয়ে ওঠে শাস্ত্রতরুচির অন্তর্গত। একে তাঁর সাহিত্যকৃতির কেন্দ্রাতিগ শক্তি হিসেবে অভিহিত করা যায়। একইসঙ্গে, উপন্যাসের কাঠামোতে লেখকের বয়ান, কথকের বয়ান, প্রটোগনিস্ট চরিত্রের বয়ান এবং এদের সঙ্গে বিবিধ চরিত্রের নিজস্ব রুচি ও দৃষ্টি সৃষ্টি করে বিচিত্র ও বহুমুখী স্বর। লেখকের নিজস্ব ভাষাশৈলীতে এই সবগুলো

অবস্থান সৃষ্ট হতে দেখা যায়। সেকারণেই কথাসাহিত্যে লেখকের ভাষার একরৈখিকতা আর বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির চরিত্রের বহুমাত্রিকতা এই দুয়ের যৌথতাতেই সম্পন্ন হয়। গল্প আর নভেলের এই উপস্থাপনা সমকালের অবয়বহীন সমাজ ও সংস্কৃতিরই ভাষিক ভাবচিত্র। সুতরাং, জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য পাঠের বিশিষ্টতা এর বোধ ও ভাবনায়। পাশাপাশি কাব্যময় প্রাণাঢ় চিন্তা এই কথাসাহিত্যের প্রকৃতিধারক। আর, সংলাপায়িত বাকপ্রবাহ হলো যুক্তির বস্তুভিত্তি। জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য বিচিত্র সামাজিক বচন আর বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিগত বচনের শৈল্পিক গ্রন্থনা।

৫

জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যে ‘যে জীবন দোয়েলের ফড়িঙের’ সে জীবনকে যাপনের বোধ প্রতিচ্ছিত্রিত হয় এর চরিত্রদের মাধ্যমে। এজীবনকে চিহ্নিত করা যায় অত্যন্ত প্রাকৃতিক জীবন হিসেবে। এই জীবন একইসঙ্গে ভূমিসংলগ্ন মানুষের গোষ্ঠীমুখী জীবন। উৎপাদনের নিকটবর্তী এই প্রাকৃতিক জীবন সংঘাতহীন বা দুর্বিপাকমুক্ত নয়। এজীবনেও সংকট বিদ্যমান কিন্তু তা শিল্প ও পুঁজিতান্ত্রিক উপনিবেশিত জীবনের সংকটের ন্যায় মানবসৃষ্ট নয়। পুঁজিতান্ত্রিক উপনিবেশের সংকট মানুষের জীবনকে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত করে, তাই তা হয়ে পড়ে উন্মূল। দেশভাগের সংকট আর পুঁজিশক্তির উৎপীড়ণে জর্জরিত বাঙালি মানস জীবনানন্দ দাশ। একটি ইতিহাস ও ঐতিহ্যরঞ্জিত দ্বিখণ্ডিত আত্মা এই লেখকের ব্যক্তিমানসের নিজস্ব সম্পদ। ফলে এই দ্বিখণ্ডিত আত্মকে নিয়ে তিনি সাহিত্য ও মননের চর্চায় অবতীর্ণ হন, যার উৎসে থাকে প্রকৃতির সন্নিহিত, ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বোপার্জিত জীবন ও শিল্পবোধ। জীবনের আখরে এই লেখক কথাসাহিত্য চর্চা করেন। এক্ষেত্রে আভূমি স্পর্শোদ্যত ভাবের অভিব্যক্তি থাকে তাঁর কথাসাহিত্যের আত্মায়। এই আত্মা এবং আত্মার বোধ জীবনানন্দ দাশের সমগ্র কথাসাহিত্যে বিম্বিত রীতির উৎসমুখ। মনের আলো বা বোধ কমে আসে চোখের ভেতরের আলো দর্শনের ও অনুভবের শক্তির সীমিতির কারণে। জীবনের বোধ হলো এই চোখের ভেতরে আলো অর্থাৎ মানবের জীবনোপলব্ধির সক্ষমতা। এটির অভাবে জীবনকে যাপনের অর্থহীন আবর্তন তৈরি করে মানুষ। জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে এই মানুষের আত্মার পর্যবেক্ষণ বিদ্যমান। এই অন্বেষণের সূত্রে উন্মোচিত হয় জীবনানন্দ দাশের নন্দনচিন্তা। যে আত্মবোধ ও রুচির বোধ না থাকলে জীবনের কোনো অর্থময়তা সৃষ্টি হয় না এবং মানুষের জীবনে ভীষণভাবে উপলব্ধির অভাব দেখা দেয়; সেই বোধের অন্বেষণ ও উন্মোচনপ্রয়াস জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যের বিশেষ উপজীব্য।

টীকা

১. বিশ শতকের সাংস্কৃতিক পরিণতি দ্বারা, বিশ শতকে ব্রিটিশ উপনিবেশিত ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বোঝানো হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তা ইত্যাদির ভিত্তিতে দেশভাগ ও সাংস্কৃতিক বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা উপনিবেশিত ভারতের বাঙালি মননে যে জটিল ও বহুধাবিভক্ত সৃষ্টি হয় তা সমগ্র বাঙালির চেতনায় তীব্র সংশয় এবং দ্বিধার জন্ম দেয়।

২. ‘কবিতার কথা’ প্রবন্ধে উদ্ধৃতাংশের মূল ও পূর্ণ রূপ উল্লেখ করা হলো : কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনা এবং কল্পনার ভেতরে চিন্তা ও অজিতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করেছে। [জীবনানন্দ (তৃতীয় খণ্ড), ২০১৭ : ৫৪৯]।
৩. It seems improbable, however, that any social or political creed It seems improbable, however, that any social or political creed claiming to be scientific could impose itself on the novel in the way described above. [Novel]...it is a story of deep human interest. [Jibananda Das, ‘The Future of the Novel’, ২০১৭(৪র্থ খণ্ড) : ৬৭৩]
৪. <https://www.britannica.com/art/novel>.
৫. উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়ে থাকে। এতে রয়েছে বিশ্ব-রহস্যকে ভেদ করার আকুতি এবং তা থেকে সঞ্জাত জ্ঞানতৃষ্ণা। এই জ্ঞানতৃষ্ণাই পরবর্তীকালে আরণ্যকের যুগে প্রাধান্য পেয়েছিল এবং বিস্কন্ধ দার্শনিক জ্ঞানের অশেষণে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিল। তারই পরিণতি হল উপনিষদ। [হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘উপনিষদের দর্শন’, ২০১৫ : (ভূমিকা)]
৬. ‘ঈশা’ এই উপনিষদের প্রথম শব্দ; সেজন্য একে ঈশোপনিষদ বলা হয়। ঈশোপনিষদ ব্যতীত অন্যান্য সকল উপনিষদই বেদের ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের অংশ। এই উপনিষদখানি ভাবগৌরবে সর্বোৎকৃষ্ট উপনিষদগুলোর অন্যতম। (উপনিষদ, ২০১৫ : ৪)
৭. ১৮২৮ সালে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমাজ ব্রাহ্ম আন্দোলনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে অবসর গ্রহণের পরে তিনি কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন। রাখালচন্দ্র নাথ উল্লেখ করেন যে, ‘রামমোহন রায়ের ধর্মীয় সংস্কার ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের হাতিয়ার। (২০১৬ : ২)
৮. সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন দ্বারা ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য চর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দর্শনের এবং দৃষ্টিভঙ্গির নেতিবাচক প্রভাবকে নির্দেশ করা হয়েছে। ব্রিটিশ উপনিবেশিত ভারতীয় জীবনবোধের উপরে পাশ্চাত্যের জীবনদৃষ্টি প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে। ফলে সংঘটিত হয় সাংস্কৃতিক উপনিবেশ।
৯. ব্রাহ্ম আন্দোলন ব্রিটিশ শাসিত ভারতের রাজধর্ম খ্রিস্টধর্মের বিপরীতে অবস্থান করে অপর একটি একেশ্বর চিন্তার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ছিলো। এই ব্রহ্মচিন্তা বাংলার পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক চিন্তাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। এবং রামমোহন রায়ের এই রূপ ধর্ম সংস্কারের অভিপ্রায়কে পরবর্তীকালে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকে রহিত করার কৌশল হিসেবে বর্ণনা করা হয়। (বারিদবরণ ঘোষ, ২০০৯ : ২৩)।

সহায়কপঞ্জি

- এনামূল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত) (২০১০)। ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
- অতুল চন্দ্র সেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত) (২০১৫), উপনিষদ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
- জীবনানন্দ দাশ (২০১৭)। জীবনানন্দ-রচনাবলি; প্রথম খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা।
- (২০১৭)। জীবনানন্দ-রচনাবলি; দ্বিতীয় খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা।
- (২০১৭)। জীবনানন্দ-রচনাবলি; তৃতীয় খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা।

———— (২০১৭)। *জীবনানন্দ-রচনাবলি*; চতুর্থ খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা।

———— (২০১৭)। *জীবনানন্দ-রচনাবলি*; পঞ্চম খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা।

———— (২০১৭)। *জীবনানন্দ-রচনাবলি*; ষষ্ঠ খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা।

ত্রিদিব সেনগুপ্ত (২০২৩)। *রাজনৈতিক অর্থনীতি উত্তর উপনিবেশিক পাঠ ১*। কেতাব, কলকাতা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৪২২ বঙ্গাব্দ)। *ছোটগল্পের সীমারেখা*। প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

বারিদবরণ ঘোষ (২০০৯)। *ব্রাহ্মসমাজের সর্গক্ষণ ইতিহাস*। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বেগম আখতার কামাল (২০২৪)। *কবির উপন্যাস*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

মুনতাসীর মামুন, (২০১৭)। *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলন*। অনন্যা, ঢাকা।

সুধীর কুমার নন্দী (২০১৪)। ‘স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা’। *শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব* [সম্পা. প্রদীপ কুমার নন্দী], অবসর, ঢাকা।

সুভাষ ঘোষাল (২০১৭)। ‘জীবনানন্দের ছোটগল্পের আধুনিকতা’। *এই সময় ও জীবনানন্দ* [সম্পা. শঙ্খ ঘোষ], সাহিত্য আকাদেমি, কলকাতা।

হিরন্ময় বেন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৫)। ‘উপনিষদের দর্শন’। *উপনিষদ* [সম্পা. অতুল চন্দ্র সেন ও অন্যান্য], হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

সিলি, ক্রিস্টিন বি (২০১১)। *অন্য জীবনানন্দ*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

রাখাল চন্দ্র নাথ (২০১৬)। *উনিশ শতক ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়*। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০১৫)। *মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব*। অবভাস, কলকাতা।

রামমোহন রায় (২০১৭)। *রামমোহন রচনাবলী*। রামমোহন মিশন, কলকাতা।

Bakhtin, M. M. (1981). *The dialogic imagination*. (Edit. Michael Holquist), University of Texas press, Austin, USA.

<https://www.britannica.com/art/novel>

শিবলী আজাদ (২০২৩)। ‘পঠনের রাজনীতি ও জীবনানন্দ দাশ: ক্যানোনাইজেশন এবং বর্ণহিন্দুর অর্গানিক সমাজের স্বপ্ন’। *তত্ত্বালাশ*, সংখ্যা : ৭, জুন, ২০২৩ ঢাকা।

সাহিত্যিক

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬ ব. ॥ ১৯৫৯ খ্রি.

ru.ac.bd/bangle/bangle-journal-shahittyki

Print : ISSN 1994-4888

বর্ষ : ৬৬ সংখ্যা : ৫৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ ॥ মে ২০২৫

প্রকাশকাল : মে ২০২৫

প্রবন্ধ জমা : ২৫ মার্চ ২০২৪

প্রবন্ধ গৃহীত : ০৬ নভেম্বর ২০২৪

পৃষ্ঠা : ১৬৯-১৮৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প : বাস্তবত্বের সফল রূপায়ণ

নিলিমা শীল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি মহাবিদ্যালয়, উত্তরা, ঢাকা
ই মেইল : nilimaswriteups@gmail.com

সারসংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা ছোটগল্প বাঙালি জীবনের অপরিহার্য অংশ। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের সমন্বয়েই যে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট- সাহিত্যে সেই সমগ্রের চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি, পটভূমি বা অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও প্রকৃতি যে জীবনের অপরিহার্য অংশ, তার সঙ্গে মানুষের ওতপ্রোত যোগ, প্রকৃতি যে মানুষের পরিচালক, প্রভাবক, বন্ধু, কখনো আবার মানুষের প্রভাবে প্রকৃতিও প্রভাবিত হয়, সেটা রবীন্দ্রনাথই প্রথম তাঁর ছোটগল্পে রূপায়িত করেছেন। মানুষ ও প্রকৃতির এই সমন্বিত জীবন, পরিবেশ বিজ্ঞানের ভাষায় ‘বাস্তবত্ব’ হিসেবে অভিহিত। কলকাতার নাগরিক রবীন্দ্রনাথ, পূর্ববাংলার পল্লিপ্ৰকৃতির সান্নিধ্যে এসে প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বিত জীবনের স্বরূপ তথা বাস্তবত্বের মূলভাব অনুধাবন করেছিলেন এবং সাহিত্যে সেটাকৈশেল্লিক দক্ষতায় চিত্রিত করেছিলেন। রবীন্দ্র ছোটগল্পে মানুষ ও প্রকৃতির সম্মিলিত জীবনের স্বরূপ অনুসন্ধান আলোচ্য গবেষণার মূল লক্ষ্য।

মূল শব্দ

বাস্তবত্ব, আন্তঃসম্পর্ক, অজীব-উপাদান, জীব-উপাদান, মিথস্ক্রিয়া, সমন্বয়, বিচ্ছিন্নতা।

বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূর্ব-বাংলার মানুষ ও প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসার পরই তাঁর লেখনী থেকে বাঙালি পাঠক পেল সাহিত্যের জনপ্রিয়তম শাখা ছোটগল্প। আর সেই শিল্পসৃষ্টির মূলে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল পূর্ববঙ্গের মানুষ ও প্রকৃতি এবং এ দুটির আন্তঃসম্পর্ক। প্রকৃতির প্রতি যে নাড়ির টান বালক রবি শৈশবে অনুভব করতেন, নিজেকে প্রকৃতির অংশ হিসেবে মনে করতেন, তার সত্যতা অবলোকন করলেন এখানে এসে বসবাসেরসূত্রে। নগর কলকাতা থেকে বাংলার পল্লিতে এসে মানুষের উপর প্রকৃতির প্রভাব, উভয়ের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখে তিনি এই সত্যে উপনীত হলেন প্রকৃতি আর মানুষ অভিন্ন; দুটো মিলে সম্পূর্ণ সত্তা। অর্থাৎ বিশ্বজগতের সমগ্রতার ছবি রবীন্দ্রনাথ দেখলেন নদীবাহিত পূর্ববাংলায় এসে। রবীন্দ্রগল্পের সূত্রপাতে মানুষের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক জীবন রূপায়ণ করতে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করলেও ক্রমে তাঁর বেশ কিছু গল্পে প্রকৃতি-মানুষের আন্তঃসম্পর্কের রূপায়ণ করলেন, সেখানে প্রকৃতি সক্রিয় ভূমিকায় হাজির হলো। প্রকৃতি তখন মানুষের জীবনের অংশ, চরিত্রের পরিচালক, প্রভাবক, মানুষের সুখ-দুঃখের অংশী। অর্থাৎ মানুষ ও প্রকৃতি একটি সমগ্রতার অংশ, বিশ্বজগতের এক একটি উপাদান, আর সেগুলোর সমন্বয়ে বিশ্বজগত বহমান। বিশ্বজগতের বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয় থেকে যে কোনো একটি উপকরণের বিচ্যুতিই মহাজগতের সমগ্রতার জন্য ক্ষতিকর। প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন মানুষ যেমন খণ্ডিত তেমন মানুষ বিচ্ছিন্ন প্রকৃতিও অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। প্রকৃতি ও মানুষের এই সমগ্রতাকে পরিবেশ বিভ্রান্তির ভাষায় ‘বাস্তুতন্ত্র’ বা ‘Ecosystem’ বলা হয়। ভাববাদী দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ এটাকে ‘অসীমসত্তা’ তথা ‘Cosmic life’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি ও মানুষের সান্নিধ্যে এসে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলিত রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথকে নতুন বোধে পৌঁছে গেলেন; বুঝলেন মানুষ বিরাট প্রকৃতির একটি উপাদান এবং প্রকৃতি থেকে মানুষকে আলাদা করলে জীবন বিপন্নও হতে পারে। আর সে কারণে মানুষের সমগ্র জীবন আঁকার ক্ষেত্রে জীবনের সঙ্গে প্রকৃতিকে মিলিয়ে দিলেন, রচিত হলো মানুষের জীবনের সমগ্রতার চিত্র। গল্পগুচ্ছের প্রকৃতি ও মানুষের এই সমন্বয়ের চিত্রণ মুখ্যত গল্পগুচ্ছের পূর্ববঙ্গ-কেন্দ্রিক গল্পে। কারণ নাগরিক মানুষ প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতির অনেক উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করে। প্রকৃতির ভৌত উপকরণগুলোর সঙ্গে তারা সরাসরি সম্পর্কিত হলেও সাধারণের দৃষ্টিতে সেগুলো প্রকৃতি বলে অনুভূত হয় না। অন্যদিকে, প্রকৃতির জীব ও অজীব উপকরণের সঙ্গে পল্লীবাসীর নিত্য বাস। এ কারণে রবীন্দ্রনাথের পল্লীজীবন-নির্ভর গল্পে প্রকৃতি ও মানুষের যুথবন্ধন শিল্পিতরূপ পেয়েছে। নগর জীবনের দুএকটি গল্পে তার রূপায়ণ হলেও সেই সমন্বয় শহর ছেড়ে দূরে গ্রামীণ আবহে। যেহেতু পল্লীকেন্দ্রিক জীবনে মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থান বেশি স্পষ্ট তাই পল্লীজীবন-কেন্দ্রিক গল্পে বাস্তুতন্ত্রের রূপায়ণ ঘটেছে। আর আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রগল্পে প্রকৃতি ও মানুষের সেই সন্নিহিত জীবনের স্বরূপ সন্ধানই অস্থিতি প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণের

সম্মিলনই ‘বাস্তুতন্ত্র’। রবীন্দ্রগল্পে বাস্তুতন্ত্রের অনুসন্ধানকল্পে ‘বাস্তুতন্ত্র’ তথা জীবনের সমগ্রসত্তার উপকরণ এবং তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যিক। সেই বৈশিষ্ট্যের আলোকে রবীন্দ্র-ছোটগল্পে বাস্তুতন্ত্রের রূপায়ণের অনুসন্ধান করা হবে; না হলে অনুসন্ধান কর্মটি যৌক্তিকতা হারাবে। মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক-কেন্দ্রিক বিষয়টি পরিবেশ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান, তাদের আন্তঃসম্পর্ক, সেই সম্পর্কের গুরুত্ব, পরিবেশ বিজ্ঞানীদের খুব আগ্রহের বিষয়। তাঁদের মতে, বিশ্বজগতের প্রতিটি উপাদান পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ। একটাকে বাদ দিলেই জগৎ তার সমগ্রতা হারিয়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় বলে পরিবেশবাদী গবেষকরা মত দিয়েছেন। জগতের সকল কিছুর এই যে পারস্পরিক সম্পর্ক— এটাকে তাঁরা ‘বাস্তুতন্ত্র’ বা ‘Ecosystem’ বলে অভিহিত করেছেন। ১৯৩৫ সালে এ জি ট্যান্সলি ‘Ecosystem’ শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, ‘An “ecosystem” as a biological assemblage interacting with its associated physical environment and located in a specific place.’ (Tansley, 1935 as found in Bayne, 2017). (Tansley, 2017, <https://dio.org/10.1016/B978-0-803472-9.00010-8>) Peter Bond and others তাঁদের *Geography in Action* গ্রন্থে বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে লেখেন : ‘A community of plants and animals and the environment in which they live. Each part of the ecosystem depends on the other parts.’ (Bond and others, 2013 : 94) নিশীথ কুমার পাল পরিবেশতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমের ব্যাখ্যা বলছেন, ‘পরিবেশতন্ত্র বলতে একটি সুনির্দিষ্ট স্থানের পরিবেশ, ওই পরিবেশে বসবাসকারী জীবগোষ্ঠী এবং ওই জীবগোষ্ঠী ও পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে উৎপন্ন অবস্থাকে বোঝায়। অর্থাৎ সমস্ত জীবজগত এবং তাদের স্বাভাবিক বাসভূমি হলো পরিবেশতন্ত্রের মূল ভিত্তি।’ (নিশীথ কুমার, ২০১৩ : ৩৯)

সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট বাস্তুতন্ত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের গাছ, প্রাণী, পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থা এবং এর প্রত্যেকটি উপকরণ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশবাদী লেখক রাশিদা আখতার খানমও তেমনটি বলেছেন:

বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন জীব একে অপরের সাহচর্যে বেঁচে থাকে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে জীবমন্ডলের সকল সভাগুলো মিলে একটি একক তৈরী করে যাকে জীবগোষ্ঠী (community) বলা হয়। জীবগোষ্ঠীর সভাগুলো সুশৃঙ্খলিত থাকে। মানুষ, পশু-পাখী ও গাছ-পালা মিলে যে সুশৃঙ্খল কিন্তু জটিল তন্ত্রের সৃষ্টি করে তাকে জীবগোষ্ঠী আখ্যা দেয়া হয়েছে। জীবগোষ্ঠী পরিবেশের অজৈব উপাদানগুলোকে মর্যাদা দেয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য। জীবগোষ্ঠী ও এর পারিপার্শ্বিক অজৈব উপাদানগুলোর সুসংহত অবস্থানকে বাস্তুতন্ত্র (ecosystem) হিসেবে বর্ণনা করা হয়...জীবমন্ডলের জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহ নির্ভরশীল থাকে। (রাশিদা, ২০১৬ : ১৩)

অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের সকল উপাদান অর্থাৎ জীব ও অজীব উপাদান গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে একে অপরের সাহচর্যে বাঁচে বলে লেখক মত দিয়েছেন। আলোচনার সুবিধার্থে বাস্তুতন্ত্রের জীব ও অজীব উপাদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো :

১. অজীব উপাদান : বাস্তুতন্ত্রের প্রাণহীন সব উপাদান অজীব উপাদান নামে পরিচিত। এই অজীব উপাদান আবার দুই ধরনের। যথা: অজৈব বা ভৌত উপাদান ও জৈব উপাদান। অজৈব উপাদানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবন, মাটি, আলো, পানি, বায়ু, তাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি। সকল জীবের মৃত ও গলিত দেহাবশেষ জৈব উপাদান নামে পরিচিত।
২. জীব উপাদান : পরিবেশের সকল জীবন্ত অংশই বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদান।

(নিতিশ চন্দ্র, <https://netbangla.com>)

পরিবেশবাদীদের মতে পরিবেশের জীব উপাদানগুলো মূলত নিজেদের প্রয়োজনে অজীব উপাদানের সঙ্গে মিশে থাকে অন্যভাবে বললে জীব উপাদান, অজীব উপাদানকে নিজেদের স্বার্থে গুরুত্ব দেয়। নিশীথ কুমার পাল আরো বলেন, ‘পরিবেশতন্ত্র হলো একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাহায্যে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ শুধু যে নিজেদের মধ্যেই সম্পর্ক তৈরি করে তাই নয়, ওই অঞ্চলের জড় উপাদান যেমন মাটি, জল, বায়ু, সূর্যালোকের সাথেও সম্পর্ক তৈরি করতে সমর্থ হয়।’ (নিশীথ কুমার, ২০১৩ : ৩৯) উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, জৈব, অজৈব ও জীব অর্থাৎ মাটি, বায়ু, জল, পশুপাখি, বনবনানী, নদনদী ও মানুষ প্রকৃতির উপাদান এবং এরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় টিকে থাকে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জীব ও অজীবের এই নির্ভরশীলতাকে ‘মিথস্ক্রিয়া’ বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং জীব ও জড়ের সমন্বয়ে কোনো এলাকার পরিবেশতন্ত্র তৈরি হয়। পরিবেশতন্ত্রের জীব উপাদানের মধ্যে আছে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী আর জড় উপাদানের মধ্যে অজৈব ও জৈব উপাদান। অজৈব বা ভৌত উপাদানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবন, মাটি, আলো, পানি, বায়ু, তাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি। সকল জীবের মৃত ও গলিত দেহাবশেষকে জৈব উপাদান বলা হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় সকল কিছুই মিলিতরূপকে বাস্তুতন্ত্র বলা হচ্ছে যা ভাববাদেরও কথা, কারণ ভাববাদী দর্শন মনে করে, পৃথিবীর সবকিছু আন্তঃসম্পর্কে যুক্ত : ‘জগতের কোনো কিছু বিচ্ছিন্ন নয়, একক নয়, শুধু পরম সত্তা ছাড়া। ভাববাদের মর্মার্থ, জাগতিক প্রতিটি বস্তুর ভিতর আছে এক গভীর আন্তঃসম্পর্ক, আছে বিচ্ছেদহীন নিরন্তর যোগাযোগ। জগতের প্রতিটা কণারই একটা অর্থ আছে, আছে অন্যান্য সব কিছুর সাথে এর অব্যাহত সম্পর্ক।’ (শংকর, ২০২৩ : ১৪)

উপনিষদও পৃথিবীর সকল কিছুর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে স্বীকার করে, শুধু তাই নয় উপনিষদ মতে, চলমান পৃথিবীর সব কিছু ঈশ্বর দ্বারা পরিবৃত্ত। সবটার সমষ্টি এই জগৎ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) *আত্মজীবনী* থেকে জানা যায় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর ঈশ্বর অনুসন্ধান ব্যাপ্ত হয়ে তাঁর মনে প্রতীতি জন্মায়— দেবালয়, ধর্মসভায় ঈশ্বর বিরাজিত নন, বরং তিনি প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর অনুভব করেছেন। *উপনিষদে* তিনি ঈশ্বরের রূপ, তাঁর অবস্থানের সন্ধান পেলেন। তিনি *ঈশোপনিষদ* থেকে উদ্ধৃত করলেন :

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুক্তীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিন্ধনং। (দেবেন্দ্রনাথ, ২০২১ : ৪৬)

জগতের যত জীব আছে সব ঈশ্বরের বাসের উপযুক্ত বা ঈশ্বর বাস করেন। অর্থাৎ সকল জীবে ঈশ্বরের বাস। তিনি জগতের সব কিছুতে অনুসৃত বা সব কিছুতে আচ্ছাদিত হয়ে আছেন। উপনিষদের ঐ বাণী হৃদয়ঙ্গমে মহর্ষির ঈশ্বর অনুসন্ধান সমাপ্ত হলো। তাঁর কাছে সব কিছু সুন্দর, পবিত্র হয়ে উঠল। মহর্ষি *আত্মজীবনী*তে লিখলেন : ‘আমি ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতে চাই; উপনিষদে কী পাইলাম? ‘ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন কর।’ ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন করিতে পারিলে আর অপবিত্রতা কোথায়? তাহা হইলে সকলেই পবিত্র হয়, জগৎ মধুময় হয়। আমি যাহা চাই, তাহাই পাইলাম।’ (দেবেন্দ্রনাথ, ২০২১ : ৪৬)

উপনিষদ থেকে মহর্ষি হৃদয়ঙ্গম করলেন সব কিছুতে ঈশ্বর বিরাজিত, সে সূত্রে সহজে বুঝা যায় ঈশ্বর তথা সব কিছুতে ঈশ্বর বিরাজিত বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু আন্তঃসম্পর্কিত। প্রকৃতি ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কিত বোধ রবীন্দ্রনাথ, উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন সেটা সহজে বোধগম্য। শুধু উত্তরাধিকার নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক আর ভাববাদের মর্মবাণীও উপনিষদের মূলভাবের অনুসারী সিদ্ধার্থ শংকর তাঁর প্রবন্ধে উপনিষদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : ‘The Upanishad says, all movement is pervaded by one supreme unity.’ (Shanker, 2016 : 27) ভাববাদের মর্মবাণী ও উপনিষদের মত মুদ্রার এপিট-ওপিট। আর উপনিষদে বিশ্বাসী ভাববাদী দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মনে প্রকৃতির সকল উপাদানের সমন্বয়ে যে জীবনের সমগ্রতা সৃষ্টি হয় এ বোধ জাগ্রত থাকাই স্বাভাবিক।

প্রকৃতির সকল উপাদান সম্পর্কিত বোধ উত্তরাধিকার সূত্রে রবীন্দ্রমনে সঞ্চারিত হয়েছিল বলেই বাল্যকালেই প্রকৃতির প্রতি গভীর টান অনুভব করতেন। ঘরের মধ্যে থেকেই প্রকৃতিকে ছুঁয়ে যেতেন বালক রবি। রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* ও *আমার ছেলেবেলা* থেকে জানা যায়, ঘরের বাইরের পুকুর, জানালার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা নারকেল গাছের সারি দেখে তিনি বিমোহিত হতেন। প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্য তাঁকে ঘরের বাইরে ডাকত। প্রকৃতির প্রতি অন্তরের টান, তার সঙ্গে হৃদয়ের ঐক্যানুভূতি রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য লেখায় নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে : ‘জানালার নীচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল, তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা-বট-দক্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণী। গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম।’ (রবীন্দ্রনাথ, ১৪২১ : ১৫)

আলোচ্য বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, জীবনের উষালগ্নেই রবীন্দ্রনাথ, মানুষের উপর প্রকৃতির অনিবার্য টান অনুভব করেছিলেন আর ত্রিশ বছর বয়সে পূর্ববঙ্গের উদার পল্লিতে এসে মানুষ ও প্রকৃতির জীবন দেখে প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয় সম্পর্কিত ধারণা পূর্ণতা পেল

এবং সাহিত্যে তার রূপায়ণ করলেন গল্পকার। পরিবেশ বিজ্ঞান, উপনিষদ ও ভাববাদের মতাদর্শের উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রগল্পে প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বিত জীবনের স্বরূপ নির্ণয় করার প্রয়াস করা গেল।

সাধারণ বিশ্বাস মতে, শহরে মানুষের বসবাস প্রকৃতি থেকে একটু দূরে। তারা ইট-কাঠ-বালুর আশ্রয়ে থাকলেও এ গুলোকে ঠিক প্রকৃতি হিসেবে গণ্য করে না, অথচ উক্ত উপাদানগুলো প্রকৃতির অজৈব ও জৈব উপাদান। সাধারণ মানুষ গাছগাছালি, পশুপাখি, নদনদীকে প্রকৃতি বলে মনে করে, সেগুলো থেকে শহরবাসী আক্ষরিক অর্থে দূরে অবস্থান করে। কিন্তু পরিবেশবাদীদের মতে জীব, অজৈব ও জৈব সব মিলে প্রকৃতি। বিশেষত কম অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ, মানুষ ভিন্ন প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের সান্নিধ্য, তাদের জীবনে সেসবের প্রভাব প্রত্যক্ষ করতে পারে না। গ্রামের মানুষের বাস প্রকৃতির সাহচর্যে, তারা মাটি ছুঁয়ে, গাছপালা, নদনদী, পশু পাখির সঙ্গে যুথবদ্ধ হয়ে বাস করে। প্রকৃতির সঙ্গে নিকটতম প্রতিবেশীর মতো মিলেমিশে বাঁচে গ্রামীণ মানুষ কিন্তু তাদের অধিকাংশই তাদের জীবনে প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের স্বক্রিয় প্রভাব অনুভব করতে পারে না। অতি সংবেদিত চিত্ত কেবল জীবনে প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন সংযোগ অনুভব করে। পূর্ববঙ্গের মানুষ প্রকৃতির সাহচর্যে বাঁচে, সেটা উপলব্ধি করেই সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথ গল্পে প্রকৃতি ও মানুষের যুথবদ্ধ জীবন চিত্রণ করলেন। সে কারণেই রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গ-কেন্দ্রিক গল্পে প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের নিবিড় সংযোগ লক্ষ করা যায় কারণ গল্পগুলোর পটভূমি পল্লি আর তার বিষয় গ্রামীণ মানুষ ও প্রকৃতি। গল্পগুলোতে মানুষের উপর যেমন প্রকৃতির প্রবল প্রভাব প্রকৃতিও তেমন মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে; কেউ কাউকে অতিক্রম না করে একে অপরের পরিপূরক হয়েক্রমশ গন্তব্যে পৌঁছে যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্পে তারই শিল্পিত প্রকাশ বলে অজিত দত্ত মত প্রকাশ করেছেন : ‘রবীন্দ্র সাহিত্য নিসর্গ ও মানব কেবল পাশাপাশি বিরাজিত নয়, উভয়ে মিলে একটা সৌন্দর্য সত্তা। এই দুই পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পরের প্রতি নিত্যপ্রভাবশীল...তাই এ গল্পগুলিতে প্রকৃতি কেবল পশ্চাৎপট রূপেই বিরাজ করে না, মানব-মন এবং মানুষের কার্যকলাপের উপরও একটি অনতিপ্রকট কিন্তু অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করে।’ (অজিত, ২০০০ : ১৮৮) মানুষ ও প্রকৃতির এই প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। ‘গল্পগুচ্ছের’ ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’, ‘পোস্টমাস্টার’, ‘ছুটি’, ‘সুভা’, ‘নিশীথে’, ‘শুভদৃষ্টি’, ‘অতিথি’, ‘মহামায়া’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’, ‘সমাপ্তি’, ‘বলাই’, ‘আপদ’ ও ‘বোষ্টমী’ গল্পে ‘Ecosystem’ বা বাস্তবত্বের রূপায়ণ ঘটেছে। গল্পগুলোতে মানুষ ও প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের সহযোগিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

‘‘পোস্টমাস্টার’’ (১৯৯৮) গল্পে প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয় এবং একে-অপরের উপর প্রভাব চিত্রিত হয়েছে। গল্পের রসবোধ গাঢ় করেছে গল্পের প্রকৃতিই। বর্ষার নির্জনতা, বাতাসে গাছের পাতার হিন্দোল, মেঘমুক্ত আকাশে নীল-সাদা মেঘের সৌন্দর্য, নির্জন দুপুরে সঙ্গীর জন্য ক্লান্ত একাকী পাখির ডাকাডাকি পোস্টমাস্টারের মনে প্রিয়জনের সান্নিধ্যসাধ জেগেছে; আর তার ধারাবাহিকতায় দুজন অসম মানুষ কাছে এসেছে। এই

নৈকট্য সৃষ্টিতে প্রকৃতির উপাদান আলম্বন বিভাব হিসেবে কাজ করেছে। আবার শহুরে পোস্টমাস্টার বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বাঁচতে রতনকে ত্যাগ করেছে। কিন্তু পল্লিবালার বেদনায় সমস্ত প্রকৃতি বেদনাবিধুর। রতনকে সঙ্গে নেওয়ার আবেদন দাদাবাবু কর্তৃক নিদারুণভাবে প্রত্যাখ্যাত হলো তার হৃদয়ের রক্তক্ষরণ প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চরিত হয়ে বৃষ্টি হয়ে বারেছে। এ বৃষ্টি তো প্রকৃতির বৃষ্টি নয়, রতনের চোখের জল : ‘মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।’ (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ১৮) প্রকৃতির বৃষ্টিফোঁটা আর রতনের চোখের জল মিলেমিশে গেছে। ‘প্রকৃতি এখানে আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় প্রায় সাংকেতিকতার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে ঘটনা এবং মানুষ তাহার চতুর্দিক, এমন-কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, তাহাদের যোগেই তাহার জীবন সম্পূর্ণ এবং গল্প সার্থক শিল্পমণ্ডিত।’ (বিনয়েন্দ্রমোহন, ১৪১২ : ২৬৬) আবার ভরা বর্ষার নদী রতনের চোখের জলের মতো উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে, যা পোস্টমাস্টারের হৃদয়ে রতনের চোখের জলের প্রতিমূর্তি হয়ে ধরা দিয়েছে। একই সঙ্গে নদীর থৈ থৈ জল দেখে পোস্টমাস্টারের মনও ছল ছল করে উঠেছে। রতনের জন্য পোস্টমাস্টারের হৃদয়াবেগ তৈরি হয়েছে। নদীর থৈ থৈ জল একদিকে রতনের চোখের জল, অন্যদিকে পোস্টমাস্টারের মনের ভাবাবেগ তৈরি কারণ। পোস্টমাস্টারের মন আর নদী একীভূত হয়ে গেছে, প্রতীতিই পোস্টমাস্টারের হৃদয়কে আর্দ্র করেছে, রতনকে সঙ্গে নেওয়ার কথাও মনে করিয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে রতন ও পোস্টমাস্টার উভয়ে মিলে গেছে এবং সেই প্রকৃতি পোস্টমাস্টারের মনে প্রভাব বিস্তার করেছে। নৌকার পালে বাতাসের বেগ, দূরে শ্মশানঘাট দেখে পোস্টমাস্টারের মন পরিবর্তিত হয়েছে; প্রকৃতির কাছ থেকে সে শিক্ষা নিয়েছে যে চলমানতাই জীবনের ধর্ম; সেখানে পিছনে ফেরার কোনো সুযোগ নেই। গল্পে প্রকৃতি একই সঙ্গে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ, সে একদিকে মায়াময়তার প্রভাবক অন্যদিকে চলমানতার প্রতীক হয়ে পোস্টমাস্টারের পরিচালক : ‘মানবহৃদয়ের ভাবাবেগের সঙ্গেও প্রকৃতিকে নানাভাবে যুক্ত করিয়াছেন—কোথাও প্রকৃতির দর্পণে মানবচিত্ত প্রতিফলিত করিয়াছেন, কোথাও বা প্রকৃতির সাহায্যে চিত্তাবেগ সঞ্চর করিয়া চরিত্রের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। মানুষের সুখদুঃখের প্রতি প্রকৃতির সহানুভূতি এবং উদাসীন্য, এমন-কি অবহেলার ইঙ্গিতও অনেক গল্পে পাওয়া যাইবে।’ (বিনয়েন্দ্রমোহন, ১৪১২ : ২৬৩)

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের প্রতি প্রকৃতির এই বিচিত্র সম্পর্কের রূপই মানব জীবনের সঙ্গে বিশ্বজগতের আন্তঃসম্পর্কের সত্যরূপ, ‘The truth of the interpenetration of human life with the cosmic life of the world।’ (Rabindranath, 2011 : 502) এই একই সত্য “মহামায়া” (১২৯৯) গল্পের নায়ক-নায়িকার জীবনেও সমান সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে। গল্পে মহামায়া, রাজীব আর প্রকৃতি একে অপরের সহচর। দুপুরের নির্জন মাঠ, কবুতরের ডাক, নদীর ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ রাজীবের প্রেমাবেগকে প্রবুদ্ধ করায় দৃঢ় ব্যক্তিত্বময়ী মহামায়ার কাছে রাজীব তার হৃদয়াবেগ প্রকাশ করার সাহস পেয়েছে।

মহামায়া যখন সহমৃত্যু হচ্ছিল তখন রাজীবের মনেও যেমন ঝড় বইছিল, একই সঙ্গে প্রকৃতিতেও উঠেছিল প্রবল ঝড়-বৃষ্টি। প্রকৃতির ঝড়-বৃষ্টির কারণে মহামায়া জলন্ত চিতা থেকে বেঁচে ফিরে রাজীবের সাহচর্যে আসে, মানসিক দূরত্ব থাকলেও স্থানিক দূরত্ব ঘুচে এক চালের নিচে বসবাস করতে শুরু করে। শর্তসাপেক্ষে আলাদা ঘরে বসবাস করার এক পর্যায়ে শুষ্কপক্ষের চাঁদনী রাত রাজীবের প্রেমাবেগকে উসকে দেওয়ায় প্রকৃতির রূপের মধ্যে মহামায়ার রূপ অবলোকন করেছে গল্পের নায়ক। অন্যদিকে পুলকিত প্রকৃতি রাজীবকেও পুলকিত করেছে, প্রকৃতি ও রাজীব মিলে গেছে। প্রকৃতির প্রভাবে মহামায়ার ঘরের দিকে ধাবিত হয়েছে রাজীব :

অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত রূপার পাতের মতো ঝকঝক করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনও কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাঁহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে...রাজীব কী ভাবিল জানি না কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ যেন সমস্ত পূর্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ১৩০)

প্রকৃতিই রাজীবকে উদ্বুদ্ধ করে মহামায়ার দরজায় নিয়ে গেছে এবং রাজীব মহামায়ার আগুনে পুড়ে যাওয়া মুখ দেখে আঁকে উঠেছে। রাজীবের বেদানার্ত অস্ফুটস্বরে মহামায়া জেগে গেছে। মহামায়ার বলছে যাওয়া মুখ রাজীব দেখে ফেলায় মহামায়া, রাজীবের ঘর ছেড়ে অজানা গন্তব্যে যাত্রা করেছে তখনও প্রকৃতিতে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। এই ঝড় একদিকে মহামায়ার মনের আবার রাজীবেরও। প্রকৃতি ও মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রকৃতি চালিত হয়ে মহামায়া সান্নিধ্যলাভে উৎসুক হওয়ায় চরম পরিণাম হয়েছে মহামায়া-রাজীবের চির বিচ্ছেদ। এই গল্পেও প্রকৃতি একই সঙ্গে প্রভাবক ও পরিচালক। মিলনেও প্রকৃতি বিচ্ছেদেও প্রকৃতি।

“খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন” (১২৯৮) গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে খোকাবাবুর অন্তরের অদ্ভুত সাদৃশ্য এবং মানুষের উপর প্রকৃতির অনিবার প্রভাব দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথমে দূরে গাছে ফুটে থাকা কদমফুলের দিকে খোকাবাবুর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে, কদম পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়েছে ছোট শিশু। আবার পদ্মার খল্ খল্ছুটে চলার শব্দ খোকাবাবুর কানে এলে সেই খল্ খল্ শব্দ তার মনে অসংখ্য শিশুর কলস্বরে রূপান্তরিত হয়েছে। আর তখনই স্থির অচঞ্চল ফুল ও প্রৌঢ় চন্নের আকর্ষণ নিমিষে ছিন্ন করে হাজারো শিশুর আহ্বানকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকৃতির দিকে ছুটে গেছে অবুধ শিশু, মিলে গেছে অনন্ত প্রকৃতিতে। নদীর কলধ্বনিই খোকাবাবুকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, ‘কোন কোন গল্পে মানব চিত্তের প্রভাব এমন দেখানো হইয়াছে যে প্রকৃতি যেন গল্পে পাত্রপাত্রীর মনোভাবকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছে।’ (কবিশেখর শ্রীকালিদাস, ২০০৭ : ৫৮) গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে খোকাবাবুর মানসিক সংযোগ ঘটছে। “অতিথি” (১৩০২) গল্পটি মানুষ ও প্রকৃতির ঐক্যবোধের সব থেকে শিল্পিত প্রকাশ। প্রকৃতি ও মানুষের মানসিক সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট। প্রকৃতির প্রভাবক ও পরিচালক ভূমিকা এই গল্পে

সবচেয়ে প্রবল। প্রকৃতি সজীব চরিত্র হয়ে মানুষের উপর প্রভাব রেখে মানুষকে চালিত করেছে, সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। ব্যক্তিজীবন ও সামষ্টিক জীবন প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। গল্পটিতে গ্রামীণ মানুষ প্রকৃতিলগ্ন হয়ে বাঁচে, নদীটি তাদেরই একজন। গ্রীষ্মের শুকনো প্রাণহীন নদীর প্রভাবে তীরসংলগ্ন মানুষও প্রাণহীন হয়ে আছে। তাই তো নব বর্ষার জল পেয়ে গ্রামের শিশু-কিশোর-বালক-বালিকার মনে নদীর গতিবেগ সঞ্চারিত করেছে, নদীর গতিশীলতার প্রভাবে গৃহবধূরাও ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে। সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে নদীর কাছে পৌঁছে গেছে, নদীর উচ্ছলতা তাদের সবাইকে উচ্ছল করেছে। নির্জীব গ্রামজীবন বর্ষার ভরা নদীর প্রভাবে প্রাণবান হয়ে ওঠে :

এমন সময় একদিন, পিতৃগৃহ-প্রভাগত পার্বতীর মতো, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্যসহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল-উলঙ্গ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারংবার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল, কুটিরবাসিনীরা তাহারা পরিচিত প্রিয়সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল-শুদ্ধ নির্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ২৯০)

গ্রীষ্মের নদী নববর্ষার জলে উচ্ছল, গতিশীল; নদীর প্রভাবে গ্রামবাসীও মুক্তির আনন্দে মুখর। মানুষের উপর প্রকৃতির প্রভাব এবং সেই প্রভাবে কীভাবে চরিত্রের মনোজগতে পরিবর্তন আসে, ঘটনাস্রোত বাঁক পরিবর্তন করে তার অনন্য দৃষ্টান্ত গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র তারাপদ। তারাপদ একান্তভাবে প্রকৃতির সন্তান, তারই সান্নিধ্যে লালিত পালিত এবং তার প্রভাবে চালিত। মানুষসহ প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের চাঞ্চল্য তারাপদের মনে সঞ্চারিত হয়ে সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাই বাছুরের ছোট্টাছুটি, ঘোড়ার লাফালাফি, মেয়েদের চপলতা, মেছুনির মাছ কেনাবেচা সবকিছু সে উন্মুখ হয়ে দেখে, টুপ করে মাছ ধরে মাছরাঙার উড়ে চলার প্রভাবে তারাপদের মনে গতি সৃষ্টি হয়। পুরো গল্পজুড়ে নদী, গাছপালা, বনবনানী, পাখি, মানবশিশু ও অন্যান্য প্রাণীর গতিশীলতা তারাপদের মনে সঞ্চারিত হয়েছে, সে সেই গতিতে সামনে চলেছে, প্রকৃতি তাকে পথ দেখিয়েছে। কাঁঠালিয়া গ্রামে সে কিছুদিন স্থিত হলেও যখন দেখেছে চারুশশীর সঙ্গে বিয়ের মাধ্যমে তার পায়ে স্থায়ী শিকল জড়াতে যাচ্ছে তখন মনে সংশয় তৈরি হয়েছে এবং সে প্রকৃতির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তখনও প্রকৃতির সবকিছুতে প্রবল গতি দেখে তার সংশয় কেটে গেছে, সে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সবার অগোচরে গ্রাম ত্যাগ করেছে : ‘সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা— চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া বলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুঘলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল।’ (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ২৯০) প্রকৃতির গতি থেকেই তারাপদ বুঝে নিল বন্ধন নয় মুক্তিই জীবন। নিজের অস্থিরতার সঙ্গে প্রকৃতির চাঞ্চল্য মিলে গেছে, তাই স্থায়ী বন্ধনের পূর্বেই উদার প্রকৃতিলোকে পা বাড়িয়েছে। এখানে প্রকৃতি ও তারাপদের

মধ্যে কোনো ফারাক নেই। প্রকৃতি, জীবনের সঙ্গে কতটা অনিবার্যভাবে জড়িত তা তারা পদের চরিত্রে সবচেয়ে বেশি ফুটেছে। তারা পদের চলে যাওয়াই প্রমাণ করে জীবন গতিশীল, তাকে বেঁধে ফেললে তার স্বরূপ হারিয়ে যায়। “শান্তি” (১৩০০) গল্পে তেমনি পদ্মার প্রবল ভাঙনের মুখে আম-কাঁঠালের গাছগুলো অসহায় হয়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছে। গল্পে প্রকৃতি ও মানুষের অসহায়ত্ব মিলে গেছে। পেয়াদার শক্তির কাছে ছিদাম ও দুখিরাম যেমন অসহায়, পদ্মার কাছে তীরবর্তী আম কাঁঠালের গাছও তেমন শক্তিহীন। গল্পে প্রকৃতি, গাছপালা আর কুরি পরিবার যেন এক সুতোয় গাঁথা। প্রবল শক্তিদর পদ্মার কাছে গ্রামবাসী এবং বৃক্ষরাজি নতজানু।

গল্পগুলোতে প্রকৃতি ও মানুষের যুথবদ্ধ বসবাস, পারস্পরিক নির্ভরতার পরম প্রকাশ। একে-অন্যের প্রতি নির্ভরতা ছাড়াও প্রকৃতি ও মানুষের চরিত্রগত সামঞ্জস্যের চিত্রও এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। যেহেতু মানুষ প্রকৃতির অনিবার্য অংশ সে কারণেই উভয়ের বৈশিষ্ট্য সাদৃশ্য অবধারিত। গল্পের বেশ কিছু চরিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির সাদৃশ্য ও একে-উপরের উপর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে খোকাবাবু, মৃন্ময়ী, সুভা, ফটিক, তারা পদ অন্যতম। “সমাণ্ডি” (১৩০০) গল্পে মৃন্ময়ীর সঙ্গে প্রকৃতির সাদৃশ্য অনেক বেশি। প্রকৃতির চঞ্চলতা, চপলতা ও সারল্য তার চরিত্রে বিদ্যমান, একই বৈশিষ্ট্য “ছুটি” (১২৯৯) গল্পের ফটিকের চরিত্রেও। নদী আর বনবনানীর সাহচর্যে বেড়ে উঠা মৃন্ময়ী নদীর মতো উচ্ছল, প্রকৃতির মতো চপল। তাই তো বিয়ের কারণে প্রকৃতির কোলের অবাধ বিচরণ, মায়ের স্নেহ ও খেলার সাথীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটায় সে স্বরূপ হারিয়েছে। মুক্ত কিশোরী তখন গুমরে মরেছে, পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে, তাকে বন্দী করাতেই সে অবাধ্য আচরণ করেছে। আবার অপূর্বর সাহায্যে যখন সে প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভ করেছে, নৌকোয় চলতে চলতে সে আবার আগের মতো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এবং তাকে মুক্ত করেছে বলে অপূর্বর প্রতি সে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছে। ঘরের বাইরে আনার আগ পর্যন্ত সে অপূর্বকে সহ্য করতে পারত না। সে বিশ্বাস করত এই লোকটা তাকে বিয়ে করেছে বলেই তার হাতে-পায়ে বেড়ি পড়েছে, স্বাধীন জীবন, খেলা-ধুলো, খেলার সঙ্গী সব হারিয়েছে। আবার সময়ের পরিবর্তনে নদী যেমন তার চঞ্চল-উচ্ছল রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে শান্ত হয়, প্রকৃতি পরিপূর্ণ হলে শ্লিষ্ট সৌম্য হয়, মৃন্ময়ীর চরিত্রেও একই পরিবর্তন লক্ষণীয়। চঞ্চল দুরন্ত মাটির কন্যা মৃন্ময়ী হঠাৎ দিক পরিবর্তন করেছে, তার মধ্যকার চপলতা সরে গিয়ে প্রকৃতির মতো শান্ত শ্লিষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতির পটে বেড়ে উঠা চরিত্রগুলো প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন হলে জীবনহীন হয়ে যায় এবং পরিণামে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়; চরিত্রগুলো যেন প্রকৃতিরই সন্তান। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ মানব প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। “ছুটি” গল্পের ফটিক, “সুভা” (১২৯৯) গল্পের সুভা, “অতিথি”র তারা পদ, “শুভদৃষ্টি” (১৩০৭) গল্পের

অনামিকা মেয়েটি তার জীবন্ত উদাহরণ। বিশেষ পটের মানুষ সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাঁচে, সে পরিবেশ মানুষকে পূর্ণ করে, তার সীমাবদ্ধতা ঘুচিয়ে দেয়, সেজন্য সেই পরিবেশ থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হলে তার সম্পূর্ণতা হারায়; “ছুটি”, “অতিথি”, “সুভা”, “শুভদৃষ্টি”, “বলাই” গল্প সেই কথার ভাষিক রূপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখেছিলেন যে জড়ের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন, অর্থাৎ প্রকৃতির সকল কিছুর সঙ্গে প্রাণের যোগ রয়েছে। আপত জড়ের মধ্যে প্রাণের বীজ রোপিত আছে বলে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মহাদেব মণ্ডল তাঁর প্রবন্ধে সে চিঠির অংশ উদ্ধৃত করেছেন :

প্রাণ পদার্থ থাকে জড়ের গুণ কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে।” আমি ছেলেবেলা থেকেই এই ঋষিবাক্যের সঙ্গে পরিচিত— “যদিদং কিস্তি জগৎ প্রাণ এজতি নিসৃতং” -এই যা কিছু জগৎ, যা কিছু চলছে, তার প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান। সেই কম্পমানের কথা আজও বিজ্ঞানে বলছে। কিন্তু সেই স্পন্দন যে প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে এক, একথা বিজ্ঞান এর প্রমাণ-ভাণ্ডারের মধ্যে জমা হয়নি সেদিন মনে হয়েছিল আর বুঝি দেরি নাই। (মহাদেব, ২০২৩, জানু. ১৪ : <https://prativasmag.com>)

“ছুটি” গল্পের নায়ক ফটিক প্রকৃতির অংশ, সে প্রকৃতির সন্তান তার প্রাণ প্রকৃতির কুঠুরিতে রাখা আছে। ফটিক, উদার প্রকৃতির উন্মুক্ততা, মায়ের অকৃত্রিম স্নেহ, ভাই ও খেলার সাথীদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে চার দেওয়ালের মধ্যে অনাদর, অবহেলায়, অপমানে, স্নেহহীনতায় কৃত্রিম পরিবেশ দম বন্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। আপন পরিবেশ ও গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন ফটিক মায়াহীন কৃত্রিম নাগরিক সংসারে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। পল্লিমায়ের উদারতা আর প্রাণময় মানবসন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন ফটিক বাগান থেকে উপড়ে আনা চারাগাছের মতো স্তান হয়ে গেছে। মূলত প্রকৃতি ও মানুষের যৌথ সংসার থেকে একটিকে আলাদা করলে দুটোই অঙ্গহীন হয়ে যায়। প্রকৃতিবাদীদের মতে, পরিবেশ ও গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানুষছমকির মুখে পড়ে, তারই সাহিত্যিক প্রকাশ ফটিক, সুভা, “শুভদৃষ্টি”র বোবাবালিকা। স্বীয় পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ফটিকের জীবন সংকটে পতিত হয়ে অনন্ত প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। সমরেশ মজুমদারের মত একথারই প্রতিরূপ :

বিশ্বপ্রকৃতির আত্মনাকে উপেক্ষা করে মহৎ-বৃহৎ ধরিত্রীমাতার কোল থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়েছে, যেখানে প্রকৃতি ও মানুষে নিত্যকার সংসার গড়ে উঠেছে। সেটা একটি অঙ্গ বিচ্যুতি করলে তাকে জীবনহীন হয়েও বেঁচে থাকতে হয়। নতুবা জীবনকেই পরিত্যাগ করে যেতে হয়, বৃহত্তর ছুটি লাভ করে ফটিকের মতো বিশ্বপ্রকৃতির ফ্রোড়ে আন্দদিত চিত্ত বালককে তিল তিল করে হত্যা করতে হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ তার চিন্তের বিচ্ছেদ, তার অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ, তা মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক, ছুটি গল্পের মর্মার্থ এইটুকু। (সমরেশ, ২০১২ : ৪৩০)

একইভাবে জীবনহীন হয়েছিল প্রকৃতির আর এক সন্তান “সুভা” গল্পের সুভা। সুভা যতটা মানব-সমাজলগ্ন তার থেকে অনেক বেশি প্রকৃতিসম্পৃক্ত। “সুভা” গল্পে গবাদি পশু, আকাশ, নদী, পূর্ণিমা রাত, নদীর শ্রোত, পাখির কলরব সব মিলে সুভা সম্পূর্ণ। নির্জন

দুপুরে সে আশ্রয় নেয় নদীর তীরে বনের ছায়ায় তখন প্রকৃতি আর সুভার মিলিত জীবন রচিত হয়। বোবা বালিকার সঙ্গে বোবা প্রকৃতি মনের ভাব আদান প্রদান করে। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির কলতান, তরুর মর্মর ধ্বনি সমস্ত যেন সুভার মুখে ভাষার যোগান দেয়। গোয়ালের ভাষাহীন চক্ষুওয়ালা গোরুর কাছে গিয়ে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করে। তারা তাদের করুণ চাহুনি দিয়ে, গলা বাড়িয়ে সুভাকে ছুঁয়ে দিয়ে সমবেদনা জানায়। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেলে উঠানে গিয়ে জ্যোৎস্নার আলো গায়ে মাখে সে। এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে তার সহযোগ তৈরি হয়, পারস্পরিক ভাব বিনিময় হয়। সেই প্রকৃতিকন্যাকে শহরে নিয়ে মিথ্যা বলে বিয়ে দেয় তার বাবা। পল্লিবালা তার আত্মার আত্মীয় যে প্রকৃতি জননী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গোষ্ঠীহীন হয়ে একা হয়ে যায়; যে কথা বাস্তবতন্ত্রের মৌল বৈশিষ্ট্য। বোবা বালিকা সবার অবহেলা-অপমানে অনাত্মীয় পরিবেশে আরো বোবা হয়ে গেছে। তাই তো গোষ্ঠীহীন একাকী সুভা শহরে জীবন্যুত হয়ে যায়, তার সম্পূর্ণতা হারিয়ে খণ্ডিত হয়ে যায়— যা মূলত বাস্তবতন্ত্রহীনতার মূল কথা। পরিবেশবাদী লেখক রাশিদা আখতার খানম বাস্তবতন্ত্রে প্রকৃতির সকল কিছুর মধ্যকার সম্পর্ক এবং সেটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছেন। তিনি, লিওপোল্ড দ্বারা প্রাণিত হয়ে মত দিয়েছেন ;‘বাস্তববিদ্যায় প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু একে অন্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত— নির্ভরশীল। আর এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এদের টিকে থাকার জন্য আবশ্যিক শর্ত। সমাজ যেমন টিকে থাকে ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর তেমনি বাস্তবতন্ত্রও টিকে থাকে এর বিভিন্ন সত্তাগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর।’ (রাশিদা, ২০১৬ : ১৩)

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সান্নিধ্য থেকে ছিটকে পড়ে প্রাণহীন হয়ে গেছে প্রকৃতিকন্যা সুভা। আবার ‘শুভদৃষ্টি’ গল্পেও বাস্তবতন্ত্রের প্রয়োগ স্পষ্ট। নিসর্গ একক কোনো সত্তা নয়, প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড উপাদান একত্রিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ নিসর্গ বা বিশ্বজগৎ যা রবীন্দ্রচেন্নায় ‘অসীম সত্তা’র নামান্তর। গল্পেও তার শিল্পিত প্রকাশ বোবা মেয়েটির চরিত্রে। নামহীন কিশোরী মেয়েটি নদীর তীরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে ভাসাময়, জড়তা নেই, চঞ্চল সুন্দর; যাকে দেখে কান্দিচরণ মুগ্ধ হয়েছে। আবার সকালের গাছের নিচে, শীতের রোদে বসলে তার মুখে আলো-ছায়ার খেলায় তার সৌন্দর্য বহুগুণ বেড়ে যায়। বাতাসে গাছের পাতার খস খস শব্দ, গোরুর খাওয়ার আওয়াজ তার ভাষার সীমাবদ্ধতা দূর করে তাকে ভাসাময় করেছে। সূর্যের আলো তার মুখের শ্রী বাড়িয়েছে, গোরুর খাওয়ার আওয়াজ মেয়েটির কণ্ঠস্বরের প্রতীক হয়ে স্বেয়ং সম্পূর্ণ করে তুলেছে, সমগ্রতা দান করেছে: ‘বিরলপল্লব গাছটির ছায়া ও রৌদ্র বালিকার ক্রোড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে:... সেদিন প্রভাতে নদীতীরে বনের মধ্যে যাহাকে বনশ্রীর মতো দেখিতে হইয়াছিল, আজ মধ্যাহ্নে নিস্তন্ধ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণছায়ায় তাহাকে স্নেহবিগলিত গৃহলক্ষ্মীটির

মতো দেখিতে হইল।’ (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৮ : ৩৭২) আলোচ্য বর্ণনা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাণী বহন করে: ‘প্রকৃতি ও মানুষের মিলনে বিশ্বের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হয়।’ (প্রভাতকুমার, ১৪১২ : ৩০৪) রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জড়ের মধ্যে প্রাণ লুকিয়ে থাকে— তারই প্রমাণ গল্পের বোবা বালিকা। নদীর তীরে প্রকৃতি আর মেয়েটি মিলে নদীতীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, আর ঘরের উঠানে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে বোবা মেয়ের ভাষার সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে সে গৃহলক্ষ্মী হয়ে উঠেছে। পল্লিবালিকার প্রতি জমিদারের প্রেমাবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটি আরো বেশি শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। মনের আবেগে প্রতিদিনের দেখা পাখির ছানা, আলো-ছায়ার খেলা অনেক বেশি মায়াবীরূপে ধরা দিয়েছে নায়কের চোখে। এখানেই প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব, নিজের ভাবনার প্রতিচ্ছবি হয়ে প্রকৃতি আবির্ভূত হয়েছে।

কিশোর বয়সে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কিত যে বোধ রবীন্দ্রনাথের মনে বাসা বেঁধেছিল, জমিদারি দায়িত্ব পালনকালে পূর্ববাংলায় এসে বসবাসকালে সেই বোধ রবীন্দ্রমননে আরো প্রবল হলো। তিনি দেখলেন নিসর্গ আর মানুষ অভিন্ন, দুটো মিলে সম্পূর্ণ সত্তা। এই সমন্বয় সম্পর্কে লিওপোল্ডের ভাবনা রবীন্দ্রভাবনার সমধর্মী, কারণ লিওপোল্ডও মনে করতেন, ‘প্রাণহীন প্রকৃতি’কে সজীব এবং ‘মানুষের সঙ্গে তার নিবিড় যোগ :

প্রখর উপলব্ধি সম্পন্ন বিশ্বের বহু মানুষের কাছে আমাদের তথাকথিত ‘প্রাণহীন প্রকৃতি’ একটি সজীব বস্তু এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে সচেতন যে মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে এক ঘনিষ্ঠ ও গভীর সম্পর্ক বিরাজ করছে যা যান্ত্রিক নীতি দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না; এই উপলব্ধিকে আমরা ‘বাস্তবিক উপলব্ধি’ (ecological conscience) বলে আখ্যায়িত করতে পারি। (রাশিদা, ২০১৬ : ১২)

আর সেই প্রখর উপলব্ধি সম্পন্ন মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। সাহিত্যে প্রকৃতির উপাদানসমূহের নিবিড় প্রকাশ তাঁরই হাতে, গল্পগুচ্ছের নানা গল্প। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন লেখায় বিশেষত পূর্ববঙ্গে বসবাসকালের রচনায় প্রকৃতি ও মানুষের এই অবিচ্ছেদ্যতা আরো বেশি গভীর। *হিন্দুপত্রাবলী*র ২৩৮ সংখ্যক পত্রে প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয়বোধ স্পষ্ট: ‘আমি আছি এবং আমার সঙ্গে আর-সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতে একটি অণু পরমাণুও থাকতে পারে না; আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুস্পষ্ট সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছু কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়।’ (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১১ : ৩৩৪) জগতের সঙ্গে একাত্মতা, ধুলোবালি, জলরাশি, শরতের সৌন্দর্য এবং পরিজন নিয়েই সম্পূর্ণ ‘আমি’র সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের এই ‘আমিত্ব’ প্রকৃতি ও মানুষের সম্মিলিত রূপ; এটাই বাস্তবতন্ত্রের অন্তরের কথা। রবীন্দ্রনাথ ভগবতেও অনুরাগী ছিলেন। ভগবৎ থেকেও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও মানুষের ঐক্যবোধ সম্পর্কিত ধারণা লাভ করেন। দীনেশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের ভগবৎ-প্রেম এবং মানুষ ও প্রকৃতির সম্মিলন সম্পর্কে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সিদ্ধার্থ শংকর, *রবীন্দ্র দর্শন সংশয় ও সমন্বয় গ্রন্থের* ফ্যাপে যেমন উদ্ধৃত করলেন :

রবীন্দ্রাবুর সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক গুণ তাঁহার ভগবৎপ্রীতি; ইহাই তাঁহার ‘নৈবেদ্য’, ‘গীতাঞ্জলি’, ‘খেয়া’ প্রভৃতি কাব্যের ছত্রগুলিকে এত উজ্জ্বল করিয়াছে। এই ভগবৎপ্রীতি তাঁহাকে মনুষ্য সমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেয় নাই, বরং সমস্ত মনুষ্যসমাজ, এমনকি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সংগে তাঁহার নৈকট্য ঘনীভূত করিয়া আনন্দ-রস সিক্ত করিয়া দিয়াছে। (সিদ্ধার্থ শংকর, ২০২৩ : ‘ফ্যাপ’)

ভগবৎ থেকে প্রাপ্ত প্রকৃতি-প্রেম রবীন্দ্রনাথকে আরো বেশি জীবন ঘনিষ্ঠ করেছে; জীবনে জীবন যোগ যে পূর্ণাঙ্গ জীবন তা মূলত মানুষ ও প্রকৃতির সকল উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত বিশ্বজীবন। সেই সমগ্র জীবনের আনন্দ-বেদনা রসে সিক্ত হলেন পূর্ববঙ্গে বাসকালে এখানকার মানুষ ও প্রকৃতির নৈকট্যে এসে। সেই কারণে পূর্ববঙ্গ-কেন্দ্রিক গল্পগুলোতে প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বিত জীবনের চিত্র আঁকলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বুঝলেন প্রকৃতি ও মানুষের এই পরিপূরকতা যেমন চিরন্তন তেমন বহুমাত্রিক।

প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণের সম্মিলনে মানুষ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে আবার প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন হলে মানুষ খণ্ডিত হয়ে যায়, সেই সত্যও চিত্রিত হয়েছে ‘শুভদৃষ্টি’ গল্পে। বোবা বালিকা ও প্রকৃতি মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ সত্যায় পরিণত হয়েছে। জমিদার কান্তিচন্দ্র, বালিকার সৌম্যকান্তিতে মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। বাসর ঘরে অন্য মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে দেখে কান্তিচন্দ্র বিমুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু যখনই জেনেছে তার কান্তিকৃত কন্যাটি বোবা তখনই কান্তিচন্দ্রের মনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। আসলে প্রকৃতির বিচিত্র উপকরণ সহযোগে মেয়েটি সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল, তাই তো কান্তিচন্দ্রের কাছে সমগ্র সুন্দর হয়ে প্রতিভাত হয়েছিল কিন্তু যখনই সে মেয়েটির ভাষাগত সীমাবদ্ধতার খবর জেনেছে তখনই মেয়েটি খণ্ডিত হয়ে গেছে। কান্তিচন্দ্রের মন মুহূর্তে ঘুরে গেছে, অর্থাৎ প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন মেয়েটি নায়কের কাছে অসম্পূর্ণ হয়ে অনাকান্তিকৃত হয়ে গেছে। সুতরাং প্রকৃতির সকল উপাদানের সমন্বয়েই বিশ্বজগতের প্রকৃত সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ *প্রাচীন সাহিত্যে* শকুন্তলা সম্পর্কে যা বলেছেন সেকথা সুভা ও “শুভদৃষ্টি”র নায়িকা সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য : ‘শকুন্তলা তপোবনের অসীভূত। তপোবনকে দূরে রাখিলে কেবল নাটকের আখ্যানভাগ ব্যাঘাত পায় তাহা নহে, স্বয়ং শকুন্তলাই অসম্পূর্ণ হয়।...শকুন্তলা তাহার চতুর্দিকের সহিত একাত্মভাবে বিজড়িত। তাহার মধুর চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জুরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকশিত; পশুপক্ষীদের অকৃত্রিম সৌহারদের সহিত নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট।’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০১১ : ৭২৫-৭২৬)

প্রকৃতি বিচ্ছিন্নতা শকুন্তলতাকে অসম্পূর্ণ করে, একইভাবে “শুভদৃষ্টি” গল্পের বালিকাও প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে খণ্ডিত হয়ে গেল; এটা বাস্তবতন্ত্রের অন্তরের কথা। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানে বোবা বালিকা সমগ্র সুন্দর ছিল, কোনো সীমাবদ্ধতা পাঠকমাত্র আন্দাজ করতেও পারেনি। বাস্তবতন্ত্র মতে, প্রকৃতির জীব উপাদান অন্যান্য উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় আর প্রভাবহীনতা তৈরি হলেই জীবের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। ইংরেজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী আর্থার ট্যাপলী ১৯৩৫ সালে প্রথম এই বিষয়ে বাস্তব ব্যাখ্যা দান করেন। রাশিদা আখতার খানম তাঁর *পরিবেশ নীতিবিদ্যা* গ্রন্থে ট্যাপলীর ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন :

তাঁর মতে পরিবেশের জৈব ও অজৈব উপাদানগুলোর সংহতির ফলে সৃষ্ট তন্ত্র (system) হচ্ছে বাস্তবতন্ত্র। বাস্তবতন্ত্রে জীবগোষ্ঠী অজৈব উপাদানগুলো দিয়ে যেমন প্রভাবিত হচ্ছে তেমনি অজৈব উপাদানগুলোকেও প্রভাবিত করছে। মিথষ্ক্রিয়াটি একটি উভয়মুখী প্রক্রিয়া বলে ধরা যায়। এই প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যা জীবগোষ্ঠীর অস্তিত্বের পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। (রাশিদা, ২০১৬ : ১৪)

ট্যান্সলী প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মিথষ্ক্রিয়ার কথা বলার সঙ্গে সেই মিথষ্ক্রিয়ার অভাবে জীবন হুমকির মুখে পড়ে সে কথাও বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়টিও গল্পগুলোতে তুলে ধরেছেন শৈল্পিক দক্ষতায়। বিশেষত “সমাপ্তি”, “সুভা”, “ছুটি”, “অতিথি”, “শুভদৃষ্টি” গল্প সেই মিথষ্ক্রিয়া ও মিথষ্ক্রিয়াহীনতার প্রত্যক্ষ শিল্পরূপ। কারণ গল্পের চরিত্রগুলো প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে, স্বাভাবিকতা হারিয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে গেছে। উল্লিখিত গল্পগুলো থেকে প্রকৃতিকে বাদ দিলে গল্পের রস শুধু হারায় না, বরং চরিত্রগুলোই অসম্পূর্ণ হয়ে যায়, প্রমথনাথ বিশী একই কথা বলেছেন :

পল্লীগ্রামের মৃন্ময় অংশ বাদ দিলে সমাপ্তি গল্পের মৃন্ময়ী দাঁড়ায় কি? পল্লীগ্রাম ও নদী বাদ পড়লে পোস্টমাস্টার গল্পটি একটি অতি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। পদ্মার রহস্যময় রাক্ষুসী ক্ষুধার উপরেই খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পের ভিত্তি। মেঘ ও রৌদ্র গল্পটি কি শুধু মনুষ্যজীবনের ছায়াতপ সমন্বয়ে রচিত? তার মধ্যে প্রকৃতির মেঘ ও রৌদ্র সমানভাবে কি মিশে যায়নি? বোবা মেয়ে সুভা, পল্লীগ্রামে নদীতীরে প্রকৃতির কোলে তাকে বেমানান হয়নি, প্রকৃতিও বোবা, সে-ও, দুজনে বেশ গায়ে গায়ে মিলেমিশে ছিল— দ্বৌ অপি অর্ত আরণ্যকৌ। শহরে এনে বাপ-মায়ে তার বিয়ে দিল, বধূ যে বোবা ধরা পড়তে দেরি হল না। এই গল্পেরই আর এক পিঠ ছুটি গল্পের ফটিক। পল্লীগ্রামে বেশ ছিল সে; পড়াশোনার জন্য তাকে শহরে পাঠালে বেচারী শুকিয়ে বেঘোরে মারা গেল। (প্রমথনাথ, ১৪২১ : ৫৪)

মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক প্রভাব, প্রকৃতিকে নিজের মনের প্রতিক্রমে দেখার ছবি ফুটে উঠেছে “পোস্টমাস্টার”, “অতিথি”, “সুভা”, “মেঘ ও রৌদ্র”, “মহামায়া”, “দুর্বুদ্ধি” প্রভৃতি গল্পে। চরিত্রপাত্র নিজের মনের ভাবকে প্রকৃতির মধ্যে অবলোকন করেছে। “মেঘ ও রৌদ্র” গল্পে গিরিবালায় বিয়ের পর শশিভূষণ যখন গিরিবিহীন একাকী জীবন থেকে মুক্তি পেতে, গিরির স্মৃতির থেকে পালিয়ে বাঁচতে গ্রাম ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনার প্রাক্কালে মধ্যাহ্নের ঝকঝকে রোদ সরে মেঘ করে বৃষ্টি নেমেছে; শশীর কাছে সব বিষণ্ণ আর মলিন ঠেকেছে: ‘যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিহ্নণ বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল, অনতিবিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যে দিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষণ্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল।’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৯৮ : ২০৪) শশীর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ তখন প্রকৃতিতে, তার কণ্ঠে প্রকৃতি বিষণ্ণ, আলোহীন, হঠাৎ বর্ষণ যেন প্রকৃতির কান্না হয়ে ঝরে পড়েছে। শশীর মনের অবস্থা অনুসারে প্রকৃতি তার সামনে প্রতিভাত হয়েছে, শশীর কাছে তাই রৌদ্রময় দিনও মলিন আর মেঘাচ্ছন্ন মনে হয়েছে। একইভাবে রাজীবের চোখে প্রকৃতির সৌন্দর্য মহামায়ায় সৌন্দর্য হয়ে ধরা দিয়েছিল। বোষ্টমীও তার মনের রঙে প্রকৃতির আকুলতা অনুভব করেছে, তার বিহ্বলতায় প্রকৃতিও বিহ্বল হয়ে উঠেছে। ভরা নদীর ছল ছল জল

রাশি পোস্টমাস্টারের কাছে রতনের চোখের প্রতিক্রিয়া শুধু নয়, নিজের অন্তরের স্নেহের প্রকাশ। এভাবেপ্রকৃতির উপরমানুষের মনের প্রভাব চিত্রিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ‘মানবচরিত্রের এবং ভাবাবেগের সঙ্গে, এককথায় মানুষের জগৎসংসারের সঙ্গে প্রকৃতির জগৎকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীভূত প্রাণের স্পন্দনকে এমন সূক্ষ্ম কলাকৌশলের সঙ্গে এখিত করিয়া যে-অপূর্ব রসসৃষ্টি করিয়াছেন।’ (প্রভাতকুমার ১৪১২ : ২৬৯) তার পরিচয় “মেঘ ও রৌদ্র” গল্পের শেষেও পাওয়া যায়। জেল থেকে বেরিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো হয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে পৌছানোর পর শশী বুঝতে পারল সে তার একান্ত প্রিয়জন গিরিবারার বাড়িতে এসেছে। তখন সে বুঝেছে তার আজকের সকল আয়োজনের পিছনে সেদিনের ছোট গিরি রয়েছে, যাকে একদিন সে অবহেলা করেছিল। তার মনোযোগহীনতায় বনপথ ধরে স্নেহবুড়ু গিরির অভিমানশূন্য ফিরে যাওয়ার ছবি প্রকৃতির সহযোগে রূপায়িত করেছেন :

সেই জঙ্গলে বেষ্টিত, কর্দমাক্ত, সংকীর্ণ গ্রামপথের মধ্যে সেই অনাদৃত ব্যথিত বালিকার অভিমানলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি যেন বিধাতাবিরচিত এক অসাধারণ আশ্চর্য অপরূপ অতি-গভীর অতিবেদনা পরিপূর্ণ স্বর্গীয় চিত্রের মতো তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল।...এবং মনে হইল সেই পল্লী-বালিকার মুখে সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের এক অনির্বচনীয় দুঃখ আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৯৮ : ২০৮)

শশীভূষণ যখন হরকুমারের মামলা নিয়ে রাত-দিন কাজে নিমগ্ন ছিল, তখন শশীর ঘরের জানালার নিকটবর্তী গাছের তলায় এসে নানা ছলে বালিকা গিরি, শশীদাদার মনোযোগ আকর্ষণ করার বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। আশাহত বালিকার হৃদয় বেদনায় সেদিন বিশ্বপ্রকৃতি বেদনার্ত হয়েছিল, তারই ছবি এঁকেছেন গল্পকার।

“বোষ্টমী” গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে বোষ্টমীর মানসিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। সদ্যস্নাতা বোষ্টমীকে বনের মেঠোপথে ভিজে কাপড়ে দেখে গুরুদেব তার দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করলে মুহূর্তের জন্য তার মনও দুলে উঠেছিল। এখানে প্রকৃতির সহযোগে বোষ্টমীর সৌন্দর্য অর্থাৎ ভেজা বসন, নির্জন বনপথ তার সৌন্দর্যবর্ধনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। সেই পরিবেশও গুরুদেবের মনোবাসনা প্রকাশে সাহায্য করেছে। আবার গুরুদেবের মুগ্ধতা প্রকাশে বোষ্টমীর মন পুলকিত হলে প্রকৃতি জগতেও ভাবাবেশ তৈরি হয়েছে। বনবনানীতে আন্দোলন, গাছের শাখায় পাখির ডাক, বনফুল, আমের বোল— সবকিছুতে যেন পুলক জেগে উঠেছে। বোষ্টমী আপন মনের পুলকে প্রকৃতিকে অবলোকন করেছে, মুহূর্তে তার কাছে সব কিছু সুন্দর হয়ে উঠেছে : ‘ডালে ডালে রাজ্যের পাখি ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে বোপে-বোপে ভাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমের ডালে বোল ধরিতেছে মনে হইল সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া আলুথালু হইয়া উঠিয়াছে।’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৯৮ : ৫৬৫) যদিও এই দেখা ব্যক্তির আবেগায়িত চোখে প্রকৃতিকে দেখা কিন্তু প্রকৃতির এই সৌন্দর্য বোষ্টমীর মনের আবেগকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে, সত্য করে করে তুলেছে। বোষ্টমীর মন আর প্রকৃতি একীভূত হয়ে গেছে। এখানেই প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক প্রভাব, নিজের ভাবনার

প্রতিচ্ছবি হয়ে প্রকৃতি আবির্ভূত হয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতি মিলিত হয়ে তখন একক সত্তায় পরিণত হয়েছে : ‘মানবজীবনে ঘটনাস্রোত যেমন বাস্তব, তেমনি বাস্তব ঋতুরঙ্গ, গাছপালা, জল, মাটি, আকাশ; তাদের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগও বিভিন্ন মানবিক সম্পর্কের মতোই সত্য; প্রকৃতিকে বাদ দিলে, জীবনের স্বরূপটাকেই খণ্ডিত করা হয়, বাস্তবের চিত্র সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হ’তে পারে না।’ (বুদ্ধদেব বসু, ১৯৮৩ : ৩৬-৩৭)

“নিশীথে” গল্পে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক প্রভাব দেখা যায়। পদ্মার ভাঙনের মুখে এক বুক আশঙ্কা নিয়ে তীরবর্তী গাছপালা হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে ‘শান্তি’ গল্পের বৃক্ষরাজির মতো। পদ্মা তীরবর্তী গাছ আর দক্ষিণারঞ্জনবাবু প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কগ্রস্ত। প্রকৃতির বনবনানী গল্পের নায়ক দক্ষিণারঞ্জনের মনের প্রতিরূপ, অন্যদিকে তার মনোরোগ হেমন্তের আপত নিশ্চুপ পদ্মার অনুরূপ। হেমন্তের পদ্মা নিশ্চুপ শান্ত আবার হঠাৎ করেই তীরবর্তী ভূমি, গাছপালা ভেঙ্গে ভাসিয়ে নেয়, নায়কের মনোরোগের অবস্থাও তাই, এখনই ভালো পরমুহূর্তে আবার প্রকট। এখানেই প্রকৃতি ও মানুষের চারিত্রিক সাযুজ্য। ‘মন ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্পে আরেকটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে, সেখানে পরিবেশ কিছুটা প্রতীকী তাৎপর্য পেয়ে যাচ্ছে, মনেরই প্রতিচ্ছবি রূপে আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে।’ (গোপিকানাথ, ১৯৯৭ : ৭৭)

প্রকৃতির সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের মানসিক সংযোগ তৈরি হয়েছে। জ্যোৎস্নারাত্রে নদীতীরের বালুতে চাঁদের আলো, নদীর জলের উপর চাঁদের আলোর বিকিমিকি গল্পের নায়কের মনে বর্তমান স্ত্রী মনোরমার প্রতি প্রেমাবেগ করলে স্ত্রীর নৈকট্যলাভে ইচ্ছুক হয়, তখনই উদ্ভূত পাখির ডানার শব্দে তার মনে প্রথমা স্ত্রীর কথার প্রতিধ্বনি হয়ে এসে তাকে দ্বিতীয় স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। প্রকৃতি তাকে আকৃষ্ট করায়, প্রকৃতিই তাবে বিকৃষ্ট করে। প্রকৃতির আবহে মনোরমার প্রতি আকর্ষণ সত্য, তেমন প্রকৃতির মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর কথার প্রতিধ্বনিও স্বাভাবিক; সেখানেই জীবনের সমগ্রতা। বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরীর মন্তব্য যথার্থ :

শুধু রবীন্দ্রদর্শনের খাতিরে নয়, শুধু রবীন্দ্রকাব্যসুলভ সৌন্দর্যবর্ণনার জন্য নয়, কথাসাহিত্যশিল্পের আঙ্গিকের প্রয়োজনে, শিল্পে বাস্তবতা এবং সমগ্রতার প্রয়োজনে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্পে প্রকৃতিকে যুক্ত করিয়া রসঘন করিয়াছেন এবং সুমহৎ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্তরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। এমন অসাধারণ প্রকৃতিযোগ সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ, শিল্পগুণ সার্থক গল্প পৃথিবীর কোনো সাহিত্যেই সুলভ নয়। (বিনয়েন্দ্রমোহন, ১৪১২ : ২৭২)

শুধু সৌন্দর্য নয় বরং জীবনের সমগ্রতার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ গল্পে প্রকৃতিকে যুক্ত করেছেন, যা বাস্তবতন্ত্রের মূল বাণীর বাহন হয়ে রবীন্দ্রগল্পকে সমৃদ্ধ করেছে, জীবনকে সম্পূর্ণ করেছে। “একরাত্রি” গল্পে প্রকৃতিই সুরবালা ও সেকেন্ড মাস্টারকে একত্রিত করেছে। প্রবল ঢেউ সমুদ্রের কাঁকর শামুক শব্দকে হঠাৎ তীরের কাছে নিয়ে আসে, পরের ঢেউয়ে আবার তীরভূমি থেকে সরিয়ে নেয়। গল্পেও প্রবল ঝড়-জলের কারণে হঠাৎ দুটো মানুষ কিছুক্ষণের জন্য কাছাকাছি এসেছে। আবার ঝড় শেষে যে যার জায়গায় ফিরে গেছে। প্রকৃতিতে যেমন হঠাৎ বান আসে আবার নেমে যায়, মানুষের

জীবনেও তাই। বিনয়েন্দ্রমোহনের মত : ‘একরাত্রি গল্পটির পরিণতি এবং নায়কের ব্যর্থ জীবনের একমাত্র সার্থকতা সম্ভব হইয়াছে প্রলয়কালের বিশাল ঝড় এবং সমুদ্রের বন্যায় সাহায্যে। সেই বন্যাই তাহার শৈশবের সাথী কল্পলোকের প্রিয়তমাকে জীবনে একবারের মতো, শেষবারের মতো, একাকিনী একান্তভাবে নায়কের পাশে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে।’ (বিনয়েন্দ্রমোহন, ১৪১২ : ২৭২)

সাহিত্যে প্রকৃতির ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে দৈব ঘটনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রগল্পে প্রকৃতি-মানুষ বিশ্বজগতের অংশ যারা একে উপরের নির্ভর করে এগিয়ে চলে। তাই প্রকৃতি কখনো মানুষের জীবন বাঁচায়, কখনো মানুষের সঙ্গে মিলন ঘটায়, কখনো বিচ্ছেদ ঘটায়, কখনো প্রভাবিত করে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, কখনো একে-অন্যের আনন্দ-বেদনার সঙ্গী হয়। যার উৎকৃষ্ট পরিচয় “পোস্টমাস্টার”, “মহামায়া”, “একরাত্রি” গল্প। মানুষের প্রতি প্রকৃতির এই সংশ্লেষের আর এক শিল্পভাষ্য “আপদ”(১৩০১) গল্প। প্রবল ঝড়বৃষ্টির কারণে নৌকাডুবি হওয়ায় গল্পের নায়ক নীলকান্ত, শরৎবাবুর বাগানবাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। এবং শরৎবাবুর স্ত্রীর স্নেহের বাঁধনে বাঁধা পড়েছে- এভাবেই গল্পের শুরু। সুতরাং ঝড়বৃষ্টি তথা প্রকৃতির প্রভাবেই এই গল্পের সূত্রপাত এবং সেই স্নেহই তার জীবনে ট্রাজিক পরিণতির কারণ। ‘রবীন্দ্রনাথ গল্পে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির জীবন মিশিয়া আছে বলিয়াই এই প্রভাব স্বাভাবিক। ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মিলিবে আপদ গল্পে।’ (বিনয়েন্দ্রমোহন, ১৪১২ : ২৭০) প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ভূমিকায় আপদ একদিকে পেল স্নেহের আশ্রয় অন্যদিকে সেই স্নেহ কাল হয়ে দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের “বলাই” (১৩৩৫) গল্পের বলাই আর এক প্রকৃতিপুত্র, প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক মাতৃজঠরের সঙ্গে সম্ভানের সম্পর্কের মতো। তাই তো জঙ্গলের মধ্যে বেড়ে উঠা শিমুল গাছটির প্রতি তার নাড়ির যোগ। গাছগাছালির মধ্যেই সে জীবনের মূল খুঁজে পেয়েছে। আমের বোল তাকে আন্দোলিত করে, পাহাড়ের গায়ের সবুজ ঘাস দেখলে সে খুশি হয়ে যায়। চেনা-অচেনা গাছের প্রতি তার সীমাহীন মায়া। বনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া শিমুল গাছটিকে সে কিছুতে কাটতে দিতে চায় না। বাবংবার চেষ্টায় মাতৃহারা বলাই, তার কাকাকে গাছটি কাটা থেকে নিবৃত্ত করেছে। শিমুল গাছটির মৃত্যু যেন তার নিজের মৃত্যুর সমান। যদিও সে চলে যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে তার কাকিমার শত বাধা উপেক্ষা করে গাছটি কেটে ফেলেছে বলাইয়ের কাকা। এই ঘটনায় কাকিমা অন্নতাগ করেছিল, কারণ গাছটি কাকিমার কাছে বলাইয়ের প্রতিরূপ। বলাই কাকার বাড়ি থেকে চলে গেলেও গাছটি তার মনে বলাইয়ের প্রতিচ্ছায়া হয়ে ছিল। তাকে ছেড়ে বলাইয়ের থাকতে কষ্ট হয়, তাই গাছটির ছবি চায় কাকিমার কাছে কিন্তু ততদিনে সব শেষ। তারাপদ ও বলাই মূলত রবীন্দ্রনাথের ‘আমিত্ব’ ভাবনার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের এই ‘আমিত্ব’ প্রকৃতি ও মানুষের সম্মিলিত রূপ।

পরিবেশবাদীদের মতো রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়ও মানুষ নিসর্গের অপরিহার্য অংশ, মহাবিশ্ব প্রকৃতির সকল উপাদানের সম্মিলিত রূপ। তাই তাঁর সাহিত্যে মানুষের জীবন রূপায়ণে অনিবার্যভাবে প্রকৃতি এসেছে; মিলে গেছে, পূর্ণাঙ্গতা দান করেছে। তাই জীবন বিচ্ছিন্ন নিসর্গ যেমন নয়, তেমনি নিসর্গ বিচ্ছিন্ন জীবনও তিনি আঁকেননি। রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে এসে দেখেছেন প্রকৃতি ও মানুষ মিলেমিশে শুধু বাস করে না, বরং প্রকৃতি ও মানুষের আন্তঃসম্পর্ক ও আচরণগত সামঞ্জস্য গভীর। তিনি আরো দেখলেন, প্রকৃতির অন্যান্য উপাদান থেকে, তার স্বপরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানুষ হুমকির মুখে পড়ে জীবনহারা হয়ে পড়ে। তাই তাঁর গল্পে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে প্রতিদিনের পরিচিতি সুখ-দুঃখ ভরা জীবনের মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকৃতি ও জীবনের অবিচ্ছিন্নতার যে অনুভব পূর্ববঙ্গে এসে রবীন্দ্রনাথের মনে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল : ‘গল্পগুচ্ছের যুগেই রবীন্দ্রনাথ যেন বিশেষভাবে অনুভব করলেন, আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতি একাত্ম হয়ে আছে।’ (গোপিকানাথ, ১৯৯৭ : ৬৮) এই একাত্মতা অন্তর-বাহিরে। প্রকৃতির সকল উপাদান পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি এবং বহমান। তারপরও বলা যায় প্রকৃতির প্রভাব মানবজীবনে বেশি, তাকে আশ্রয় করেই মানুষের বাঁচা-মরা। সেখানে প্রকৃতি ও তার নিয়ম মুখ্য, তার পটভূমিতে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট বিন্দুর মতো। এটাও দর্শনের প্রকৃতিবাদের অনুরূপ। মানুষ শত চেষ্টায় প্রকৃতির উপর শক্তি ও সামর্থ্যের জয় ঘোষণা করতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি থেকে মানুষকে আলাদা করা যায় না। মানুষ ও প্রকৃতির এই ঐক্যই জীবন।

পূর্ববঙ্গ-কেন্দ্রিক রবীন্দ্র-ছোটগল্পে বিম্বিত হয়েছে বাংলাদেশের হৃদয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে প্রকৃতি ও মানুষের উপস্থিতি কেবল পূর্ববাংলার মানুষের জীবন এবং প্রাকৃতিক অনুষ্ণ হিসেবেই নয়, মানুষ ও প্রকৃতির জীবন্তসত্তা উপস্থাপনে তাঁর সাধনা ছিল অনন্য। শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসর এসে তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষ ও প্রকৃতির যুথবদ্ধতা, একে-অন্যের প্রভাবে বহমান থাকার যে প্রক্রিয়া সেটা অনুভব করলেন, দেখলেন প্রকৃতি ও মানুষের একীভূত জীবন। প্রকৃতি ও মানুষের অবস্থানগত যৌথতার সঙ্গে তাদের মানসিক নির্ভরতা। মানুষের উপর প্রকৃতির অমোঘ প্রভাব। প্রকৃতি পরমশক্তির মতো মানুষকে চালিত করে। পূর্ববঙ্গ-কেন্দ্রিক রবীন্দ্র-ছোটগল্পে রূপায়িত মানুষ ও প্রকৃতির ঐক্যের স্বরূপ উন্মোচন করে তিনি জীবন ও জগতের সমগ্রতার ছবি আঁকলেন; দেখালেন জীবন ও জগৎ ছোট-বড় সকল উপাদানের সম্মিলিত সত্তা। কোনোটি এককভাবে সম্পূর্ণ নয়, সকল ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র উপকরণ মিলেই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি এবং বহমান। তাই, গল্পগুচ্ছের গল্প মানুষ ও প্রকৃতির দ্বিবেণী সঙ্গম। মানুষ ও প্রকৃতির এই সন্নিহিত রূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কলকাতার উঁচুমহলের অভিজাত্যের ভেতর থেকে সত্যিকারের সম্পূর্ণ জীবনবোধে উন্নীত করে বিশ্বসত্তার সঙ্গে যুক্ত করল। তাঁকে করে তুললো মাটি ও মানুষসংলগ্ন সাহিত্যিক, সার্থক ছোটগল্পকার, পরিবাসবাদী সাহিত্যিক ও ভাববাদী দার্শনিক।

সহায়কপঞ্জি

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৯৭)। *রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প*। সাহিত্যলোক, কলিকাতা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০২১)। *আত্মজীবনী*। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

নিশীথ কুমার পাল (২০১৩)। *পরিবেশের জানা অজানা কথা : পরিবেশ বিজ্ঞান*। আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪১২)। *রবীন্দ্র-জীবনী* [৩য় খণ্ড]। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

প্রমথনাথ বিশী (১৪২১)। *শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা।

বুদ্ধদেব বসু (১৯৮৩)। *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য*। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৮)। *গল্পগুচ্ছ*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১১)। *হিন্দুপ্রবালী*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪২১)। *জীবনস্মৃতি*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা।

Rabindranath Tagore (2011). *Rabindra Oeuvre* [Vol.20]. *Complete Works of Rabindranath Tagore*. Pathak Shamabesh, Bangladesh.

রাশিদা আখতারখানম (২০১৬)। *পরিবেশ নীতিবিদ্যা*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সমরেশ মজুমদার (২০১২)। *রবীন্দ্রনাথের গল্প : বিশ্লেষণী পাঠ*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

সিদ্ধার্থশংকর জোয়ার্দার (২০২৩)। *রবীন্দ্র দর্শন : সংশয় ও সমন্বয়*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

Bond, Peter and others (2013). *Geography in Action* [Etd. Andy Owen]. Glossary.

প্রবন্ধ

অজিত দত্ত (২০০০)। ‘রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প’। *রবীন্দ্রছোটগল্প : গল্পগুচ্ছ আলোচনার আলোকে* [সম্পা. অশোক কুণ্ডু]। গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা।

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় (২০০৭)। ‘রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রকৃতি’। *গল্পগুচ্ছ : বিশেষ রবীন্দ্র সংকলন* [সম্পা. অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়]। গল্পগুচ্ছ প্রকাশনী, কলকাতা।

বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী (১৪১২)। ‘রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রকৃতি’। *রবীন্দ্রায়ণ* (১ম খণ্ড) [সম্পা. পুলিন বিহারী সেন]। বাক-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। ‘প্রাচীন সাহিত্য’। *রবীন্দ্র সমগ্র*। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

Siddhartha Shanker Joarder (2016). ‘Rabindranath Tagore and his world’. *Dialectics Development and New Hope*. Jatiya Sahitya Prokash, Bangladesh.

ওয়েবসাইট

নিতিশ চন্দ্র রায়, <https://netbangla.com>

মহাদেব মণ্ডল (২০২৩, জানু ১৪)। ‘পরিবেশ চেকনায় বাংলা ছোটগল্প’। প্রতিভাস। <https://prativasmag.com>

Tansley, A G (2017). Bayne, B L (Vol.41). <https://dio.org/10.1016/B978-0-803472-9.00010-8>

মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ

সাহিত্যিক

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬ ব. ॥ ১৯৫৯ খ্রি.

ru.ac.bd/bangle/bangle-journal-shahittyki

Print : ISSN 1994-4888

বর্ষ : ৬৬ সংখ্যা : ৫৫

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ ॥ মে ২০২৫

প্রকাশকাল : মে ২০২৫

প্রবন্ধ জমা : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রবন্ধ গৃহীত : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পৃষ্ঠা : ১৮৯-২১০

নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস : নির্মাণকৌশল

মো. নাজমুল হাসান

প্রাচ্যক, বাংলা বিভাগ, নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা

ই মেইল : palakhasan40424@gmail.com

সারসংক্ষেপ

রচনার স্বাতন্ত্র্যে বাংলা সাহিত্যে নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮-২০১৪) ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক। ঔপন্যাসিক হিসেবে বিশ শতকের শেষে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। *মগলগে নভেল* নামের খসড়াটিকে বাইরে রাখলে, তিনি মোট আটটি উপন্যাস রচনা করেছেন : *হারবার্ট* (১৯৯৩), *ভোগী* (১৯৯৩), *যুদ্ধ পরিস্থিতি* (১৯৯৬), *খেলনা নগর* (২০০৪), *কাঙাল মালসাট* (২০০৩), *লুপ্তক* (২০০৬), *আটো* (২০০৩) এবং *মসোলিয়ম* (২০০৬)। উপন্যাসগুলোতে তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তথাকথিত গণতন্ত্র, শাসন-শোষণ, আশা-হতাশা, উত্থান-পতন, ব্যক্তি ও শ্রেণির সামাজিক-রাজনৈতিক পরিকাঠামো তুলে ধরেছেন। এর সমান্তরালে গুরুত্বপূর্ণ দিক : উপন্যাসের প্রথাগত কিংবা চলতি কাঠামোর প্রতি তার প্রবল অনাস্থা। ফলে নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসগুলো হয়ে উঠেছে উপন্যাসের চেনা কাঠামো ভাঙা ও নতুন করে নির্মাণের বিরল নজির। এই প্রবন্ধে আমরা তার উপন্যাসের নির্মাণকৌশল সন্ধান ও এর চরিত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস রেখেছি।

মূল শব্দ

উপন্যাস, নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস, উপন্যাসের বিষয়, চরিত্র, ভাষা, গঠনশৈলী।

কেবল বাংলাসাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যেও উপন্যাস ‘সর্বাধুনিক’ সাহিত্যপ্রকরণ। অবশ্য ‘সর্বাধুনিক’ কথাটি খানিকটা ‘সর্বশেষ’ কথাটির শরীরে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০) জানিয়েছিলেন : ‘উপন্যাসের অদ্বিষ্ট সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাসও নয়। উপন্যাসের অদ্বিষ্ট ব্যক্তিমামুষ।’ (রায়, ২০১৬ : ৮৭) আমরা দেখব, শ্রেণিসংস্কার-গোষ্ঠীচেতনা ধারণ করেই হোক, কিংবা তার সবটুকু মুছে ফেলেই হোক; ব্যক্তিজীবনের সবটাকে শিল্পের ছাঁদে ধরার প্রয়াস থেকেই উপন্যাসের জন্ম ও বিকাশ। প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে নির্মিত হয় একটি উপন্যাস? একে চেনার, বিচারের সূত্রগুলোই-বা কী? এখানে কিছু মানদণ্ড আমাদের সামনে দাঁড়ায়। বলা চলে : জীবনদৃষ্টি (author’s view of life), ঘটনাংশ (plot), চরিত্র (character), বর্ণনা (narration), সংলাপ (dialogue), পরিবেশ (environment), সর্বোপরি- ভাষা (language) একাত্ম হয়েই উপন্যাস নির্মিত হয়। উল্লেখ প্রয়োজন, এই মানদণ্ডগুলোকে কিন্তু কোনো সুস্পষ্ট কাঠামো, বিধি কিংবা শৃঙ্খলায় বাঁধা চলে না। ফলে, উপন্যাসের শিল্প-বিচারের কিংবা নির্মাণকৌশল সন্ধানের কোনো তর্কাতীত বাটখারা আজ অদ্বি দাঁড়ায়নি। বরং, সমাজ ও ব্যবস্থার অভিঘাতে, চাহিদায়, জীবন সম্পর্কে নয়া বোধের গড়নে, মেধাবী উপন্যাসিকগণ উপন্যাসের চেনা এই মানদণ্ডগুলো ক্রমাগত ভেঙেছেন। স্বাভাবিক অনুসারে, পুনরায় গড়েছেন। আর, সেখানেই সুপ্ত থাকে তাদের উপন্যাস নির্মাণকৌশলের সূত্রগুলো। বাংলা উপন্যাসের প্রায় দেড়শ বছরের ইতিহাসও এই ভাঙা-গড়ার অনুগামী। এ যুক্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রণেশ দাশগুপ্তের (১৯১২-১৯৯৭) পর্যালোচনা পেশ করছি :

যে বিশেষ তিনটি কারণে যেকোন যুগে যেকোন শিল্পরূপে পরিবর্তন আসতে বাধ্য এবং সমাজ বিপ্লবের প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণত শিল্পরূপের ক্ষেত্রে যে তিনটি তাগিদ পুরাতনকে ভেঙে নতুনের পত্তন করে, সেই প্রয়োজকগুলি উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীতেও সক্রিয়। এই তিনটি প্রয়োজকের প্রথমটি হচ্ছে এই যে, সৃজনশীল শিল্পী প্রচলিতের পুনরাবৃত্তি করে চলতে পারেন না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে, পাঠকপাঠিকাদের সংখ্যাগত এবং গুণগত চাহিদা শিল্পীগ্রহীতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন দিখলয় সৃষ্টি করে শিল্পরূপের প্রচলিত বলয়গুলিকে ভেঙে দেয়। তৃতীয়টি হচ্ছে এই যে, নতুন বিষয়বস্তু চায় নতুন প্রকাশভঙ্গি। এই তিনটি প্রয়োজক অবশ্য বিংশ শতাব্দীতেই কার্যকরী হয়েছে এমন কোন কথা নয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই এই তিনটি তাগিদ কাজ করে আসছে এবং উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যেও এনেছে অফুরন্ত বৈচিত্র্য। (দাশগুপ্ত, ২০১২ : ৪)

ফলে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া অযৌক্তিক হবে না, উপন্যাস নির্মাণের ক্ষেত্রে উপন্যাসিক কোন ধরনের রীতি বা পদ্ধতি অবলম্বন করবেন, তা একান্তরূপে নির্ভর করে তার জীবনদৃষ্টির ওপরে। তার জীবনসংক্রান্ত বোধ ও অভিজ্ঞতার মানসিক রূপই অখণ্ড উপন্যাসের মধ্যে বয়ে চলে, ধরা দেয়। নবাবরূপ ভট্টাচার্য লেখালেখি আরম্ভ করেছিলেন ষাটের দশকের অস্তে। সত্তরে ‘বিনোদনী সাহিত্যে’র যে রঙিন বিকাশ, সে রাস্তায় কখনো অগ্রসর হননি তিনি। সাহিত্য করার নামে বৃন্দ হয়ে থাকেননি বুজোয়া রোমান্টিকতায়। এটাই

সমকালের সঙ্গে লেখক নবারুণ ভট্টাচার্যের বড়ো পার্থক্যের জায়গা। এটি ব্যক্ত করার অপেক্ষা থাকে না, আটচল্লিশে জন্ম হওয়ায়, মানুষকে দুর্বিপাকে ফেলা ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে দিয়েই পরিবর্তিত হয়েছিলেন তিনি। এই কালিক বাস্তবতায় স্বাধীনতা উত্তর জীবনে ব্যবস্থার ‘রিক্ত সারবস্তু’ তিনি খুব ভালো করে চিনে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ষাটের দশকে খাদ্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেননি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়। তবে, সকল কিছু ছাপিয়ে নবারুণ ভট্টাচার্যকে প্রভাবিত করেছিল নকশালবাদী আন্দোলন। সঙ্গে ছিল বিশ্বসাহিত্যের বিশদ পাঠ। এই উপাদানগুলোর সংমিশ্রণেই তৈরি হয়েছিল তার উপন্যাস নির্মাণসম্পর্কিত বোধ। এ নিয়ে কোনো পরিশুদ্ধ-প্রথাগত শিল্প-পদ্ধতিতে তার আস্থা ছিল না। তার উপন্যাসনির্মাণ এক্ষেত্রে বিষয়ের অনুগামী থেকেছে। স্বাভাব্য নিয়ে দেশজ ও বৈশ্বিক সময়ের দাবি মেনেছে। আরেকটি দিক আমরা চিহ্নিত করতে পারি : তিনি তাঁর উপন্যাসগুলোকে নিজের যাপনেরই অঙ্গ বলে বিবেচনা করতেন। *উপন্যাস সমগ্র* (২০১৭)’র ভূমিকায় স্বীকারোক্তি দিয়েছেন :

আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, যে তাগিদ থেকে আমি লিখি তার সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক রদবদলের যে বিচিত্র ও ট্রাজিক সময়ের আমি সাক্ষী তার অনুরণন আমার আখ্যানে রয়েছে— কখনও আমি অংশীদার এবং সব সময়ই ভিষ্টম। তৃতীয় বিশ্বের একজন লেখক হিসেবে সেটাই আমার উপলব্ধি। ... অমানবিকতা ও তৎসংশ্লিষ্ট আবশ্যিক যে বুজরুকির সার্কাসের মধ্যে আমরা রয়েছি তার সঙ্গে কোনোরকম আপোষ অসম্ভব। এটাই আমার ও আমার আর্টটি আখ্যান— এই ন’জনের সম্মিলিত ঘোষণা। (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ৭)

একজন শিল্পী হিসেবে নবারুণ ভট্টাচার্যের নিকটে উপন্যাস ছিল এমন এক মাধ্যম, যার দরজা ‘কখনো বন্ধ হয়না’। তিনি প্রান্তিক-জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধ থেকে, উপন্যাস রচনা করেছেন : যার নিকটে পরিশুদ্ধ শিল্পের থেকেও পরিবর্তনময় জীবন, প্রতিবাদ, বদলাবার চেষ্টা বহুলাংশে মূল্যবান। সেটিই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন তার উপন্যাসে। আর তা তুলে ধরতে গিয়ে উপন্যাসের চলতি ফর্ম তাকে আটকে রাখতে পারেনি। সচেতনভাবে উপন্যাসের প্রথাগত কাঠামোকে ভেঙে নবনির্মাণের প্রয়াস দেখিয়েছেন। এবারে আমরা সেই আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

২

প্রথম উপন্যাসেই নবারুণ ভট্টাচার্য মৌলিকতার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। *হারবার্ট* তার প্রথম উপন্যাস। এখানে আখ্যানকে তিনি দশটি অধ্যায়ে বিভাজিত করেছেন। প্রতিটি বিভাজিত অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে— উনিশ শতকের বিস্মৃতপ্রায় করিদের রচিত পঙ্ক্তির মাধ্যমে। উপন্যাসে পঙ্ক্তিমালার এই ব্যবহার-কৌশল সম্পর্কে স্বপ্নময় চক্রবর্তী (জ. ১৯৫১) নেতিবাচক অভিযোগ দেগেছিলেন : ‘এই উদ্ধৃতিগুলি আমার কাছে বেশ কাঁচা কাজই মনে হয়েছে।’ (চক্রবর্তী, ১৯৯৬ : ৩০) এর পেছনে কতটুকু যুক্তি আছে? এ প্রশ্ন ওঠে। এবারে পঙ্ক্তিগুলো ব্যাখ্যা করে আমরা তার উত্তর

অনুসন্ধান করতে পারি। বলে রাখা প্রয়োজন, ঔপন্যাসিকের এই প্রবণতায় উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) রচিত একাধিক উপন্যাসের কাঠামো ও কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) রচিত *হুতোম পাঁচার নকশার* (১৮৫৮) খানিক সাদৃশ্য মেলে। তবে কেবলই কী অনুকরণ কিংবা পুরনোকে ফিরিয়ে আনা? তা কিন্তু নয়। নবারণ ভট্টাচার্য বরং একটি পুরনো কৌশলকে নতুন করে ব্যবহার করেছেন আখ্যানে। এখানে তাঁর অভিমুখ, ব্যবহৃত পঙ্ক্তিসমূহের মধ্যে নিহিত আধুনিকতা ও জীবনদর্শন। যা পুরো অধ্যায়ের প্রতীকী তাৎপর্য তুলে ধরে পাঠকের সামনে। এখানে নির্বাচিত কয়েকটি অধ্যায়ে ব্যবহৃত পঙ্ক্তি ব্যাখ্যার মাধ্যমে সে যুক্তি তুলে ধরছি। প্রথম অধ্যায়টি ঔপন্যাসিক আরম্ভ করেছেন বিজয়চন্দ্র মজুমদারের (১৮৬১-১৯৪২) পঙ্ক্তির মাধ্যমে : ‘চরণে বন্ধন নাই, পরাণে স্পন্দন নাই,/ নির্বাণে জাগিয়া থাকি স্থির চেতনায়।’ (ভট্টাচার্য, ২০১৫ : ৯) এই পঙ্ক্তিদ্বয় নবারণ ভট্টাচার্য নির্বাচন করেছেন কবির *পঞ্চকমালা* (১৯১০) কাব্যের ‘মধ্যাহ্নে’ কবিতা থেকে। এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে হারবার্টের আত্মহনন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন অনুসারে হারবার্টের আত্মা ইহলৌকিক বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছে। আর, নির্বাণ মৃত্যুপরবর্তী এক উন্নত স্তর নির্দেশ করে। তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ হয়েছে মানকুমারী বসুর (১৮৬৩-১৯৪৩) *কাব্যকুসুমাজ্জলি* (১৮৯৩) কাব্যের ‘সার্থ’ কবিতার দুটি চরণ সন্নিবেশে : ‘মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের!’ (ভট্টাচার্য, ২০১৫ : ২৪) এখানে হারবার্টের জীবনে বুকির সঙ্গে প্রেম ও বুকির চলে যাওয়া সম্পর্কিত মানব জীবনের বিষাদ, শূন্যতা বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায়ে প্রেমহীন হারবার্টের বিরহ-যাতনাকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে চরণটি। উপন্যাসের অন্তিম অর্থাৎ দশম অধ্যায়ের চরণদ্বয়ও অক্ষয়কুমার বড়ালের (১৮৬০-১৯১৯) *এষা* (১৯১২) কাব্যের ‘শোক’ কবিতা হতে গ্রহণ করেছেন ঔপন্যাসিক : ‘বৃথা আসি, বৃথা যাই/ কিছুই উদ্দেশ্য নাই।’ (ভট্টাচার্য, ২০১৫ : ১২৪) এখানে হারবার্টের মৃত্যুপরবর্তী সময় বর্ণিত হয়েছে; যাতে পৃথিবীতে মানুষের জন্য ও মৃত্যু সম্পর্কিত উদ্দেশ্যশূন্যতা প্রমাণিত হয়। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক নবারণ ভট্টাচার্যেও স্বীকারোক্তিও আলোচনার এ পর্যায়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে :

আমি অতকিছু ভেবেচিন্তে লিখিনি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে প্রথমত, ওই কবিতাগুলো আমার খুব প্রিয় এবং এই কবিতাগুলোর মধ্যে আমি দেখেছি জীবনের সমস্ত সঙ্কট। জীবনে আমরা যা যা অনুভব করি সেগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁরা অনুভব করেছিলেন যেমন ইতিহাসগতভাবে আজকে আমি করছি। আমার থেকে মানকুমারী বসু বা অক্ষয়কুমার বড়াল চিন্তাভাবনার দিক থেকে খুব পিছিয়ে ছিলেন বলে আমি মনে করি না। আমি এঁদেরকে আধুনিক বলে মনে করি। (ভট্টাচার্য, ২০১৬ : ৮৬-৮৭)

এর প্রয়োগ নিয়ে ঔপন্যাসিকের সচেতন প্রয়াস না-থাকলেও, এগুলো থেকে আমরা তাঁর উপন্যাস নির্মাণের একটা চেনা-সূত্র আবিষ্কার করতে পারি। অর্থাৎ ইঙ্গিত দেওয়া। যে প্রবণতা তাঁর প্রতীকধর্মী আখ্যান *খেলনা নগরে*ও দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতীকের আড়ালে

চিত্রাঙ্কণ করেন শ্রমিক সমাজের জীবন-বাস্তবতা, তাদের টিকে থাকা এবং শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এই আখ্যানকে সাতটি অধ্যায়ে বিভাজিত করেছেন তিনি : ‘মর্ত্যশরীর’, ‘যোগাঙ্গি শরীর’, ‘হিরণ্য শরীর’, ‘আদিত্য শরীর’, ‘সৌম্য শরীর’, ‘আকাশ শরীর’, এবং ‘অশরীর’। প্রতিটি অধ্যায়ই আগাম বার্তা তুলে ধরে। উপন্যাসে এপিগ্রাফের এই ব্যবহার কৌশলকেই *কাঙাল মালসাট*-এ এসে তিনি খানিকটা বদলে নেন। আখ্যানের প্রথমে নয়, মাঝে এর প্রয়োগ ঘটিয়ে। যেমন : প্রথম অধ্যায়ে তিনি ব্যবহার করেছেন শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের (১৮৬১-১৯০৭) একটি হিন্দি গানের লাইন : ‘ভেইয়া দেশকা এ কেয়া হাল/ খাক মিট্রি জহর হোতি সব, জহর হোই জঞ্জাল’। (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ২৩১) এর মাধ্যমে নবারুণ ভট্টাচার্য একদিকে যেমন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের চেহারা স্মরণ করিয়ে দেন, আবার অপরদিকে স্মরণ করিয়ে দেন, নব্য-উপনিবেশবাদে আক্রান্ত বর্তমান স্বদেশবাসীর ক্ষয়িষ্ণু চিন্তা-চেতনার প্রসঙ্গ। কিংবা, চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্মৃতিপ্রবণ বাঙালি জাতি, তাদের পাঠ বিমুখতাকে ব্যঙ্গ করেন গোবিন্দচন্দ্র দাসের (১৮৫৫-১৯১৮) আরো দুটি চরণ সন্নিবেশে : ‘গু মাখিয়া মারি ঝাঁটা যত মনে লয়!/ বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত করে কয়?’ (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ২৪৭) এভাবে উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়ের অভ্যন্তরেই তিনি কবিতা পঙ্ক্তির সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এই প্রয়োগের আরেকটি বিশেষত্ব হলো : পঙ্ক্তিশুণ্ডা যেমন অধ্যায়টির ভাব প্রকাশে সহায়ক হয়েছে, তেমনি তার মাধ্যমে বাঙালি জাতি ও প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখকের হতাশা ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং আখ্যানের আরম্ভে কিংবা অভ্যন্তরে পঙ্ক্তিমালার এই নিপুণ প্রয়োগকে মোটেই কোনো স্বপ্নময় চক্রবর্তী অভিযুক্ত ‘কাঁচা কাজ’ নয়, বরং আমরা নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস নির্মাণের অন্যতম একটি সূত্র বা মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করতে পারি।

৩

বিশ্বসাহিত্যের মহৎ উপন্যাসগুলোর নির্মাণকলা খতিয়ে দেখতে গিয়ে আমরা উপন্যাস বিচারের একটি চেনা মানদণ্ড হিসেবে পেয়েছিলাম ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞদৃষ্টি (omniscient point of view)। অর্থাৎ, আখ্যান বিন্যাস সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের পূর্বাপর ধারণা। নবারুণ ভট্টাচার্য খুব বৃহৎ আখ্যান রচনা করেননি। এমনকি তার আখ্যানগুলোতে ঘটনাংশ অনেক সময় বিশৃঙ্খল মনে হয়। তার অর্থ কী এটাই দাঁড়ায় যে আখ্যান বর্ণনা ও প্লট বিন্যাসে তার শৈথিল্য ছিল? কোনো পূর্বাপর ধারণা রাখতেন না? তা নয়। আমরা দেখব, তাঁর প্রতিটি আখ্যানেই এই আপাত-অবিন্যাসের মাঝে এক ‘সার্বিক ঐক্য’ গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। মনোযোগী পাঠে সেটি সহজেই আবিষ্কার করা যায়। যা আখ্যানের বিষয় সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বিস্তৃত বোধ ও ধারণার দ্যোতক হিসেবে আমাদের সামনে ধরা দেয়। আখ্যান বর্ণনা ও প্লট বিন্যাস- দু-স্থানেই আমরা এ প্রবণতা খুঁজে পাই। উপন্যাস বয়নের ক্ষেত্রে তার এই সচেতন মাপজোখ হামেশাই চোখে পড়ে। *হারবার্ট* প্রকাশিত হবার পর দেবেশ রায় লিখেছিলেন :

এ উপন্যাসের কোথাও কোনো ইতস্তত নেই, লেখকই লিখতে লিখতে উপন্যাসটিকে জানতে পারছেন এমন কোনো অনিশ্চয়তা নেই। গল্পটা বাড়তে বাড়তে নিজের গতিতে একটা আকার নিচ্ছে এমন কোনো স্বাভাবিকতা নেই। মনে হল, লেখাটির অনেকগুলো খসড়া করে লেখক আগে জেনে নিয়েছেন তিনি কী লিখছেন ও কেন লিখছেন। তাই উপন্যাসটি এতটা মেদহীন। লেখক নিজে নিজের রচনাটিকে আগে থেকে জেনে আসছেন— এই পূর্বজ্ঞান উপন্যাসটির ভেতরে এক প্রজ্ঞার আভা ছড়িয়ে দেয়। আর উপন্যাস মানে কাহিনী, এই হ্রস্বকার রচনাটিতে এমন কোন লাইনও নেই যে-লাইন এগোচ্ছে না, কাহিনী নতুন গতিমুখ পাচ্ছে না। বাংলা ভাষায় সাম্প্রতিক কালে ‘হারবার্টের’ মতো মৌলিক উপন্যাস লেখা হয়নি। এই মৌলিকতাই লেখকের শক্তি।

(ভট্টাচার্য, ২০১৬ : ৭০)

উপন্যাসটির নিবিড় পাঠে এর সত্যতা মেলে। সঙ্গে এই প্রবণতাকে নবায়ন ভট্টাচার্যের উপন্যাস নির্মাণের অন্যতম মানদণ্ড হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। কৌশলটি উপলব্ধি করার জন্য তার কয়েকটি উপন্যাস থেকে আমাদের বিস্তৃত উদাহরণ দিতে হবে। আমরা দেখব, *হারবার্ট* আরম্ভ হয়েছে অতীত ও ঘটমান বর্তমানকালের ত্রিফা প্রয়োগে। নিখুঁত ও গভীর বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। যার মাধ্যমে স্থির করে নিতে পারি, যে বিষয়টি নিয়ে তিনি লিখবেন, তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং পূর্বধারণা নিয়েই তিনি লিখতে বসেছেন। আমরা শুরুটা দেখে নিতে পারি :

‘মুতের সহিত কথোপকথন’-এর অফিস বা হারবার্টের ঘর থেকে অনেক রান্তিরে বমি বমি ধুকনিতে গলির বাড়ি, রাস্তার বাড়ি, কোথায় বাড়িতে ফেরার সময় কথাটা বলেছিল বড়কা। সেই রান্তিরের মালের আসরের পর বাড়ি ফেরাটা কোটন, সোমনাথ, কোকা, ডাক্তার, বড়কা এদের যেমন মনে আছে এখনও, সেটা এলোমেলো। চাঁদের গায়ে স্যাঁতলা। রাস্তার আলোগুলোর পাশে ফেনা ফেনা আলোর গুঁড়ো। গরমে সব হড়কে যাচ্ছে। পেটের অন্তরা থেকে চপ, চানা আর হুইকি, রাম, বরফ জল সব গ্যাঁজগ্যাঁজিয়ে উগরে আসছে। নর্দমার বাঁঝরি দিয়ে ভুরভুর করে আরশোলা বেরিয়ে রাস্তার আলো তাক করে উড়ে যাচ্ছিল। কোকা দণ্ডদের বাড়ির গেটের গায়ে বমি করেছিল। গরম, টক, হড়হড়ে সেই বমির বাঁঝটা কোকা আজও ভোলেনি। ডাক্তার আর কোটন তখন পেছাপে পেছাপে কাটাকুটি খেলছিল। বস্তার মতো একটা তেলচিটে মেঘ আকাশের চাঁদে ঠুলি পরিয়ে দিল। গয়লাবস্তির মুখে সরকারী কল। সেখানে কানিপরা পাগলীবুড়ি পা ছেতরে বসে জল ছেটোচ্ছিল। প্যাঁচার করক্ক করক্ক ডাক শুনে গা-পচা কুকুরগুলো ঘুমের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠছিল। হারবার্ট সরকারের চিলছাদের ওপরে স্টার টি-ভি ধরার বাটি অ্যান্টেনা খসা-তারা ধরবে বলে হাঁ করে তাকিয়েছিল। (ভট্টাচার্য, ২০১৫ : ৯)

শুধু কী জেনে-বুঝে বর্ণনা? তা নয়। বরং প্রবল সচেতন সৃষ্টি। যেখানে নিরেট বর্ণনার তকমা উতরে : ‘বমি বমি ধুকনি’, ‘ফেনা ফেনা আলোর গুঁড়ো’, ‘চাঁদের গায়ে স্যাঁতলা’, ‘সব গ্যাঁজগ্যাঁজিয়ে উগরে আসছে’, ‘বস্তার মতো একটা তেলচিটে মেঘ আকাশের চাঁদে ঠুলি পড়িয়ে দিল’; খণ্ডিত বাক্য ও উপমাসমূহ আখ্যানে যুক্ত করেছে আধুনিক চিত্রকলা ও কাব্যের মহিমা। এবং সেটি উপন্যাসের কাঠামোয় অভিনব-মৌলিক মাত্রা সঞ্চারণের মাধ্যমে আখ্যানের চলতি সরল বক্তব্যকে ভেঙে ফেলেছে। সম্পূর্ণ উপন্যাসেই এ নিখুঁত ও বিস্তারিত বর্ণনার নজির রয়েছে। ভোগী উপন্যাসেও দেখব সর্বজ্ঞ পরিবেশ বর্ণনার এই দক্ষতা :

নিশীথে, সমুদ্রতীরে এই কাহিনীর অবতারণা। ঝোড়ো বাতাস ও সমুদ্র গর্জনের দুই ভীষণ শব্দ মিলে ভীতিপ্রদ এক ধ্বংসের আবহ তৈরি করেছে। তবে অনুমান হয় যে, এই শব্দ আরো ঝোড়ো, আরও ক্ষাপা হয়ে উঠবে। অল্পস্থায়ী বিদ্যুতের ঝলকে, অন্ধকারে, চকিতে দৃশ্যমান হয় বালিয়াড়ি যা ঢাল দিয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে। অতএব শব্দময় অন্ধকাওে এলোমেলো উড়ত থাকা বালুকণা ও বৃষ্টির ছাঁটের মধ্যে অপেক্ষা করতে হয় আরও কয়েক লম্বা যতক্ষণ যুযুধান মেয়েদের মধ্যে আরও বেশি সময় ধরে বলসে দেওয়ার খেলা না জমে ওঠে।

সেই ঝলক অনেকটা ওয়েন্ডিং করার আলোর মতো। তাতে দেখা গেল ঢেউ-এর পাশ ফিরছে বা গড়াচ্ছে একটি কাটা মুণ্ড। মুণ্ডটির চোখদুটি আধখোলা, ঠোঁট একটু ফাঁক, অনেক চুল ও দাড়ি জলে ভিজে লেপটে রয়েছে। ভারি কাতানের কোপে মুণ্ডটি যখন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন হয়তো নেশার বশে বধকর্তার চোখ বা হাতের আন্দাজ একটু বেসামাল হয়ে থাকবে। ফলে কোপটি একটু তেরচাভাবে পড়েছিল। দিবালোক হলে হয়তো নোনা জলে রক্ত ধুয়ে যাওয়ার পরে স্বরনালী বা অনুনালী বিশদ দেখা যেত। কিন্তু এই অন্ধকারে সে আশা করা যায় না। (ভট্টাচার্য, ২০১৪ : ৬৭)

এ কী শুধুই কাটামুণ্ডের বিবরণ? সেই সঙ্গে একটি ভীতিকর পরিবেশ রচনাও উপন্যাসিকের উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত। এই ভীতিময় পরিবেশকে অধিকতর জীবন্ত ও বাস্তবময় করে তোলার অভিপ্রায় থেকে আপাত এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তিনি সচেতনভাবে চয়ন করেন : ‘ঝোড়ো বাতাস’, ‘সমুদ্র গর্জন’, ‘ভীতিপ্রদ’, ‘ভীষণ শব্দ’, ‘ধ্বংসের আবহ’, ‘ক্ষাপা’, ‘বিদ্যুতের স্বল্পস্থায়ী ঝলক’, ‘অন্ধকার’, ‘কাটা মুণ্ড’, ‘আধখোলা চোখ’, ‘বধকর্তা’, ‘কাতান’, ‘কোপে’র মতো শব্দসমষ্টি। যে শব্দসমূহ এই ভীতিকর পরিবেশকে প্রাণময় করে তুলছে বহুলাংশে। এই সর্বস্তর বর্ণনাশক্তি তাকে একজন শক্তিমান উপন্যাসিক হিসেবে আমাদের সামনে জায়গা করে দেয়। আবার এই ঘটনার ঘনঘটা, বিবরণ দেওয়ার দক্ষতা কোথাও কোথাও উনিশ শতকের ‘নকশা জাতীয় রচনা’র বর্ণনা-কৌশল স্মরণ করায়। কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) *হুতোম প্যাঁচার নকশায়* (১৮৬২) দেখি :

কলিকাতা শহরের চারদিকেই ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে, চড়কির পিঠ সড় সড় কচ্ছে কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্ছে; সর্বাপ্তে গয়না, পায়ে নুপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমরে চন্দ্রহার, সিপাই-পেড়ে ঢাকাই শাড়ি মালকোঁচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোবান গামছা হাতে, বিদ্বপত্র বাঁদা সূতা গলায় যত ছুতোর, গয়লা, গন্ধবেনে ও কাঁসারির আনন্দের সীমা নাই— ‘আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন।’ (সিংহ, ২০১৫ : ১৫)

নবারুণ ভট্টাচার্যকে আমরা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক হিসেবে জানি। সেখানে কাব্য, মহাকাব্য, উপন্যাস, নকশা রচনা, সবই রয়েছে। ফলে উনিশ শতকের সাহিত্যের বহু কৌশলকে তিনি নিজের মতো করে আত্মস্থ করেন এবং উপন্যাস নির্মাণে তার প্রয়োগ ঘটান। বর্ণনার এই চেনা-শক্তি আমরা *কাঙাল মালসাট* উপন্যাসেও প্রত্যক্ষ করি। তবে মূলেও আছে জেনে-বুঝে লেখার ক্ষমতা ও পরিবেশন রীতি। যা তাকে অন্য উপন্যাসিকদের থেকে আলাদা করে তুলেছে।

উপন্যাসের যে প্রাথমিক কাঠামো, তা সম্পর্কে খানিকটা অসন্তুষ্ট ছিলেন তিনি : “হারবার্ট-এ আমি এপিসোডিক ভাগ করে নিয়েছিলাম। ‘ভোগী’তে তা করিনি। ‘ভোগী’র বর্তমান গঠনে আমি খুশি নই, সেটা আমি বদলাব।” (ভট্টাচার্য, ২০১৬ : ৭৪) আবার অন্যস্থানে তিনি জানাচ্ছেন : “‘ভোগী’ নিয়ে আমি কিছু বলব না, কারণ ‘ভোগী’ নিয়ে কাজ করছি।” (ভট্টাচার্য, ২০১৬ : ৭৭) এতে উপন্যাস নির্মাণ নিয়ে তিনি কতটা নিরীক্ষাপ্রবণ ছিলেন, সেই পরিচয় আমরা পেতে পারি। তিনি সর্বদাই পৌঁছতে চাইতেন নিজের উপলব্ধির প্রতিশ্রুতি জায়গায়। উপন্যাসের গঠন সম্পর্কে তিনি একাধিক সাক্ষাৎকারে মতামত দিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে :

আমি লেখক হিসেবে খুব আত্মবিশ্বাসী নই। যখন লিখি তখন আমি নিশ্চিতবোধ করি না। যা কিছু একটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে। ফলে আমি পূর্বপরিকল্পিত স্ট্রাকচারের ওপর, গঠনের ওপর ভীষণ নির্ভর করি। ওই স্ট্রাকচারটা আমাকে রক্ষা করে। তা ছাড়া আমার মধ্যে সিমেন্ট সম্পর্কে একটা প্রায় অবসেসন আছে। যদি একটা হলের একদিকে সাতটা আলো জ্বলে, আর একদিকে পাঁচটা আলো জ্বলে, আমি বিরক্তবোধ করি। যদি একটা টেবিলের চারপাশে চারটে চেয়ার থাকার কথা থাকে অথচ একদিকে চেয়ার না থাকে তাহলে আমার মনে হয় সেদিকে একটা গভীর খাদ আছে। সিমেন্ট সম্পর্কে বা স্ট্রাকচার সম্পর্কে আমার এই বোধটা এসেছে তিনটে সূত্র থেকে। প্রথমত আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। ভূতত্ত্ব কিছুদূর পড়েছিলাম। সেখানে স্ফটিকের গঠনের বিস্ময় আমাকে অভিভূত করত। কীভাবে প্রকৃতির মধ্যে এই সিমেন্ট থাকে? দ্বিতীয়ত এই স্ট্রাকচার ও সিমেন্ট বোধটা এসেছে নাটক থেকে। তৃতীয়ত এইটি এসেছে সংগীত থেকে— পাশ্চাত্যের সংগীত থেকে, যদিও ভারতীয় মার্গ সংগীতও আমার যথেষ্ট ভাল লাগে। তবে পাশ্চাত্যের অ্যাবস্ট্রাক্ট সংগীত থেকেই আমি স্ট্রাকচারের আভাস সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পাই। (ভট্টাচার্য, ২০১৬ : ৭৪)

এমন চেতনা থেকেই উপন্যাস রচনায় তিনি বিস্তারিত বর্ণনার পক্ষপাতী। আমরা জানি, আখ্যান বর্ণনার ক্রমনির্ধারক উপাদান হলো প্লট (plot) বা ঘটনাংশ। উপন্যাসের প্রথম যুগে গল্প ও ঘটনাংশের মধ্যে খুব বেশি তফাৎ করা হতো না। সমালোচকদেরও তা স্পষ্ট করে চেনা ছিল না। এডওয়ার্ড মরগ্যান ফর্স্টার (১৮৭৯-১৯৭০) সাহেবের বক্তৃতাতেই এ নিয়ে সচেতন চিহ্ন দেখা গেল যে, গল্প হলো সময়ের পথ ধরে কতগুলো ঘটনা পরপর সাজিয়ে দেওয়া। আর প্লট হলো কার্যকারণ পরম্পরায় গ্রথিত কাহিনি। উপন্যাসতাত্ত্বিকরা : সরল, জটিল, যৌগিক মানদণ্ডে প্লটের শ্রেণিবিভাজনও করেছেন। আমরা দেখব, চরিত্র কিংবা অপরাপর উপাদানও উপন্যাসের জন্য গতিশীল উপাদানরূপে বিবেচিত হতে পারে— তবে সেগুলো প্লটেরই অংশরূপে কাজ করে। প্লট-বিন্যাসই একজন লেখকের স্বকীয়তা বা স্টাইল আমাদের চেনায়। ঘটনাংশ বা Plot সম্পর্কে Meyer Howard Abrams (1912-2015) জানিয়েছেন :

The plot (which Aristotle termed the mythos) in a dramatic or narrative work is constituted by its events and actions, as these are rendered and ordered toward achieving particular artistic and emotional effects. This description is deceptively simple, because the actions (including verbal discourse as well as physical actions) are performed by particular characters in a work, and are the

means by which they exhibit their moral and dispositional qualities. (Abramas, 1999 : 224)

ব্যক্তির সমান্তরালে, তার সময় ও সমাজকেও অনিবার্যভাবে ধারণ করে বলে হারবার্ট উপন্যাসের প্লট সন্নিবেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে প্রথম অধ্যায়ে হারবার্টের আত্মহননের যে ঘটনাংশ বিবৃত হয়েছে, তাকেই সমগ্র উপন্যাসজুড়ে বিস্তারিত করেছেন নবারণ ভট্টাচার্য। আর, উপন্যাসের অভ্যন্তরে প্লটকে উন্মুক্ত করতে গিয়ে তিনি ফ্ল্যাশ ব্যাক (Flash Back) পদ্ধতি অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছেন। যা প্লট-বিন্যাসে আমাদের চেনা-কৌশলগুলোর সঙ্গে খুব একটা খাপ খায় না। সরল-জটিল-যৌগিক মানদণ্ডগুলো খানিকটা গুঁড়িয়ে দেয়। প্রথম অধ্যায়ে উপন্যাসটি আরম্ভ হয়েছে হারবার্টের আত্মহনন সংবাদের মাধ্যমে :

... হারবার্টের বাঁ হাতটা শিরা কাটা অবস্থায় লোহার বালতিতে বরফজলে ডোবানো ছিল। চোখ দুটো অন্ধ খোলা। মুখটা অবশ্য অন্য সময়ের মতো ফরসা আর চোখা চোখা ছিল না। কালি পড়ে গিয়েছিল। মুখটা একটু ফাঁক করা। ডান হাতটা বুকের ওপরে ভাঁজ করে রাখা। অত মদ আনিয়েছিল ছটফটানিটা কম হয় যাতে তার জন্য। (ভট্টাচার্য, ২০১৫ : ১২)

উপন্যাসের অন্তেও তিনি এই আত্মহনন এবং শ্মশানে দাহ প্রসঙ্গেই প্রত্যাবর্তন করেছেন :

পুলিশের কালো মুদ্রাভ্যানে চড়ে হারবার্ট বাড়ি থেকে চলে গেল। ... তত্ত্বপোষের চারকোণে রজনীগন্ধা বাঁধা হয়। তোষকের ওপরে বালিশ দিয়ে তার ওপরে নতুন চাদর দেওয়া হয়। শেষে এত ছেলে হয়ে যায় যে আর একটা টেম্পো নিতে হয়। পাড়া থেকে আর যারা যাবে তারা সোজা শ্মশানে যাবে। (ভট্টাচার্য, ২০১৫ : ৭৩-৭৪)

আবার অভ্যন্তরীণ অধ্যায়গুলোতেও উপন্যাসিক পাঠককে এটি বিস্মৃত হতে দেননি যে হারবার্ট সরকার মৃত, আত্মহত্যা করেছে— বরং এই মৃত মানুষটিরই পরিচয়, সামাজিক অবস্থান এবং আত্মহত্যার কারণ সর্বজ্ঞদৃষ্টি দিয়ে ক্রমাগত টুকরো-টুকরো বর্ণনা করেছেন তিনি। যা ‘ফ্ল্যাশ ব্যাক’ পদ্ধতি ব্যবহারের প্রশ্নেও নবারণ ভট্টাচার্যকে উপন্যাসিক হিসেবে আলাদা করে চেনায়। ভোগী উপন্যাসে তিনি যে ঘটনাংশগুলোর সমন্বয়ে কাহিনি নির্মাণে প্রয়াসী, সেখানে প্রধান ঘটনাংশ ভোগীর বলিদান কিংবা স্বেচ্ছামৃত্যু। এই উপন্যাসে ঘটনাংশ বিন্যাসের ক্ষেত্রে উপন্যাসিক আরেকটি বিশিষ্ট এবং বিকল্প প্রবণতার পরিচয় রেখেছেন। সেটি হলো একটি চলমান ঘটনাংশের অভ্যন্তরে আকস্মিকভাবে আরেকটি ঘটনাংশের অনুপ্রবেশ ঘটানো। যা পূর্বের কোনো উপন্যাসিকের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি না। সম্পূর্ণ উপন্যাসেই নির্মাণ কৌশলের এই প্রবণতাটি পরিলক্ষিত হয়। কলকাতায় সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করছেন :

কলকাতার চাঁদটা তখন বাইপাসের আকাশে চাকতির সাইডগুলো ঘষে ঘষে ধারালো করে তুলছিল। হাওয়ায় নোংরাপচা গন্ধ। বসাক আর বসন্ত হঠাৎ চোঁচিয়ে উঠল, ‘জয় শ্রী খ্রি এক্স।’ এদিক থেকে গৌতমদাও চোঁচিয়ে উঠল,

— হাম সব চোর হ্যায়!

— জয় শ্রী খ্রি এক্স!

— হাম সব চোর হ্যায়!

গৌতমদা ও মিখিল ফোন নম্বর বিনিময় করে। গৌতমদার সেভেন ডিজিট। মিখিলদের এখনও হয়নি। ঘেমো হাতে দুজনে হাত মেলায়। (ভট্টাচার্য, ২০১৪ : ৮২)

এই ঘটনাংশ বর্ণনার অভ্যন্তরেই পাঠককে বিন্দুমাত্র অনুধাবনের অবকাশ না-দিয়ে, পরের লাইনেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন কলকাতা থেকে দূরের মফস্সলে ভোগীর ভোজন প্রসঙ্গে :

ভোগী ডাল খেলো না। আড়ট্যাংরার ঝাল দিয়ে অনেকটা ভাত সাপটেসুপটে খেলো। ঢক্ ঢক্ করে জল খেলো। কালো কালো সুন্দরপনা যে-বৌটি খাবার বেড়ে দিচ্ছিল তারই ঢেলে দেওয়া জলে মুখ ধুলো। কুলকুচির জলটা বেড়ার কানে একটা জায়গায় ফেলল। তারপর পরনের ময়লা কাপড়ে হাত মুখ মুছে বলল, এবারে ও পুকুরে, উত্তরের পুকুরে নাইতে যাবে। (ভট্টাচার্য, ২০১৪ : ৮২)

উপন্যাসের প্লট-নির্মাণে এই প্রবণতার আরও বিশদ প্রয়োগ আমরা দেখি যুদ্ধ পরিস্থিতিতে। উপন্যাসটি রচিত হয়েছে গত শতাব্দীর নব্বুইয়ের দশকের পরিশ্রুতিতে। কিন্তু প্রোটোগনিস্ট রণজয় সেনগুপ্ত মানসিকভাবে বাস করে সত্তরের দশকে। অর্থাৎ নকশালবাদী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে। এই দুটি সময়ের মধ্যে যোগসূত্র ঘটনার অভিপ্রায়ে উপন্যাসিক উপন্যাসে সংযুক্ত করেন নানা তথ্য। ভেঙে ফেলেছেন কালপরম্পরা ও প্লটের আটপৌরে ঢঙ। সমালোচকের মন্তব্য : ‘... খানিকটা চেতনা প্রবাহরীতির ঢঙে এই যাতায়াত, বাস্তব/বর্তমান থেকে অতীত/আত্মকথায় পুরো উপন্যাসজুড়ে একটি শঙ্খিল (spiral) গড়ন গড়ে তোলে। এর সঙ্গে ঢুকে যায় বেশ কিছু রিপটার্জ-এর কোলাজ।’ (শীল, ২০০৮ : ১৮৪-১৮৫) এটা ইঙ্গিতমাত্র, যা ব্যাখ্যা করলে পেতে পারি, আখ্যানগত দিক দিয়ে বর্তমান থেকে অতীতে অবাধ গতায়তাই মৌলত উপন্যাসটিকে অপরাপর উপন্যাস থেকে আলাদা করেছে। উপন্যাসিক বর্তমান প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে করতে অনায়াসে প্রবেশ করেছেন অতীতে। এক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক শক্তি রণজয়ের মতো মানসিক ভারসাম্যলুপ্ত একটি আজীবন বিপ্লবী চরিত্র, ফলে প্লটে কাল ভেঙে গেলেও তা বিশ্বস্ত হচ্ছে। এটি বুঝতে আমাদের বিশদ উদাহরণ টানতে হবে। প্রথম অধ্যায়ে দৃষ্টিগোচর হয় :

বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধটা বেশ ভালো লাগল রণজয়ের। তাহলে এদিকে যুদ্ধ হচ্ছে না। ওখানে একটা লোকাল অপারেশন চলছে। তাকে প্রতিহত করতে, কোণঠাসা করতে, চূর্ণ করতে দরকার অস্ত্রের। ‘চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে চীনা গণমুক্তি ফৌজ ৩২০ টি রাইফেল নিয়ে বিপ্লবী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমরা না হয়, ৬০ টি রাইফেল আর ২০০ টি পাইপগান নিয়ে আমাদের প্রথম গণমুক্তি ফৌজ তৈরি করব।’ পলিথিনের চাদর ও চট দিয়ে জড়ানো মরা মানুষের মতো দেখতে সেই বাড়িলের মধ্যে ঠিক কী কী অস্ত্র আছে তুমি মনে করতে পার রণজয়? দুটো রাইফেল ছিল, না? ১৯১৭-র ৮ এপ্রিল রাশিয়াতে ফেরার জন্য রওনা দিয়েছিলেন কমরেড ভাদিমির ইলিচ লেনিন। ...সেইদিনই লেনিন পেত্রোগ্রাদের ফিনল্যান্ড স্টেশনে পৌঁছলেন। শুরু হল একের পর এক ভাষণ। এর মধ্যে একটা সাঁজোয়া গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে, হাতে এক গুচ্ছ গোলাপ। দু-ঘণ্টা ধরে বলেছিলেন লেনিন। হাজার হাজার কণ্ঠে মাসাই ধ্বনিত হচ্ছিল। প্ল্যাটফর্ম, স্টেশনের বাড়ি— সব বলশেভিক পোস্টার ও ফেস্টুনে ঢাকা। উদ্ভুদ্ধ, উদ্বেল জনতার ওপর একটা সার্চলাইটের আলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

৩.১১.৯৪-তে, শেষরাতে রণজয় শেয়ালদায় পৌঁছল। ...শেয়ালদা ফ্লাইওভারের একটা দোকান সারারাতই খোলা ছিল। চা আর বিস্কুট খেল রণজয়। ট্রেনে বিড়ির গন্ধটা বড় ভাল লেগেছিল। এক প্যাকেট বেঙ্গল বিড়ি আর দেশলাই কিনল রণজয়। দেশলাইকাঠির মাথায় মিশমিশে বারুদটা দেখে বড় ভালো লাগল রণজয়ের। কাঠিটা জ্বলে আগুনটা দেখতে আরো ভালো লাগল। ফাটা পটকার কাগজ, ভুবড়ির খোল, বমি, বোতল, প্যাভেলের আলো, গান সারা শহরে ছড়িয়ে। নিভে আসা কাঠিটা ছুঁড়ে দিল রণজয়। (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ১১৮)

আমরা দেখব, উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণে এখানে ঔপন্যাসিক বর্তমান থেকে অতীতে, আবার অতীত থেকে বর্তমানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই নিরীক্ষা খুব বেশি বাঙালি ঔপন্যাসিকের ভেতর প্রত্যক্ষ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন *কাঙাল মালসাট* নবারুণ ভট্টাচার্যের সবচেয়ে দীর্ঘতম উপন্যাস বলেই স্বতন্ত্র নয়। এটি তাঁর সবথেকে নিরীক্ষাপ্রবণ উপন্যাস রূপেও স্বীকৃত। আর, এই নিরীক্ষার দৃঢ় প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় উপন্যাসটির নির্মাণকাঠামোর প্রতিটি স্তরেই। বলতে গেলে সার্বিকভাবে ঔপন্যাসিক এখানে অপর পথের অনুগামী। যাকে বলা চলে, নন্দনের বিপরীতে প্রতিনন্দনের নির্মাতা। প্লট বিন্যাসের দিক হতেও *কাঙাল মালসাট* প্রায় সম্পূর্ণটাই সচেতনভাবে বিশৃঙ্খল। উপন্যাসে ঘটনার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়েছে আরেকটি ঘটনা। যার সঙ্গে চলমান ঘটনার আপাতভাবে কোনো সম্পর্কই নেই। যা ভোগী ও যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে ভিন্ন দ্যোতক। একাদশ অধ্যায়ে দেখব, ঔপন্যাসিক সরখেলের ইশতেহার এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রসঙ্গটি বর্ণনা করতে করতে অনায়াসে প্রবেশ করেছেন ঔপনিবেশিক প্রেত বেগম জনসনের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে :

একটু সময় গেল। সাধুর ভুরু কঁচকোনো। কপালে ভাঁজ পড়ল। চক্ষু হইল চড়কগাছ।
- তার মানে? ফের প্যাদাপেঁদি। ফের ব্লাড বাথ। এই সরখেল বাধেগাৎ কি নকশাল নাকি? যাক গে বাবা, সে যা হবার হোক। সরকার ও প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। আমি রিস্ক না নিয়ে নোট দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।
দুদিন পরে ফাইল ফেরত এল। ওপরে স্কেচ পেন দিয়ে লেখা- ‘পাগলচোদা’।
বেগম জনসন দণ্ডবায়সের নিকট সব শুনিলেন। নিকটে দণ্ডায়মান একটি স্লেভ গার্লের পিঠে আপনমনে ঘামাচি মারিতে মারিতে বলিলেন, ‘বাট মিস্টার ম্যাজিসিয়ান, এই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ইহার কোনো ম্যাচিউরিটি নাই। শালারা এত বড় দলিল হাতে পাইল কিন্তু মর্ম বুঝিল না। আই অ্যাম রিয়্যালি স্যারি। ...’ (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ৩০৬)

কাঙাল মালসাট উপন্যাসের অভিনবত্ব খুঁজতে হলে আমরা আরও পাব- এখানে ঘটনা আছে একটা। ভদির চাকতির ঘর খোলা। সেটিই সমস্ত ঘটনার উৎসমুখ। সেই ঘটনাটিকে সামনে রেখে সরকার ও পার্টির মধ্যকার ঘটনা আছে। বারবার পুরনো কলকাতার ইতিহাসের ব্যবহার আছে। এই ব্যবহারকে গল্পটির সঙ্গে সমন্বিত করেছেন ভাটের কবিতা। অজস্র জায়গায়, টুকরো টুকরো মন্তব্য ও ডায়ালগ আছে। ঘটনার পর ঘটনা নিরন্তর কেবল ঘটনা : এ যেন শাখা নয়, পত্রের মতো বিন্যস্ত ঘটনা। যা প্লট সম্পর্কে নবারুণ ভট্টাচার্যের প্রথম দিকের উপন্যাসগুলোর সঙ্গেও মেলে না। এর পেছনে লেখকের অজ্ঞতা নয়, বরং রয়েছে ‘সচেতন নির্মাণ প্রয়াস’। নবারুণ ভট্টাচার্যের জবানবন্দি :

‘কাঙাল মালসাট’-এ একটা মাল্টিলেয়ার টেস্ট আছে। ওর মধ্যে একটা planned জগাখিঁচুড়ির চেষ্টা আছে। কাঙাল মালসাটের মধ্যে একটা artistic design নির্মাণের কৌশল অন্যরকমভাবে ব্যবহার করেছি। তবে এটা ঠিক normal realistic plan-এ হয়নি। আসলে আমি একটা নিয়ম ভাঙতে চেয়েছিলাম। (ডক্টার্স, ২০১৬ : ৬০)

প্লট নিয়ে পরিচিত সীমার বাইরে গিয়ে এই ভাঙা-গড়া, নিরীক্ষাকে আমরা নবায়নের উপন্যাস নির্মাণের অন্যতম কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

৫

কাঙাল মালসাট উপন্যাসের নির্মাণ-কৌশলে কার্নিভাল তত্ত্বের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এই ধারণাটির প্রবক্তা মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫)। তিনি র‍্যাবেলের উপন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই কার্নিভাল তত্ত্বের ধারণা প্রদান করেন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এই কার্নিভাল বা মহোৎসবের পরিস্থিতি উদ্ভবের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাচীন ইউরোপে মধ্যযুগে চার্চের রক্ষণশীল সামাজিক শাসনের অভ্যন্তরে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ০৬ জানুয়ারির মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থানে উৎসবের আয়োজন হতো। উৎসব বা কার্নিভালের নির্দিষ্ট দিনে একজন সাধারণ মানুষকে রাজা বানিয়ে, সারাদিন নানাবিধ আনন্দ আয়োজন চলত। তাকে রাজার মুকুট শোভিত করে পুরো গ্রাম ঘোরানো হতো। শেষে সাজানো যুদ্ধ ও মারামারির ভেতর দিয়ে নকল রাজার পতন ঘটত। বাখতিনের মতে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ বসবাস করত এক দ্বৈত আবহে : তাদের জীবন ছিল গির্জার অনুশাসনে শৃঙ্খলিত, আবার সেই বিধিবদ্ধ জীবনের অভ্যন্তরেই কার্নিভালের দিনে তারা খুঁজে নিত মুক্তি। আনন্দের রসদ। এখান থেকেই জন্মলাভ করেছে তার কার্নিভালের ধারণা। বাখতিন তার *Problems of Dostoevsky's Poetics* (১৯৬৩) গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে কার্নিভাল ও এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি জানান :

A new mode of interrelationship between individuals, counterposed to the all-powerful scio-hierarchical relationships of noncarnival life. The behavior, gesture, and discourse of a person are freed from the authority of all hierarchical positions (social estate, rank, age, property) defining them totally in noncarnival life, and thus from the vantage point of noncarnival life become eccentric and inappropriate. (দ্রষ্টব্য : চৌধুরী এবং চট্টোপাধ্যায়, ২০১৬ : ১২২-১২৩)

বাখতিনের মতে কার্নিভালে সব সত্য হয়ে যায়। পাল্টে যায় সামাজিক এবং সত্তার সর্বপ্রকার স্তরবিন্যাস। কার্নিভালে সাক্ষাৎ মেলে : ভাঁড়, ক্লাউন, বামন বা কদর্য চেহারার মানুষদের, যারা সমাজের চোখে আপাত অবহেলিত। বিচিত্র সব অনুষ্ঠানে, শোভাযাত্রায় শোনা যায় প্রান্তিক মানুষদের লঘু কৌতুক, অভিসম্পাত, প্যারোডি, সমাজের চোখে যা অমান্য, অশ্লীল, সেই ধরনের স্বরের সমাগম। বাস্তব এবং কাল্পনিক জগৎ, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, পবিত্র-অপবিত্র সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়

কার্নিভালে। এর চমৎকার উদাহরণ রয়েছে *কাঙাল মালসাট* উপন্যাসে। এখানে কোনোপ্রকার সামাজিক বা আরোপিত ভেদ দেখি না। সর্বত্র একাকার হয়ে গেছে মানুষ এবং না মানুষদের সীমারেখা। আমাদের পরিচিত পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে অবাস্তব এবং হাস্যকর প্রতিপন্ন করে লেখক নির্মাণ করেছেন এক নতুন দুনিয়া। যেখানে বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। উপন্যাসে চোক্তার এবং ফ্যাতাডু বাহিনীর সকলে সম্মিলিতভাবে আয়োজন করেছে গণযুদ্ধের। নেতা ভদি সরকার। তাদের যুদ্ধ সরঞ্জাম, পরিকল্পনাও অদ্ভুত-অবাস্তব। কিন্তু একটা উৎসব-উৎসব আমেজে নবাবরণ ভট্টাচার্য সমস্ত ঘটনাকেই সম্ভবপর রূপদান করেছেন। বাস্তব এবং অবাস্তবের সংমিশ্রণে সৃষ্টি করেছেন এক অদ্ভুত পৃথিবী বা প্রেতশহর কলকাতা। সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকের বেগম জনসন, বয়সের গাছপাথরহীন বৃদ্ধ দাঁড়কাক, অদ্ভুত চাকতির খেলা, নগরপালের কাটামুণ্ড, কমরেড আচার্যের সঙ্গে জ্বালিনের কথোপকথন, উদ্ভূত ফ্যাতাডুদের কাণ্ডকীর্তি, মার্শাল ভদির গণযুদ্ধের আয়োজন : সবমিলিয়ে *কাঙাল মালসাট* উপন্যাসে সৃষ্টি হয় এক অতিলৌকিক এবং কার্নিভালিস্ক পরিবেশ। *কাঙাল মালসাট* থেকে খানিকটা পড়ে নেওয়া যেতে পারে :

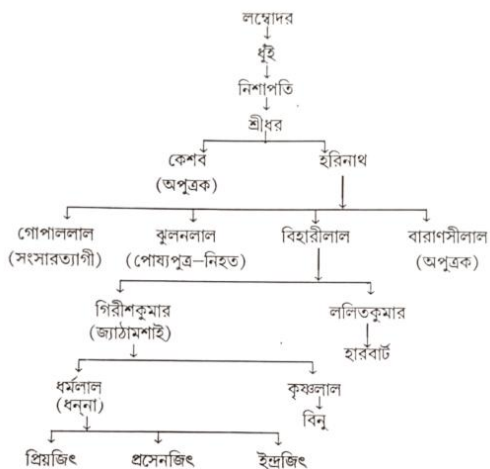
হলে তুমুল হট্টগোল। কেবল চ্যানেলরা ডি. এস-এর ছবি তুলছে। এই সময় হলে আলো নিভে গেল। হেভি গুমুসুলি। কোনো মহিলার চিৎকার। মারপিট লেগে গেছে। টিপু টাপু টিক দেওয়ার সাউন্ড। চেয়ার ভাঙছে। পুলিশ ও হলের সিট দেখানোর আশারদের টর্চ। সেই আলোয় দেখা যায় ডি. এস তিন চার মানুষ হাইটে উড়ে বেড়াচ্ছে। হাতে কর্ডলেস। সব ছাপিয়ে ডি. এস এর স্টিরিও ভয়েস। (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ৩২৩-৩২৪)

বর্তমান সময়ে বসবাসরত কোনো লেখকের পক্ষে আদি, মধ্য, অন্ত সুবিন্যাস্ত করে উপন্যাস রচনা কী সম্ভব? সময়ের বিশৃঙ্খলাই তা করতে দেয় না। এটি নবাবরণ ভট্টাচার্য অনুধাবন করেছিলেন। ফলে উপন্যাসেও তার এই সচেতন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। তিনি বলেছেন : ‘আমি একটু আমোদগেঁড়ে আছি, কার্নিভাল ভালোবাসি। ... এই celebration of life- এইটা কিন্তু আমার কাছে খুব দরকারি একটা ব্যাপার। এইটাই মানে আমাকে অনেক দূর অবধি নিয়ে গেছে মানে ‘কাঙাল মালসাট’ অবধি নিয়ে গেছে।’ (ভট্টাচার্য, ২০১৬ : ৪৭-৪৮) সুতরাং এই বিশৃঙ্খলা, বাস্তব এবং অতিবাস্তবের স্বাভাবিক যোগাযোগ, কার্নিভালের আমেজ আনা; সব জেনে বুঝে করা। যেটাকে আমরা তার উপন্যাস নির্মাণের আরেকটি মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করছি। পুনরায় উনিশ শতকের সাহিত্যের প্রসঙ্গও এখানে এসে পড়ে। কারণ *কাঙাল মালসাট*-এর এই ‘সব সম্ভবের’ একটি প্রাচীন উদাহরণও রয়েছে : ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)’র *কঙ্কাবতী* (১৮৯২)। এখানে অদ্ভুত সব ঘটনা সংঘটিত হয়। বাস্তবে যেগুলো সংঘটিত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভবপর নয়। প্রকৃতার্থে এই নির্মাণও একধরনের শিল্পিত প্রতিবাদের ভাষা সৃষ্টি করে। অনেক সমালোচক *কাঙাল মালসাট*-এর এই প্রবণতাকে ম্যাজিক রিয়েলিজমের প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে এটিকে সহজাত ব্যাপার বলেই মানা চলে। এ নিয়ে নবাবরণ ভট্টাচার্যের বক্তব্য : ‘ত্রৈলোক্যনাথের প্রতি তো আমার ঋণ অপরিশোধ্য। ... আমার মনে হয়েছে যে স্ট্রিট রিয়ালিজম-এর গঞ্জির মধ্যে

না থাকলেও চলে, দরকার নেই, কিন্তু সেটা কৃত্রিমভাবে কেউ যদি নিয়ে আসে তার ভেতর থেকে যদি তাড়নাটা না থাকে তাহলে কিছু হবে না। (ভট্টাচার্য ২০১৬ : ১০৯)পূর্বে উল্লেখ করা গেছে, কাঙাল মালসাট উপন্যাসটি নির্মাণে উনিশ শতকের সামাজিক নকশাধর্মী রচনা কাঠামো ও ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক সেই আদর্শ মেনে উপন্যাসের ভেতর বাঙালিদের আত্মবিস্মরণ ও অসততা নিয়ে একাধিক জায়গায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন তিনি। এটিও তাঁর উপন্যাস নির্মাণের একটি অঙ্গ।

৬

নবাবরূপ ভট্টাচার্যের উপন্যাসে আখ্যান ও প্লট বিন্যাসের কিছু সূত্র উপস্থাপনের পর এবারে উপন্যাস-নির্মাণে তার আরেকটি প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই। সেটি হলো : সাল, তারিখ, ইতিহাস, ভিন্নগ্রন্থ পাঠ, ও তথ্যের ব্যবহার। উপন্যাসকে আমরা বাস্তবনির্ভর সাহিত্য প্রকরণ হিসেবেই জেনে এসেছি। তবুও এটা উল্লেখ করার যে, ইতিহাসের সত্য ও সাহিত্যের সত্য এক নয়। সাহিত্যের সত্য সর্বদাই সম্ভাব্য সত্য। এই ‘সম্ভাব্য সত্য’কেই আরও ‘জীবন্ত’ করে তোলার অভিপ্রায়ে নবাবরূপ ভট্টাচার্য উপন্যাস-নির্মাণ করতে বসে প্রচুর পরিমাণে সাল, তারিখ এবং বংশলতিকা ব্যবহারের সমান্তরালে ব্যবহার করেছেন— বিশদ তথ্যও। হারবার্ট, কাঙাল মালসাট, যুদ্ধ পরিস্থিতি, লুন্ডক থেকে মসোলিয়ম : তার প্রায় সকল উপন্যাস নির্মাণেই এ প্রবণতা দেখা যায়। ক্ষুদ্র উপন্যাস হারবার্ট : কিন্তু এর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে তথ্যের সুপ্রচুর ব্যবহার। যেমন : হারবার্টের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ সংযোজন করতে দেখি তাকে। শুধু কী তাই? বরং, তার পরিচয় ও অস্তিত্বকে আরও প্রামাণ্য করার অভিপ্রায়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি সংযুক্ত করেন একটি পূর্ণ বংশলতিকা (Family Tree) :



হারবার্টের বংশ লতিকা (ভট্টাচার্য ২০১৫: ১৬)

সাধারণত এই বংশলতিকা প্রস্তুত বা গ্রন্থমধ্যে তা সংযুক্ত করা ঐতিহাসিকদের কাজ। কিন্তু, এর মাধ্যমে নবারণ ভট্টাচার্য উপন্যাস নির্মাণের পরিচিত মানদণ্ড ভেঙে ফেলেন। ইতিহাস ও ফিকশনের মধ্যে গোল বাঁধিয়ে। উপন্যাসে দুটি গ্রন্থের কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন তিনি। একটি শ্রীমণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ (১৮৬০-১৯৪৭) প্রণীত *পরলোকের কথা* এবং অপরটি কালীবর বেদান্তবাগীশ (১৮৪২-১৯১১) প্রণীত *পরলোক রহস্য*। গ্রন্থদুটির একাধিকবার উল্লেখের অভিনবত্ব এইখানেই যে, *হারবার্ট* পাঠের সমান্তরালে এই দুটি গ্রন্থের পাঠও চলতে থাকে— যা উপন্যাসপাঠে একটি ভিন্নতর আমেজ সংযুক্ত করে। *পরলোক রহস্য* থেকে উপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন :

পুরাকালে এ দেশে অনেক ভূতবিদ্যাবিৎ ঋষি ছিলেন। শুনিতে পাই, বিদ্যমানকালেও, অন্য ভূখণ্ডেও অনেক ভূতবিদ্যাবিশারদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত ঋষিদিগের মতবৈষম্য দেখা যায়। ঋষিদিগের মতে যাবৎ প্রেত অবস্থা, তাবৎ তাহাদিগকে আহ্বান বা আকর্ষণ করা যায় এবং দেব গন্ধর্ব্বাদি দেবযোনি-প্রাঙ্গুদিগকেও আকর্ষণ বা আহ্বান করা যায়। ... শুনিতে পাই, বর্তমান কালের ভূতবিদ্যাবিশারদদের মৃতমাত্রকেই আহ্বান করিতে পারেন বা করেন; এমন কি, বুদ্ধদেবের আত্মাকেও নাকি কোনো পণ্ডিত আহ্বান করিয়াছিলেন। (ভট্টাচার্য ২০১৫ : ৩৭-৩৮)

একই প্রবণতা আমরা যুদ্ধ পরিস্থিতি উপন্যাসেও প্রত্যক্ষ করি। নকশাল আন্দোলনের তথ্য সন্নিবেশে। এই উপন্যাসের প্রটাগনিস্ট রণজয় একজন নকশাল বিপ্লবী, পুলিশের অত্যাচারে যিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। এই ভারসাম্যহীনতা তাকে কালপরম্পার বাইরে নিয়ে গেছে। আখ্যানে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে গিয়ে ঔন্যাসিক ইতিহাস এবং তথ্য ব্যবহারকে নির্মাণকৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছে। কাহিনির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। তবে সন্দর্ভের কায়দাও অবলম্বন করেননি। রাখেননি কোনো উদ্ধৃত-চিহ্ন, বরং আখ্যানের ভেতরেই পাঠক সন্তর্পনে ঢুকে যাচ্ছে নকশাল আমলের পুস্তিকা পাঠে :

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পুস্তিকাটি কৌশিক কোবাকে দিয়েছিল। কোবা তার বহু জায়গা মুখস্থ বলে যেতে পারে। শ্যামল চক্রবর্তী, প্রবীর রায়চৌধুরী, মদন দাস ও প্রতীপ ঘোষের মুগ্ধ-থ্যাৎলানো মৃতদেহের বিবরণ দিতে পারে। রড, লাঠি, বুলেট, বেয়নেট তরতাজা কয়েকজন জোয়ানকে পিটিয়ে, থেঁতলে, খুঁচিয়ে, চিরে কি বীভৎস চেহারা করে দিতে পারে। পুস্তিকাতে ঐ পাঁচজনের ছবিই ছিল। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল, ১৯৭০, ১৬ ডিসেম্বর। ৯ জনকে হত্যা করা হয়। ১৯৭১, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১ জন মারা যায়, ৫ জন আহত। বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল, ১৯৭১, ২৪ ফেব্রুয়ারি। ৯ জন মারা যায়— ‘নিহত এজন তরুণ বন্দীর (২৪) নাম তিমিরবরণ সিংহ বলে জানা গেছে। ঐর বাড়ি কলকাতায় ছিল। ইনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর (বাংলা) একজন ছাত্র ছিলেন। ... তাঁর আত্মীয়দের কাছ থেকে জানা যায় যে, লাঠির আঘাতে তাঁর দেহ রক্তমাংসের এমন একটি পিণ্ডে পরিণত হয় যে তাঁর শবদেহ শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। চোখদুটিও তাদের স্বস্থান থেকে উপরে উঠে এসেছিল। শবদেহের এই বীভৎস মূর্তির জন্য আত্মীয়রা তাঁর মাকে সন্তানের মৃতদেহ দেখতে দেননি। কড়া পুলিশ প্রহরায় তাঁর মৃতদেহ দাহ করা হয়। (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ১৪৭-১৪৮)

প্রশ্ন ওঠে, এতসব তথ্যের ব্যবহার কী আখ্যানেকে ‘তথ্যভারাক্রান্ত’ করে তোলে? তা করে না। কারণ, আখ্যানে তিনি এগুলো ব্যবহার করেন পরিচিত নিয়ম ও কৌশলের

বাইরে গিয়ে। সেটি হারবার্টে যেমন, যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও তাই। গত শতাব্দীর সাতের দশক থেকেই বাঙালি লেখকদের সচেতন প্রয়াস ছিল উপন্যাসের প্রথাগত কাঠামো পরিহার করে, কাহিনির রুদ্ধ ঘর হতে বের হয়ে আসার, নবরূপ ভট্টাচার্যের সাহিত্যিক মানসও বিকশিত হয়েছে এমন কালিক বাস্তবতায়। দেবেশ রায়কে এখানেও পেশ করা যেতে পারে : ‘যে দুঃসময়ে সময়ের গ্রন্থি ভেঙে যায়, তখনই উপন্যাসিকের উপন্যাস লেখার সুসময়।’ (রায়, ২০১৬ : ১৩) নবরূপ ভট্টাচার্যও এই গ্রন্থিভাঙা সময়ের লেখক। তাঁর *মসোলিয়ম* উপন্যাসটি এই প্রবণতার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ হতে পারে। যেখানে সমস্ত কিছু বিনির্মিত হয়েছে। নির্মাণ-কাঠামোয় এটি সবদিক দিয়ে অভিনব। *মসোলিয়ম*-এ উপন্যাসিক নির্মাণ করেছেন এক প্রতি-উপন্যাস বা বিকল্প-উপন্যাস। তিনি যেন বিকল্প বাস্তবের শিল্পী। *কাঙাল মালসাট*-এ আখ্যানের অভ্যন্তরে লেখকের নিজের সম্পৃক্তি ঘটেছিল কবি পুরন্দর ভট্টকে সৃষ্টির মাধ্যমে। *মসোলিয়ম* উপন্যাসে নবরূপ ভট্টাচার্য সৃষ্টি করেন আরেকটি সাহিত্যিক চরিত্র : সাহিত্যসম্রাট বজরা ঘোষকে। বজরা ঘোষের মাধ্যমে তিনি উপন্যাসের অভ্যন্তরে বয়ন করে চলেন আরেক উপন্যাস : *খানদানি খানকি*। উপন্যাসের প্রথাগত নির্মাণ, আখ্যান, প্লটের ঘাঁচ অস্বীকার করে একই উপন্যাসের অভ্যন্তরে লেখক চালাতে থাকেন দুটি উপন্যাসের সমান্তরাল পাঠ। *মসোলিয়ম* পাঠ করতে করতে পাঠক চলে *খানদানি খানকি*র পাঠে :

নিউ মার্কেটের একটি দোকানে একটি রান্ধুসে সাইজের ডলপুতুল কিনিতে নাছোড়বান্দা খানদানি খানকি সরবে দোকানদারের সহিত দরদাম করিতেছিল। শিবনাথ কুঁই কুঁই করিয়া খানদানিকে সমর্থন জানাইতেছিল। দোকানদারদের রসবোধ প্রভূত। সে বলিতেছিল খানদানির দামেই সে ডলপুতুলটি বেচিতে পারে তবে, সেক্ষেত্রে পুতুলটির জামা-ফ্রক, ইজের ইত্যাদি খুলিয়া লওয়া হইবে। খানদানি ছল্লার দিয়া উঠিল— “ডাকরামুখো, ন্যাংটো পুতুল গছাইবি? দেখিবি? নান্দা ডল দেখিবি? দেখাইব?” হঠাৎ পাশেই জলদগম্বীর-স্বরে কে বলিয়া উঠিল “দেখাইবেন? দেখান।” বিস্মিত নেত্রে সকলে দেখিল বিশাল ভুঁড়িওয়ালা একটি সহাস্য মানুষ। মটকার পাঞ্জাবি ও ফাইন ধুতি পরা। মুখে হাসি। পাঠক জানিলে সুখী হইবেন যে লোকটি আর কেহই নয়। সাহিত্য সম্রাট বজরা ঘোষ। (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ৪০)

এভাবে *মসোলিয়ম* রচনার ফাঁকে ফাঁকে *খানদানি খানকি*র নিবিড় পাঠ চলতে থাকে। উপন্যাসিক নিজেই লেখেন : ‘আমরা বিস্মিত হইয়াছি— বজরা ঘোষের একটি টেকনিকে। সেটি হল নিজের উপন্যাসের মধ্যে স্বনামে লেখকের আবির্ভাব। নিজের নাম না করিয়া যেমন নিজের ছবিতে অটোগ্রাফের মতো উপস্থিত হইতেন ভীতিপ্রদ আলফ্রেড হিচকক।’ (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ৩৯) আবার নবরূপ ভট্টাচার্য নিজেও *মসোলিয়ম* উপন্যাসে এই বিস্ময়কর কৌশলের প্রয়োগ ঘটিয়ে অস্বীকার করেন উপন্যাসের প্রথাগত চরিত্রনির্মাণকে। নিজেও হয়ে ওঠেন আখ্যানের একটি স্বতন্ত্র চরিত্র : বুড়ো দণ্ডবায়স, তিনজন ফ্যাটাডু, গোলাপ মল্লিকের কান্নার বিবরণ দিয়ে বলেন :

‘পাঠক, বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, লেখকও এখন কাঁদছে।’ (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ৩৪) *মসোলিয়ম* নির্মাণে আরেক প্রস্থ অভিনবত্বের পরিচয় রয়েছে। কেবল সংবাদ বিজ্ঞপ্তি সংযোজনই নয়, আখ্যানের অভ্যন্তরে ‘সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার’ নামক সংবাদপত্রটির একটি পূর্ণ সংখ্যা ও সচিত্র বিজ্ঞাপন সংযোজনের মাধ্যমে। পত্রিকাটির সম্পাদক মার্শাল ভদি, বিজ্ঞাপনগুলোও ভদি ও তার দল সংশ্লিষ্ট :

মার্শাল ভদি রচিত ঐতিহাসিক নটক সিকন্দর কা ভগদদর (ছৌ চরিত্র বর্জিত) পুত্ররাজ : মহামান্য সিকন্দর, এত সিংহাসন কেন, আপনার কি ডেকরেটরের ব্যবসা? সিকন্দর : হ্যাং হ্যাং যে সব রাজাকে কেলিয়ে দিয়েছি এগুলো তাদের সিংহাসন। কিন্তু ভগদদরের জ্বালায় একটিতেও বসিতে পারি না। হ্যাং হ্যাং হ্যাং। ভদি বুক হাউস	বিবিধ অশুদ্ধ অনুষ্ঠানে ঘর ভাড়া দেওয়া হয় ভদি-ভবন মায়োনার শ্রী মসলন
মল্ল খরচে, বাড়ি গিয়া কাব্যকৃত্য, মনবা, টিফাকে বিজ্ঞি শেখাই — কে. জি. সরবেল	হিয়া কা মাল ইয়া পাচার করতে ভদি ট্রান্সপোর্ট
আসছে। পরে নরক মজা ভদি-কোলা আসছে।	পুরস্কার ভাট্টের প্রথম কাব্য সংকলন লেতকী ভদি বুক হাউস দূর : কেককীর দর কাব্যকৃত্য
ঘরকুনো, গেছো, বেলে, কুইনিম, বেঁচে সব টাইমের ফিলেদের জগো বেচামনি বিউটি পার্লার	অধিরাম বিনিম পাবেদ্যার ভিজিতে রচিত ডাইনোসরদের তত্ত্ব সাধনা কে. জি. সরবেল ‘টিরানোসরাসের শক্তি-মন্ত্র’ পঞ্চ যঁক বঁচাক বৈদ্যত্ব উক্ উক্ ভদি বুক হাউস
সেনলান, মেন্ডিয়ান, মর্জি, গ্রানেল, হকেট-লম্বার নিজের শাবল ও চারপাল হা তে না তে দু ম দা ম মোহর বারক ককী ভদি বুক হাউস	হা তে না তে দু ম দা ম মোহর বারক ককী ভদি বুক হাউস

মসোলিয়ম-এ সংযোজিত বিজ্ঞাপন (ভট্টাচার্য ২০১৭ : ২৭-২৮)

উপন্যাস আখ্যান ও প্লট নির্মাণে বিকল্প পথের অনুগামী উপন্যাসিক নবারণ ভট্টাচার্য চরিত্র সৃজনের প্রশ্নেও অভিনবত্ব দেখান : *হারবার্টে* আমরা দেখি কীভাবে একটা পরী চরিত্রের মহিমা পাচ্ছে, কিংবা পরলোক থেকে উঠে আসা আত্মা। *কাঙাল মালসাট*-এ বুড়ো দগুবায়াস, বেগম জনসনের প্রেত, সিমেন্ট্রি থেকে উঠে আসা চার্ণক, ক্লাইভ, স্তালিন, না-মানুষ ও অতিলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফ্যাটাডুরা। *লুন্ডক* উপন্যাসে চরিত্র না-মানুষ প্রাণীরা কুকুর ও বেড়াল। তাদের মুখে আবার বসিয়ে দেন বিশ্বস্ত ডায়ালগও। এ নজির আমরা বাংলা সাহিত্যে খুব একটা দেখি না।

৭

কথাসাহিত্যের একটা অংশ হিসেবে উপন্যাসকে বলা যেতে পারে মৌলত ভাষারই কাজ। ভাষার প্রয়োগে কোনো উপন্যাসিক তথ্যনিষ্ঠ, কেউ মানবধর্মী, কেউ আবার

অংলকারময় কাব্যিক ভাষায় সিদ্ধ। তাহলে নবাবুণ ভট্টাচার্যকে আমরা কীভাবে চিহ্নিত করব? দেখা যায় প্রতিটি আখ্যানেই তিনি নিজস্ব বাকশৈলী বা স্টাইল গড়ে বহু ব্যবহৃত ভাষার মধ্যেই স্বকীয় ব্যঞ্জনা তৈরি করার পক্ষপাতী। এই পথেই তিনি তাঁর রচনায় প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রথাগত, প্রচলিত ভাষারীতিকে। তার আখ্যানগুলোর কলেবরে খুব বৃহৎ নয়। তিনি অধিকাংশ স্থানে ছোটো বাক্য ব্যবহারের প্রতিই আস্থা রেখেছেন। এবং সেটি ব্যাকরণের জাল ছিড়ে। শব্দের পরিচিত অবস্থানকে অস্বীকার করে। এটিও বলে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি প্রায় বিশ বছর ধরে উপন্যাস লিখেছেন— এই পরিসরে তার ভাষাও বদলেছে বহুবার। তবে ঐক্যের সূত্রটা এখানেই খুঁজে পাওয়া চলে যে, নবাবুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা একইসঙ্গে তাঁর নান্দনিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক চেতনার স্থানটিও প্রকাশ করে চলমান থেকেছে। এ প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে সংহিতা সেনের মূল্যায়ন তুলে ধরছি :

ভাষা নবাবুণ ভট্টাচার্যের নান্দনিক ও সাহিত্যিক রাজনীতির বিপুল অংশজুড়ে আছে।... শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণের পরিশীলিত ভাষা ব্যবহার করলে তা সম্ভব নয়। ভাষাগত বৈচিত্র্য তাই নবাবুণ ভট্টাচার্যের লেখায় সাহিত্যিক বাস্তবতা নির্মাণের মূল উপাদান। (চৌধুরী এবং চট্টোপাধ্যায়, ২০১৬ : ২২১)

বাংলা উপন্যাসের ধারায় প্রচলিত যে ভাষারীতি আমরা প্রত্যক্ষ করে এসেছি, হারবার্ট উপন্যাসের ভাষারীতি সে ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কেবল এই উপন্যাসেই নয়, সকল উপন্যাসেই তাঁর চরিত্রসমূহের পরিচিতি নির্ভর করে তাদের ব্যবহৃত ভাষার ওপর। হারবার্ট, ভোগী, কাঙাল মালসাট, অটো— সব আখ্যানেই তাই। এটি একটি চেনা কৌশল হিসেবে ধরা যায়। হারবার্ট-এ চরিত্রগুলো সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের নিরিখে প্রায় নিকটবর্তী, কিন্তু তারা একই ভাষায় কথা বলে না। সামাজিক ভাষাবিজ্ঞানে যাকে ব্যক্তিভাষারূপে অভিহিত করা হয়, তার নিপুণ প্রয়োগ দেখা যায়। হারবার্ট উপন্যাসে এই ব্যক্তিভাষার প্রয়োগ চরিত্রগুলোকে নিজস্বতা দানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। হারবার্ট সাধারণ অপর এক মানুষ। গৃহেই তার জগৎ। ফলে পুরনো কলকাতার যে কথ্য ও ঘরোয়াবুলি, সেটি তার বাকভঙ্গিতে সহজেই ধরা দেয়। জ্যাঠাইমার মতো মেয়েদের ভাষাও তারই অনুগামী। ধন্য পুরনো কলকাতার হলেও বাইরে কাজ করে, শঠ মানুষ, তার মুখের ভাষাতে আমরা সে গতি প্রত্যক্ষ করি। আবার, সুরপতি মারিক একজন কর্পোরেট ফড়ে। লোক ঠকানো, লোভ দেখানো— এরকম চটক তার ভাষায় হাজির। উপন্যাস থেকে এদের কিছু নির্বাচিত সংলাপ তুলে ধরছি। তাহলে বিষয়টি বোধগম্য হবে:

ক. হারবার্টের ভাষা :

যদি দেখো গাছটা মরে গেছে তাহলে ওটাকে তুলে ফেলে ভাল একটা ডাল সামনের বর্ষায় পুঁতে দিও। আর বেঁচে থাকলে তো কতাই নেই। দিনকয়েক গোড়া ভিজোলেই জানান দেবে। ...আসলে কী জানো? টান! টান! মরে গেলাম। পুড়িয়ে দিল। কিন্তু যেখানে টাঁক সেখানে তো মন সারাক্ষণ পড়ে থাকবে। যাবে কোথায়। সবই অন্তরালের খেলা। অন্তরালের লীলা! কত রকমের যে বন্দোবস্ত। পরে একদিন বলবোখন বড়িঁদা। এখন যা বললাম করো দিকিনি। (ভট্টাচার্য, ২০১৫ : ৪০)

খ. ধন্বার ভাষা :

দ্যাকো মা, যা বোজো না তাই নিয়ে কাঁই কাঁই মোটে করবে না। আমি কি স্বার্থ থেকে বলচি। আমি বলচি অব্যেসের কতা। খেতে পরতে পাচ্ছে। তার ওপর এটা গুটা তো আছেই। তার ওপর যদি ওপরঝোঁকা হয়ে আজ টিয়া, কাল কাকাতুয়া এনে দাও পরে সামলাবে কে? এরপর বাড়ির ভাগ চাইবে, ঘরদালান চাইবে। (ভট্টাচার্য, ২০১৫ : ২৭-২৮)

গ. সুরপতি মারিকের ভাষা :

গুড! গুড, ওসব গ্যাঁজাগ্যাঁজি আমিও ডু নট লাইক! মোদা কথাটা হল তোমাকে আমি টপ লেভেলে নিয়ে যাব। তাতে আমারও স্বার্থ থাকবে। মিনিমাগনা এই ছইক্ষিটা তাহলে কিনতুম না। আর যাই করো, আমাকে চোদু ভেব না। তোমার মতো কাঁড়ি কাঁড়ি হারবার্ট আমি ফেলেছি। আবার ছেঁকে তুলেছি। (ভট্টাচার্য, ২০১৫ : ৫৫)

নবারণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসসমূহে সাধারণত বাংলা সাহিত্যের মূলশ্রোতে উপেক্ষিত, নিম্নবর্ণের মানুষেরা উঠে আসে; উঠে আসে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে। সমাজের এই মানুষগুলো সবসময় মান্যভাষায় কথা বলে না। তাদের বাক্যলাপের নিজস্ব ভঙ্গি রয়েছে, যে বাচনভঙ্গিতে ব্যাপক পরিমাণে উপস্থিত থাকে ‘খিস্তি’ বা স্ল্যাং। কাঙাল মালসাট-এর চরিত্রসমূহের মুখের ভাষায় বিদ্যমান রয়েছে সেই শক্তি; যার দ্বারা প্রচলিত ব্যবস্থাকে প্রবলভাবে করা যায়। একই প্রবণতা হারবার্ট ও মসোলিয়াম উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মুখের ভাষাতেও আমরা প্রত্যক্ষ করি। উপন্যাসের প্রচলিত ভাষা-ভঙ্গি চূর্ণ করে ঔপন্যাসিক অনায়াসে মানুষের মুখের ভাষায় বসিয়ে দিয়েছেন অশ্লীল শব্দ, আদি রসাত্মক বাক্যভঙ্গি এবং কিছু অর্থে অপভাষা। আবার কখনো নির্বিকারভাবে এসব শব্দের পাশেই ব্যবহার করেছেন— তৎসম শব্দ, নানা বিদেশী শব্দ, পদ্য ও ছন্দ ইতিহাস। নিয়ম ভাঙাটা যেখানে সহজেই চোখে ধরা দেয়। স্ল্যাং ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে যৌনতারও, তখন তা মাত্রা পায় অশ্লীলতার। যাতে করে সাহিত্যে শ্লীলতার প্রশ্টি দাঁড় হয়। এ সম্পর্কে অত্র বসু (জ. ১৯৬৯) মন্তব্য করেছেন :

যৌনতার বিষয়টি যেমন নানাভাবে সামাজিক জুগুলার বিষয়, ভাষার মধ্যে স্ল্যাং-ও তেমনই কিছুটা অপাঙক্তেয়। স্ল্যাং বিষয়টি একান্তভাবে সমাজ নির্ভর। কোনো শব্দ স্ল্যাং কি স্ল্যাং নয়, তা নির্ভর করে সমাজে শব্দটির গ্রহণযোগ্যতার ওপর। স্ল্যাং বস্তুতপক্ষে, হল একটি বিশেষ বাক্যরীতি যা মান্যভাষা বা standard dialect-এর থেকে কিছুটা বিচ্যুত (deviated); বিভিন্ন ধরনের শব্দ যেমন খণ্ডিত শব্দ, মুগ্ধমান শব্দ, বিদেশী শব্দ বা একেবারেই সম্পূর্ণ নতুন শব্দ ইত্যাদিও দ্বারা গঠিত এই বাক্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এখানে প্রচলিত অর্থের চেয়ে অন্য কোনো ব্যঞ্জিত অর্থই প্রাধান্য পায়। স্ল্যাং-এর সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল স্ল্যাং তথাকথিত ভদ্ররূচি বহির্ভূত একটি বাক্যরীতি, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো অশ্লীল (vulgar) শব্দ। (বসু, ২০১০ : ৩৫৮)

হারবার্ট উপন্যাসে আমরা স্ল্যাং-এর ব্যবহার দেখি। ‘খানকির ছেলে’, ‘কামাবে’, ‘ঠাপ খেতে’, ‘মারাতে’, ‘চুদুরবুদুর’, ‘বলাৎকার’, ‘মারাজে’, ‘খিচে দেব’, ‘বাপ্তত’, ‘নেটিভ মাগী’, ‘চোদু’, ‘পোঁদে’, ‘বেবুশ্যে’, ‘বোকাচোদা’ প্রভৃতি। কাঙাল মালসাটেও দেখা যায় প্রায় প্রতিটি চরিত্রই অনায়াসে খিস্তি খেউরের ব্যবহার করে। তাদের ব্যক্তিভাষা নির্মাণে আস্থা রেখেও নবারণ ভট্টাচার্য এখানে সামাজিক শ্রেণিগত কারণে, খিস্তি প্রয়োগের এই আপাত সারলীকরণ করেছেন :

ক. ভদ্রির ভাষা :

এই তিনটে বানচোৎকে আবার নিয়ে এলি কেন? (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ২৪১)

— এই জানবে। ভদ্রি সরকার যকন খেলতে শুরু করবেনা তখন দেখবে সব শালা পৌঁদ সামলাতে ব্যস্ত। সামনে পড়লেই মেরে দেবে। (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ৩২৩)

খ. ফ্যাভাডুদের ভাষা :

এই কারণে যে নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা জ্ঞানের কবিতা। লোকে কবিতা পড়বে আনন্দ পেতে, ওসব জ্ঞানমারানি ঢপ লোকে শুনতে চায় না। (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ২৪৩)

কে খিস্তি করবে? কোন ল্যাণ্ডা খিস্তি করবে? (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ২৫৪)

গ. দগুয়াসের ভাষা :

— চার্নক ওয়াজ এ গ্রোট বাল। ওই বোকাচোদা এল আর গঙ্গার পাড়ে হেগে কলকাতার পত্তন করল— তোর মতো হারামি না হলে ওই লুটেরা মাগিবার্জটাকে আদিপিতা বলে চালানো যেত? ছাগলের দেশে রামছাগল যা বলে সেটাই অকাট্য যুক্তি। (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ২৯৫)

ঘ. বেচামণির ভাষা :

— তো কী বলবে?বলো! লোককে জিগেস করই দেখো না। কী বলবেটা কী? বাজারখোলার খানকি? একটা গ্লিসারিন সাবান চেইচি, তাই কত চোপা! (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ২৯৭)

বলতে গেলে ঔপন্যাসিক এখানে সাহিত্যের ভাষাকে মানুষের মুখের ভাষা করে তুলেছেন। দুটি ভাষার মধ্যে কোনপ্রকার প্রভেদ রাখেননি। কাঙাল মালসাটের ভাষাশৈলীর আলোচনায় আমরা স্মরণ করি, সাহিত্যে ব্যতিক্রমী ভাষার আরেক প্রয়োগকারী কমলকুমার মজুমদারকে (১৯১৪-১৯৭৯)। তিনি বলেছিলেন, যে ভাষাকে আক্রমণ করে, সে-ই ভাষাকে বাঁচায়। নবাবুণ ভট্টাচার্য কী তবে এই আক্রমণ করতে চেয়েছেন? কথাটি ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কারণ ভাষায় নতুন শক্তি সঞ্চারের জন্য সেই শ্রেণির ভাষা, যাকে সাহিত্যের কলমে তুলে ধরা হয় না। তুলে ধরা হয় না এই শ্রেণির মানুষদেরও। সাহিত্যে এদের তুলে আনার মূলে আছে জীবনকে গভীরভাবে দেখা। সেখ মোফাজ্জাল হোসেন জানান : ‘নবাবুণ এক্ষেত্রে কল্পনাশক্তি খরচের চেষ্টা করেননি, যতটা কাজে লাগিয়েছেন পর্যবেক্ষণশক্তি।’ (হোসেন, ২০১১ : ২০৮) ঔপন্যাসিকের এ ভাষা-বিপ্লব অনেকক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন সিংহ ও প্যারীচাঁদ মিত্রকে স্মরণে আনে। উনিশ শতকে সাহিত্যের বিদ্যাসাগরীয় ভাষাকে যারা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। সংস্কৃত নির্ভরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেগে, সাহিত্যের ভাষাকে এনছিলেন মুখের ভাষার কাছাকাছি। বিশ শতকের শেষে এসে, তাদেরই উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা পাচ্ছি নবাবুণ ভট্টাচার্যকে। এ প্রসঙ্গে তার যুক্তিও খতিয়ে দেখা যেতে পারে, যেখানে জীবনকে গভীরভাবে দেখার বাস্তবতাই খুঁজে পাওয়া যায় :

লেখক নবাবুণ সমাজের প্রান্তবাসী মানুষের কথা বলবে। তাদের মতো করেই বলবে। সেই প্রান্তবাসী মানুষের মুখে সাধু ভাষা গুঁজে দিতে পারবে না লেখক নবাবুণ। আর আমার লেখায় স্ল্যাং-এর ব্যবহার নিয়ে প্রচুর কথা আগেও বলা হয়েছে। আমি ওগুলোকে বলি অপ্রাপ্তবয়স্ক সমালোচনা। পাত্তাও দিই না। আমার লেখায় যে স্ল্যাং থাকে তা মানুষকে সম্মানিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর সেই ব্যবহার আমি যথেষ্ট দায়িত্বসচেতন ভাবেই করি। (ভট্টাচার্য, ২০১৬ : ২০)

ভাষিক এই বিদ্রোহকে আমরা উপন্যাস নির্মাণে তার একটি চেনা মানদণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি। আর ব্যাখ্যার প্রশ্নে বলা চলে, এই ‘খিস্তি’ শব্দগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতার্থে উপন্যাসিক চরিত্রগুলোর বক্তব্যকে আরো জোড়ালো এবং জীবন্ত করে তুলতে সক্ষম হন। আখ্যান বর্ণনায় নবারণ ভট্টাচার্যকে কখনো কখনো কাব্যিক হতেও দেখা গেছে। হারবার্ট ও ভোগী আরম্ভের বিবরণে আমরা সে পরিচয় পেয়েছি। ভাষাভঙ্গির প্রয়োগে তার আরেকটি প্রবণতা হলো— ব্যাপক আকারে দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার। যা উপন্যাসের গদ্যকাঠামোকে ব্যঞ্জনাবহুল করে তুলেছে। ভাষাকে প্রদান করেছে গতিশীলতা :

ক. হারবার্ট

কিছু সেও বমির সুতো সুতো লালা ঝুলিয়ে দৌড় দিল কারণ পাড়া জাগিয়ে সোমনাথ চোঁচাচ্ছিল, খেড়োরবি আসছে। (ভট্টাচার্য, ২০১৫ : ৯)

দেখল হারবার্ট থরথর করে কাঁপছে। হাঁসফাঁস করছে, ঘামছে। ... টেবিল ফ্যানটা এমাথা ওমাথা করছিল আর হারবার্ট তার সঙ্গে সরে সরে হাওয়ার সামনে থাকার চেষ্টা করছিল। (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ১২)

খ. ভোগী

নিজের ঘরে মিথিল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল যে, সে অ্যামেরিকায় গেছে। (ভট্টাচার্য, ২০১৪ : ৬৮)

নেশার ঝোঁকে আকাশ তরায় তরায় সরগরম। (ভট্টাচার্য, ২০১৪ : ৭৫)

গ. কাঙাল মালসটি

ওসব পোয়েট ফোয়েট মানুষের কিছু বলা যায় না মশাই। হয়ত গঙ্গায় ডাইভ দিয়েছে। এতক্ষণে স্যান্ডহেড। (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ২৬৪)

দাঁড়কাক ফের চুক চুক করে বাটি থেকে বাংলা খায়। (ভট্টাচার্য, ২০১৭ : ২৭৭)

প্রথম বাক্যটিতে ব্যবহৃত দ্বিরুক্ত শব্দ ‘সুতো সুতো’ আমাদের সামনে বমি পরবর্তী অবস্থায় একজন ব্যক্তির অসুস্থ অবস্থার সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। দ্বিতীয় বাক্যটির ‘থরথর’, ‘হাঁসফাঁস’, ‘এমাথা ওমাথা’, ‘সরে সরে’ শব্দ চারটি হারবার্টের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা এবং তাৎক্ষণিকতা বোঝাতে সহায়ক। ‘ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে’ শব্দ প্রয়োগ যেন স্বপ্নের অর্থহীনতার প্রতি ইঙ্গিত নির্দেশ করে। ‘তরায় তরায়’ কথাটি নেশার সঙ্গে ভারাক্রান্ত আকাশের প্রতিমূর্তি উপস্থাপন করে। ‘পোয়েট ফোয়েট’ তেমনই কোনো বিষয়ে বিদ্রূপ করালে প্রবল জীবন্ত করে। ‘চুক চুক’ কথাটিও খাওয়ার একটি বিশেষ ছন্দ উপস্থাপন করে। সুতরাং, দ্বিরুক্ত শব্দের বহুল ব্যবহারকেও নবারণ ভট্টাচার্যের ভাষা নির্মাণের একটি বিশিষ্টতা হিসেবে আমরা চিহ্নিত করছি।

৮

উপন্যাস নির্মাণে নবারণ ভট্টাচার্য যে কৌশল বা কাঠামোর ব্যবহার করেছেন, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলতি ধারা ভেঙে এগিয়ে গেছে। কয়েকটি উপন্যাসের অধ্যায় বিন্যাসে উনিশ শতকের উপন্যাস কাঠামোর অনুসরণ পরিলক্ষিত হলেও, তা সার্বিকভাবে নব-নির্মাণ। আখ্যান, প্লট, চরিত্র বিন্যাসের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি

বিকল্প পথের অনুসন্ধান করেছেন। ভেঙেছেন চেনা ছক। তার রচনায় সচেতনতা সহযোগে পরিহার করেছিলেন গদ্যের প্রথাগত নিমিত্তিকেও। মান্য ভাষার পরিবর্তে প্রান্তিক মানুষের মুখের ভাষার ব্যবহার, ভাষার অভ্যন্তরে স্ল্যাং শব্দ ব্যবহার, প্রচুর পরিমাণে দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার এবং মিশ্র গদ্যরীতি অনুসরণ করে উপন্যাসের ভাষা-নির্মাণে তিনি স্বকীয়তার প্রমাণ রেখেছেন। এই ভাষাই সমাজ, রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী চরিত্র এবং প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিষয় নির্মাণে তার উপন্যাসে আধারের ভূমিকা রেখেছে। তিনি আদতে একজন প্রতিবাদী উপন্যাসিক। বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত চেতনা যাকে সর্বদাই উপন্যাস নির্মাণের চেনা-কৌশলের বাইরে নিয়ে গেছে।

সহায়কপঞ্জি

অদ্বয় চৌধুরী ও অর্ক চট্টোপাধ্যায় [সম্পা.] (২০১৪)। *নবাবরূপ ভট্টাচার্য : মনন ও দর্শন*।

ঐহিক, কলকাতা।

অত্র বসু (২০১০)। ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি : বাঙালি সমাজে যৌনতা স্ল্যাং-এ ও প্রবাদে’।

যৌনতা ও সংস্কৃতি [সম্পা. সুধীর চক্রবর্তী]। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (২০১৫)। *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (৪র্থ সং.)। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

দেবেশ রায় (২০১৬)। *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে* (২য় সং.)। দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

নবাবরূপ ভট্টাচার্য (২০১৪)। *অটো ও ভোগী* (২য় সং.)। দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

_____ (২০১৫)। *হারবার্ট*। দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

_____ (২০১৬)। *কথাবার্তা* (২য় পুনর্মুদ্রণ)। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা।

_____ (২০১৭)। *উপন্যাস সমগ্র* (৩য় সং.)। দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

_____ (২০১৭)। *মসোলিয়ম*। দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

রণেশ দাশগুপ্ত (২০১২)। *রণেশ দাশগুপ্ত রচনাসমগ্র, ১ম খণ্ড* [সম্পা. সৌমিত্র শেখর]। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সেখ মোফাজ্জাল হোসেন (২০১১)। *নবাবরূপের আখ্যান বিশ্ব*। দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

M. H. Abrams (1999). *A Glossary of Literary Terms* (7th edition). Heinle & Heinle, Boston.

প্রক্রিয়া

প্রগতি শীল (২০০৮)। *অক্ষরেখা* [সম্পা. নীল কমল সরকার, সংখ্যাটির সম্পা. রাজীব

চৌধুরী], সংখ্যা : নবাবরূপ ভট্টাচার্য সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৮৪-১৮৫

স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৯৬)। ‘হারবার্ট’-এর চরিত্র চিত্রণ। *আখ্যান* [সম্পা. আফসার আমেদ ও অনিচ্ছয় চক্রবর্তী], সংখ্যা : ০১, মার্চ ১৯৯৬, পৃ. ৩০

সমরেশ বসু : জন্মশতবার্ষিক স্মরণ

আমন্ত্রিত রচনা

সমরেশ বসুর কথাসাহিত্য : সিন্ধুতে বিন্দুস্পর্শ

মো. খোরশেদ আলম*

সব সাহিত্যই জীবনের কথা বলে। তবে কথাসাহিত্যে এ প্রকাশ ব্যাপকতর। এর কারণ বোধকরি পরিসরগত সুবিধা। সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) প্রভূত গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। লেখার সাধনা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সৃষ্টির চূড়ায়। ছোটগল্পের মাধ্যমে লেখার জগতে প্রবেশ তাঁর। যতোখানি মান্য, তিনি একজন স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পী, প্রতিভাও প্রাতিশ্বিক। সমরেশ-রচনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ছোটগল্পের মাধ্যমে। গল্পগুলোতে থাকা জীবনাসক্তির প্রচণ্ডতা যে-কাউকে তাঁর সামগ্রিক রচনার প্রতি আকৃষ্ট করবে। সম্ভাবনাময় মানবজীবনের প্রতি তাঁর নিরঙ্কুশ পক্ষপাত অনায়াসে উপলব্ধিযোগ্য। তাঁর উপন্যাসপাঠে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর কথাসাহিত্যে উপস্থাপিত সমকালীন সমাজ, বাস্তবতা, রাজনীতি, সর্বোপরি জীবনঘনিষ্ঠ বোধ প্রশংসনীয়। উল্লেখযোগ্য লেখক মানেই ব্যতিক্রমী প্রকরণ ও শিল্পশৈলীর অধিকারী। তারও অধিক মূল্যায়নে বলা উচিত— প্রকৃত শিল্পী হচ্ছেন একজন আত্মআবিষ্কারক। লিখতে লিখতেই শিল্পী নিজে নিজেকে পরিবর্তিত করে তোলেন। ফলে তাঁর কথাশিল্প নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়। নিজস্ব অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণেও শিল্পীর একটা নিজস্ব চঙ থাকে। তা অবশ্য সব লেখকেরই থাকে। তবে কোনো কোনো লেখক চকিতে মানুষের মনে স্থান করে নেন। অনেক সময় কাউকে সহজ শৈলীর লেখক বলে প্রতিপন্ন করা যায়। কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করলেই বোঝা যায়, অনায়াস লেখা, সহজ করে বলা কতোটা কঠিন, কতোটা ত্যাগ-তীতিস্কার।

লেখাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সমরেশ বসু। বঙ্গদেশে তা খুব দুর্লভ ও দুঃসাহসিক গুণ বৈকি। বহুল উৎপাদনের মধ্যেও শৈল্পিক মানসম্পন্ন লেখার সংখ্যা তাঁর নেহায়েৎ কম নয়। তাঁর লেখা বিপুল-বৈচিত্র্যময় জীবনের রসদে ভরপুর, বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ। একটি প্রবল জটিল নিষ্ঠুর আবেগঘন জীবনযাপন করেছেন তিনি। অনুভবের খিতানো তলা থেকে সবসময় তাঁর শিল্পের কাঠামো তৈরি হয়নি। জীবন তো সমরেশের ভাষায়, ‘জীবন কেমন আনখা বাগে চলে, তুমি থেমে থাকতে পার নাই।’ (সমরেশ বসু, ২০০৩ : ৬৬২) জীবনের এই শ্রোতস্বিনী টানই তাঁর রচনায় পাঠককে ধরে রাখে। অস্বীকারের একটা যুগপ্রবণতা সত্ত্বেও তা অবলুপ্ত হয়ে যায় না।

* ড. মো. খোরশেদ আলম : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

পিকাসো যেমন বলেছিলেন, প্রত্যেকটি শিল্পই তার অনপনেয় দাগ রেখে যায়। শিল্পকে মুছে দিলেও সেই দাগের টান রেখা রেশ ইত্যাদি থেকেই যায়। সমুদ্রসম জলরাশিপূর্ণ শিল্পের জগত, তবুও তাতে মহাবৈশ্বিকতার কতোটুকুই বা ধারণ করা যায়? শুধু শিল্প নয়, সর্বত্রই, সর্বশাঙ্গ্রেই তা সত্য। সমরেশ-সাহিত্যের ওপর আলোকপাতও সত্যিকার অর্থে সিন্ধুতে বিন্দুস্পর্শের চেষ্টামাত্র। বিশাল সৃষ্টিভাণ্ডারের মধ্য থেকে তাঁর একাংশই তুলে ধরা যায়, সম্পূর্ণটা নয়।

বিশ শতকের এমন একটা সময়ে সমরেশের আবির্ভাব, যখন ভাঙন চলছে জীবনের সর্বত্র। কাল তখন সংস্কৃত, মানুষের সভাবনা ও সংগ্রাম জাগ্রত, সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিকতা, আধুনিকতার পরিণামী ক্ষয়ও চিহ্নিত। ১৯৪৬ সালে ছোটগল্প ‘আদাব’ রচনার মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যে পদার্পণ ঘটে তাঁর। সমরেশের প্রথম উপন্যাস উত্তরঙ্গ প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। তাঁর লেখক জীবন শুরু হবার আগেই বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) প্রমুখ লেখকের একটি উর্বরভূমি প্রস্তুত ছিল। রবীন্দ্র ভাবধারা ছিল মন্দ্রমধুর, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণবোধে উৎসারিত। লক্ষ করা যাবে, কালের অবক্ষয়ে ক্রমান্বয়ে তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। সমরেশ সেই সময়ে নিজেকে খোলনলচে পাণ্টে ফেলছিলেন। ঠিক কল্লোলিয়ান না হয়েও, সমকাল অতিক্রমী একটা চৈতন্য তাঁর ভেতরে ভেতরে উৎক্ষিপ্ত। তবে মৌলিক ভাবনায় মানুষ ও সমাজের কল্যাণ তথা শুভবোধকে তিনি উপেক্ষা করেননি। তাঁর বৈচিত্র্যময় ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশভঙ্গিতেও তা দৃশ্যমান। তিনি আত্মচৈতন্যকে বিসর্জনের তিলক দিয়ে দূরে সরাননি; ফলে নিজস্বতার একটা প্রভায় প্রদীপ্ত হয়েছেন। দ্বিধা থরথর কালের জটিলতা সত্ত্বেও তিনি থেকে গেছেন মানুষের শিল্পী হয়ে।

সমরেশ বসুর রচনাসম্ভার বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক-কুশলতায় পূর্ণ। প্রায় চারদশকের সাধনায় নির্মিত হয়েছে তাঁর শিল্পভূমি। শুধু লেখাকেই জীবিকানির্বাহের অবলম্বন হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। প্রচণ্ড প্রাণশক্তি সম্পন্ন একজন মানুষ না হলে তা সম্ভব ছিল না। ব্যক্তিচরিত্রের সাহসিকতার জন্য নিজের জীবনের সঙ্কট ও টানাপড়েনকে তিনি অতিক্রম করে যেতেন। তিনি জড়িয়ে যেতেন সমকালীন নানা জাতীয় ঘটনার সঙ্গে। মানুষের অশেষ সঙ্কটের কারণ তাঁর অধিগত ছিল। বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে বিচিত্র মানুষ তাঁর কথাশিল্পে উপস্থিত হয়েছে। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত কি উচ্চবিত্ত সর্বশ্রেণির চরিত্রের অংশগ্রহণ ঘটেছে সেখানে। তবে নিম্নজীবী মানুষ অঙ্কনে তিনি অধিকতর সিদ্ধহস্ত। জেলে, তাঁতি, গোয়াল, মজুর, উদ্বাস্ত, নিরন্ন মানুষ তাতে অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে। তাঁর রচনায় নিম্নবিত্তের সংগ্রামী জীবন ও প্রতিবাদী প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পঞ্চাশের দশকে প্রবল দারিদ্র্যপীড়িত জীবনভিজ্ঞতা থেকে তিনি

লিখেছিলেন— উত্তরঙ্গ (১৯৫১), নয়নপুরের মাটি (১৯৫২), বি.টি. রোডের ধারে (১৯৫২), গঙ্গা (১৯৫৭) প্রভৃতি। ষাটের দশকে এসে সমরেশ বসুর জীবনদৃষ্টি পাণ্টে যায় অনেকখানি। তাঁর প্রথমদিকের কয়েকটি উপন্যাসেরই আশ্রয় ছিল নিম্নবিত্ত মানুষ। ষাটের দশকে তাঁর উপন্যাসের বিষয়-আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটে। বিচ্ছিন্নতার গহ্বরে নিমজ্জিত মধ্যবিত্তের জটিল জীবনাচরণ সেখানে প্রাধান্য পেতে থাকে। নাগরিক বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত মানুষ, সমাজ-বাস্তবতায় নিষ্পিষ্ট নিঃসঙ্গ মানুষ উঠে আসে তাঁর এ পর্বের উপন্যাসগুলোতে। অন্যদিকে সত্তর দশকের উপন্যাসে একটা বিশেষ অংশজুড়ে রয়েছে উচ্চবিত্ত জীবন। সমাজের কলুষতা, নিষ্পেষণের উদ্ভাবনকর্তা ও অসঙ্গতিপূর্ণ উচ্চবিত্তের শ্রেণিচরিত্রকে তিনি তুলে ধরেছেন। সমরেশ প্রচলিত মূল্যবোধ ভাঙেন, প্রয়োজনেই আবার সংরক্ষণ করেন। ভগ্নমির চূড়ান্তকে তিনি দেখে ছাড়েন। তবে ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’ (২০০০ : ১১০২)– এই রবীন্দ্রদর্শনকে তিনি আত্মিক ও সামাজিক প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। সমরেশ বলতে পারেন,

দাগা খেয়ে, দাগাবাজ মানুষের সমাজ ছেড়ে, কোন বন পাহাড়েই পালিয়ে রেহাই নেই। চিরকালের মানুষকে, সেই তার চিরকালীন সত্তার কাছেই ফিরে আসতে হয়। মানুষ যত দুঃখ কষ্টের কারণ হোক, মানুষকে শেষ পর্যন্ত সেই মানুষের কাছেই নিজেকে সঁপে দিতে হয়। বিশ্বাস হারানো পাপ নয়। বিশ্বাসটাই অনিবার্য। মানুষ বড় কষ্টে, তার বিপন্ন বিশ্বাস থেকে এটাই জেনেছে। (কালকূট, ১৯৮৬ : ১৩২৯)

সত্তরের রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে লভিত শিক্ষা তাঁকে যেন পরিণতির দিকে পৌঁছে দিতে থাকে। মানুষকে অন্ধকার আর্বত থেকে বের করে আনতে চেয়েছেন তিনি। কোথাও তিনি দিতে চেয়েছেন মুক্তিপথের সন্ধান। *মানুষ শক্তির উৎস* (১৯৭৪), *মহাকালের রথের ঘোড়া* (১৯৭৭) জীবনের সদ্বর্ধক চেতনা, কল্যাণবোধে উৎসারিত। তাঁর মধ্যে আদর্শিক সমাজগঠনের গভীর প্রত্যয়, যা ছিল লেখকের প্রথমজীবনে অঙ্কুরিত অভিপ্রায়। আশির দশকে তিনি রচনা করেন *টানা-পোড়েন* (১৯৮০), *যুগ যুগ জীয়ে* (১৯৮১), *বাথান* (১৯৮৫), *দশ দিন পরে* (১৯৮৬) ইত্যাদি। এ উপন্যাসগুলোতে সমরেশ বসু সংগ্রামী মানুষের নিত্য অস্তিত্বকে প্রকাশ করেছেন। যাপনের নিষ্পেষণে নিমজ্জিত মানুষকে, তাদের অবক্ষয়কে তিনি সযত্নে তুলে ধরেছেন। লেখকের আত্মস্মৃতি হয়ে উঠেছে তাঁর সৃজনের সমুদ্রমহুনে; যেমন *যুগ যুগ জীয়ে* (১৯৮১) উপন্যাসের ত্রিদিবেশ চরিত্র। তার মধ্যদিয়ে তিনি উপস্থাপন করেছেন সংগ্রাম, জীবনভোগ, নারীর স্পর্শ, অদম্য রাজনৈতিক মানুষ। কিন্তু ষাটের দশকে মানবচরিত্রে অমিত যৌনমনস্তত্ত্বের প্রয়োগ করেছিলেন তিনি। অস্বীকার করা যাবে না যে, তা সমকালীন সমাজমানসের শূন্যগর্ভতা থেকে উদ্ভূত। সত্তরের উপন্যাসে রাজনৈতিক চরিত্র সমরেশ বসুর সূচিক্তিত সমাজ-রাজনীতির প্রতিফলন। সেখানে উদ্ভাসিত হয়েছিল সচেতন শ্রেণিকার্যমো, চরিত্র-অঙ্কনে মার্ক্সবাদী জীবনদৃষ্টির অঙ্গীকার। তবে সমরেশ-সাহিত্যে রাজনীতির চেয়েও মানুষ উর্ধ্বে— জীবনধর্মী এই সত্যের ব্যাপকতর প্রতিষ্ঠা

ঘটেছে। ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব, জীবনসংগ্রাম, জীবন-আকাজক্ষা, বেদনাময় অভিব্যক্তি তথা মানবিক অন্তর্লোকের সংবেদ হয়ে উঠেছে তাঁর কথকতা।

সমরেশ বসুর মধ্যে ছিল দ্বৈত-শিল্পসত্তার উপস্থিতি যা, শিল্পী-সাহিত্যিকে প্রায় বিরল ঘটনা। কালকূট-ছদ্মনামে রচিত সমরেশ-রচনাগুলো একটি প্রাতিষ্মিক শিল্পসত্তার চিহ্ন। প্রশান্ত সুর, আধ্যাত্মিকতা, পৌরাণিক আবহে তৈরি কালকূট-সাহিত্যে সমরেশ যেন স্বতন্ত্র লেখক। চলমান জীবনধারায় তিনি সন্ধান করেন আত্মপরিচয়হীন মুক্ত মানুষ। ভারতবর্ষের বিশাল ভূগোল-পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে সেই অনুসন্ধান। এক অর্থে ভিন্নতা নিয়েও কালকূট-সমরেশ যেন একাকার। এই মরমী মানুষের অন্বেষণ তিনি কল্পনার কুয়াশা মেখে করেননি। ইতিহাস ও পুরাণের ধূলিধূসর পথ নির্মাণ করেও তিনি জীবনবিমুখ নন। জীবন থেকে সাহিত্যনির্মাণ কি সাহিত্য থেকে জীবনে ফেরার অনায়াসযাত্রায় তিনি প্রমাণ করেন-‘সম্ভবত দুঃখ ও গ্লানির মধ্যেই নিজেকে ও অপরকে কিছুটা চেনা যায়। সাহিত্যের যা কিছু দায় সে তো জীবনেরই কাছে। সাহিত্যের থেকে জীবন বড়, এ সত্যের জন্য সাহিত্যিককে গভীর অনুশীলন করতে হয় না, তা সত্যই অতিজীবন্ত।’ (সমরেশ, ১৯৮৮ : ৩১) জীবনের এই গভীর অনুধ্যানের ফসল কালকূট-সমরেশ আখ্যান।

সমরেশ বসু বাংলা ছোটগল্প জগতেও একটি অনিবার্য নাম। উপন্যাসের মতো গল্পেও তিনি কুশলী কথাকার। গল্পের সমরেশ বিষয়-বৈচিত্র্যে, চরিত্র-অঙ্কন দক্ষতায় ও শিল্প-বৈভবে উর্বর লেখক- স্বীকার করতে বাধ্য নেই। ১৯৪৬ সালে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘আদাব’ গল্প, কথাসাহিত্যিক সমরেশের পক্ষে তা প্রথম রচনা। মানবিক উৎকর্ষ ও মানবীয় সংরাগের অনুপম রূপায়ক গল্পকার সমরেশকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। তিনি প্রায় দুই শতাব্দিক গল্প রচনা করেছেন। সংখ্যা প্রধান বিবেচ্য নয়, দিনবদলে পর্ব-পর্বান্তরে তিনি জীবনের বিচিত্র গভীর রূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন। এরই সাক্ষ্য বহন করে ‘খিঁচা কবলা সমাচার’, ‘ফকির’, ‘এস্মালগার’, ‘গুণিন’, ‘পঞ্চগয়েত’, ‘মরেছে প্যালগা ফরসা’, ‘প্রাণ-পিপাসা’, ‘মানুষ রতন’, ‘জলসা’, ‘জোয়ার-ভাটা’, ‘উড়াতিয়া’, ‘মেঘলা ভাঙা রোদ’, ‘জীবিকা’, ‘প্রত্যাবর্তন’, ‘আবর্ত’ প্রভৃতি গল্প। সুতীব্র জীবনবোধ, প্রেম, মনস্তত্ত্ব, যৌনচেতনা, রাজনীতি, সমাজ নানা বিষয় সমরেশ বসুর গল্পের অবলম্বন।

১

পিতৃপ্রদত্ত নামের সুরথনাথ বসু একসময় হয়ে উঠেছিলেন লেখক সমরেশ বসু। পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জে জন্মানো ব্যক্তিটি দেশভাগের পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। তাঁর শিল্পীজীবনের অধিকাংশ সময় সেখানে অতিক্রান্ত হয়। জাতিক-আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ তখন দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্বে জীবনের সুস্থিরতা প্রায় অসম্ভব। রেনেসাঁ, রিফর্মেশন ও পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার

একেন্দ্রিকতা আশাবাদ জাগাতে ব্যর্থ। বলা চলে, পশ্চিমা সভ্যতা তখন আর আলোকতীর্থ নয়। জীবেন্দ্রসিংহ রায়ের বক্তব্য :

ইউরোপের কুরুক্ষেত্রের একটা ফলাফল এই যে আমরা এ যাবৎ প্রতিটা বলতে বুঝতাম ইংল্যান্ড ও কতকটা পশ্চিম ইউরোপ এবং সেই ভূখণ্ডের ইতিহাসের আলোকেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশকে বিচার করতাম। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের গুণাগুণ নিরূপণ এবং সমগ্র মানবসভ্যতার উপর তার প্রতিক্রিয়া মূল্যায়নের সুযোগ এদেশের শিক্ষিত মানুষের হলো। (জীবেন্দ্র, ১৯৮৭ : ১১৪)

তবুও রুশবিপ্লব তরুণমনে আশা জাগায়, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আবিষ্কার তরুণ মনস্তত্ত্বকে আলোড়িত করে। শ্রেণিগত বিবেচনায় কথাসাহিত্যে নিচুতলার মানুষের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। আধুনিক সাহিত্যকগণ পুরানো মূল্যবোধ বিদায় দিয়ে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত। বারিদবরণ ঘোষের কথায় :

বৈশাখ ১৩৩০। প্রকাশিত হল একটি নতুন পত্রিকা। নাম-‘কল্লোল’। জন্ম হল হারকিউলিসের। জন্ম মুহূর্তে প্রথাবদ্ধতার অজগরের মুণ্ড ছিঁড়ে নিলে। প্রবল চেউয়ে দূর করে দিলে দীর্ঘকালের জমে ওঠা পচা সংস্কারের জঞ্জালগুলিকে। বাংলাসাহিত্যে সূচিত হল এক প্রবল আধুনিকতার যুগ। (বারিদবরণ, ১৯৯৬ : ভূমিকাংশ)

লেখকরা তখন রোমান্টিক কবিদৃষ্টির রূপায়ণ শুধু নয়, বাস্তবতার জটিল আবর্তকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন। যেমন জগদীশ গুপ্ত সংশয়-অবিশ্বাস তথা ‘সিনিসিজম’কে অবলম্বন করেছেন। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮৩-১৯৬৪) ফ্রয়েডীয় যৌনতাকে ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) অতল জৈবমনের রহস্যকে প্রকাশ করেছেন। মণীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯) রংগ, ভগ্ন ও পর্যদুস্ত জীবনের পঙ্কিলতা-লালসা তুলে ধরেছেন। জার্মিনাল উপন্যাসরচয়িতা এমিল জোলের প্রকৃতিবাদে আস্থা জন্মেছিল তাঁর। তবে ‘কদর্য বিকৃত জীবনের গাঢ় অন্ধকারেও লেখক মনুষ্যত্বের স্নেহ, প্রেম ও মমতার ক্ষণদীপ্তির সন্ধান পেয়েছেন।’ (গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ১৯৯১ : ১৫৮) সে সময় অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৫-২০০২), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) প্রমুখের মতো নতুনধারার সাহিত্যিক ছিলেন। আবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)-এর মতো শান্ত স্থিতিধি সাহিত্যিকও ছিলেন। এছাড়া আঞ্চলিক ভাবনা নিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), অমরেন্দ্র ঘোষ (১৯০৭-১৯৬২) প্রমুখ শিল্পী এসেছিলেন কিছু সময়ের জন্য। এদের সকলের একটা বিমিশ্রতা সমরেশ বসুর রচনায় ধরা পড়েছে। ফলে তাঁর উপন্যাসে কখনো আঞ্চলিকতা, কখনো ফ্রয়েডীয় চৈতন্য, কখনো রহস্যবিধুর অন্তর্জীবন সবই একাকার হয়ে উঠেছে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে, ‘সমরেশ বসুর প্রথম দিকের গল্প-উপন্যাসে, প্রফুল্ল রায় ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের আঞ্চলিক উপন্যাসে তারাশঙ্করের শিল্পরীতির অনুসৃতি দুর্লভ নয়।’ (অরুণকুমার, ১৯৭৪ : ২৯৫) পরবর্তীকালে সমরেশ নিজের পথ খনন করেছেন। ফলে বিচিত্র রচনার মধ্য থেকেও তাঁকে আলাদা করা যায়। অমর মিত্রের কথায়, ‘তারাশঙ্কর যেখানে থেমেছিলেন,

সমরেশ বসুর আরম্ভ সেখানেই যেন।’ (অমর মিত্র, ২০০০ : ১৯৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন খ্যাতির শীর্ষে। সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) ও সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) প্রমুখ ঔপন্যাসিক সৃষ্টিকর্মে সগর্বে বিরাজমান। তারকাখচিত এই সাহিত্যিক সমাবেশে অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা ও বৈচিত্র্যের গুণে সমরেশ বসুর স্থান নির্দিষ্ট। দিব্যেন্দু পালিত তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার বিশেষত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন :

এই একজন, যার মধ্যে একত্রিত হয়েছিল তারাক্ষরের ‘অভিজ্ঞতা’, বিভূতিভূষণের ‘অনুভূতিপ্রবণতা’, মানিকের ‘প্রশ্ন’, সতীনাথের ‘পটভূমিজনিত ভিন্নতা’। বাংলা গল্প-উপন্যাসের বিপুল ভারসম্পন্ন ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর সমন্বয় ঘটিয়েও সমরেশ বসু হয়ে ওঠার জন্য তাঁকে যুক্ত করতে হয়েছিল নিজের সময় ও মানসিকতা, নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গি- সাহস, স্পষ্টবাদিতা এবং একের মধ্যেই বহু। (দিব্যেন্দু, ১৯৮৮ : ৫০)

কল্লোল-উত্তেজনা স্তিমিতির কালে সমরেশ বসুর সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল গ্রামীণ ও আঞ্চলিক মানুষের শিল্পিত দায়ভার কাঁধে নিয়ে। উত্তরঙ্গ, নয়নপুরের মাটি ও গঙ্গায় আঞ্চলিক জীবনরূপায়ণে তিনি চলে যান মানুষের খুব কাছাকাছি। নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন-অঙ্কনে এ শিল্পীকেই আবার দেখা যায় ঘাতক সময়ে ব্যক্তির আত্ম-অবলুপ্তি এবং দ্বন্দ্বমুখর অস্থির সত্তাকে ধারণ করতে। ঘাটের উন্মাতাল এক রাজনৈতিক প্রতিবেশে বিচূর্ণিত মধ্যবিত্ত সত্তাকে তিনি তুলে ধরেছেন যৌনতা ও অবক্ষয়ের প্রতীকে। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক জীবনদৃষ্টি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অভিজ্ঞান ও সাহিত্যে যৌনচেতনার সার্থক প্রয়োগক্ষমতা সমরেশ বসুর ছিল। একইসঙ্গে আধুনিক যুক্তিবাদী ও নিরাসক্ত সমাজ-মানুষ বিশ্লেষণী লেখক হওয়া সত্ত্বেও ভিন্নত্ব সূচিত হয়েছে কালকূট-রচনায়। শান্ত সুরের অধ্যাত্মচেতনা, বোহেমীয় অনুভব তাঁর ছদ্মনামে লিখিত রচনার অন্যতম বিবেচনা। আগেই বলা হয়েছে, তাঁর সাহিত্যভঙ্গিতে বদল ঘটেছে বারবার, বিষয়েও এসেছে বৈচিত্র্য। তবে তাঁর অমোঘ শিল্প-সচেতনতার প্রধান অবলম্বন ছিল মানবদরদ। নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষজন তাঁর কথাসাহিত্যের নির্বিচার কুশীলব। জীবন সংগ্রামে শুধু শ্রমিক কিংবা মজুর নয়, প্রায় সর্বপ্রকার নিম্নকোটির মানুষের অন্তর্ভুক্তির পরিচয় দানে তিনি সিদ্ধহস্ত। সমালোচকের বক্তব্যে :

সমরেশ সমাজ সচেতন শিল্পী। দায়িত্ব সচেতন শিল্পী প্রতিরোধের কথা না বলে চূপ করে থাকতে পারে না। এই প্রতিরোধ শুধু শ্রমিকফ্রন্টে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে— যেখানে অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ, মানুষের প্রতি অত্যাচারের বেদনা তাঁকে সমাজের সকল স্তরের শোষিত ও পতিতদের মাঝখানে নিয়ে যায়। (দীপালি, ১৪১২ ব : ৮২)

তিনি ব্যাপ্ত থেকেছেন সমকাল-সংশ্লিষ্ট মানুষ ও পরিপার্শ্বে তুলে ধরতে। জীবনের মধ্যপর্যায়ে তথা ঘাট-সত্তরের উপন্যাসে নেতিবাচকতার প্রাধান্য থাকলেও, শেষপর্যন্ত এ শিল্পী সমস্ত শূন্যতা ও অর্থহীনতার অবলোপ ঘটিয়েছেন। ফলে মানুষের অসীম সম্ভাবনা হয়েছে উচ্চকিত। সমরেশ-উপন্যাসের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে বাংলার অবহেলিত ও আঞ্চলিক মানুষের মুখচ্ছবি। তাঁর আত্মপ্রকাশের কাল সমস্যা-কটকিত, কার্যত দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন। সে সময় দেশের অসম্পূর্ণ সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে

অগ্রণী হন কেউ কেউ। গোপাল হালদার ও নীরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ‘পরিচয়’ পত্রিকা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর আগেই ১৯৪২ সালের শেষ দিকে সমরেশ বসু কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। (সমরেশ, ১৯৮৬ : ৭২) সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্ত তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষাগুরু, তাঁর প্রেরণাতেই সমরেশ বসুর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। ১৯৪৪ সালে তিনি পেয়েছেন পার্টির সদস্যপদ, স্ত্রী গৌরিও পার্টির মহিলা সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। সমরেশ প্রথম দিকে বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর সেই বিশ্বাসে চির ধরে। ১৯৪৯-এ পার্টি বেআইনি হয়ে গেলে তিনি হেণ্ডার হন। জেলবাসের সময় তিনি উত্তরঙ্গ উপন্যাসের পরিকল্পনা করেন। এ সময়েই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন বি. টি. রোডের ধারের বঞ্চিত মানুষকে। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, লেখক-সত্তা নিয়ে এভাবেই তাঁকে মানুষের কাছাকাছি দাঁড়াতে হবে; সামাজিক দ্বন্দ্ব থেকেই সৃষ্টির অপূর্ব-সম্ভার উঠে আসবে কলমের ডগায়। সমাজ-রাষ্ট্র-মানুষ ভাবনা করতে করতেই তিনি পাঠকহৃদয়ে পৌঁছে যান। পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-জটিলতা তাঁকে ব্যথিত করে তোলে, টলে যায় বিশ্বাসের ভিত। শ্রমিকবিপ্লবের নামে নানা অমানবিকতার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হন। (সমরেশ, ৫২৮-২৯) রাজনীতি ছেড়ে সমরেশ তাই পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন হন। ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি তিনি জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু ফ্যাক্টরির পুরোনো চাকরিটা ফেরত পেলেন না। কমিউনিস্ট পার্টি করবেন না, এমন মুচলেকা দিলে চাকরি পাওয়া যায়; সে-পথও তিনি বেছে নিলেন না। জটিলতা, পারিবারিক বিপর্যয়, অভাব-অনটনের তীব্র কষাঘাত তাঁর জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তবুও তিনি ভেঙে পড়েননি, দমিত হননি। তাঁর কথায় :

সাহিত্যের যা কিছু দায়, সে তো জীবনেরই কাছেই। সাহিত্যের থেকে জীবন বড়, এ সত্যের জন্য সাহিত্যিককে গভীর অনুশীলন করতে হয় না। তা সত্যই অতি জীবন্ত। (সমরেশ, ১৯৮৮ : ২৭)

১৯৫৫ সালে নিষ্ক্রিয়তার কারণে পার্টিতে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়। তিনি প্রায় ১৪ বছর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। জেলবাসের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন নতুন মানুষ। সেই অনুভবের ভাষ্য, ‘আমি অনুভব করতে আরম্ভ করি, বিয়াল্লিশ সাল থেকে যেভাবে রাজনীতি করে আসছি, আমার সেটা পথ নয়। একজন রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার থেকেও, একজন লেখক হওয়াই আমার ভবিষ্যত।’ (সমরেশ ১৯৮৬ : ৭২) ইতোমধ্যেই লেখার জগতে এসে গেছেন প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪), বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১) প্রমুখ। এ কালের একটা সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে মোহমুগ্ধতা, অতীতচারিতা, রম্য স্বাদুরচনা। সমালোচকের বক্তব্যে, ‘সাধারণ পাঠক মুক্তি চায় না, মোহ নিয়েই বাঁচতে চায়, সে উত্তেজক রোমহর্ষক স্নায়ু চঞ্চলকারী গল্প চায়, কিন্তু তার পরিচিত বিশ্বাস এবং নীতিবোধে আঘাত লাগুক তা চায় না। এক কথায়, সে রূপকথার গল্প চায়...’ (অচ্যুৎ, ১৯৬৮ : ৩৮৯) কিন্তু সব যুগেই বিচিত্র লেখক থাকেন। এর মধ্যেও সতীনাথ ভাদুড়ী

(১৯০৬-১৯৬৫), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১)-এর মতো কথাসাহিত্যিক ছিলেন, যারা সময়কে ধরেছেন প্রবল নিস্পৃহতায়।

সাহিত্যিক হিসেবে সমরেশকে অতিক্রম করতে হয়েছে জটিল বন্ধুর পথ, যার ইঙ্গিত হয়তো পূর্বেই সূচিত হয়েছে। কৈশোর থেকেই ঘর থেকে বাইরে যাবার টান, প্রথাবিরোধী জীবনযাপন, রাজনৈতিক লাঞ্ছনা- জীবনের প্রভূত টানাপড়েন তাঁর আজীবন সঙ্গী। (সরোজ, ২০০৬ : ভূমিকা অংশ) মানুষের প্রতি পরম মমতাই সমরেশকে চিনিয়েছে অচেনা অলিন্দ-কুঠুরি, মানুষে নিহিত বিশ্বলোক। ব্যক্তিক-সামষ্টিক মানুষের দ্রোহী কণ্ঠস্বর তাঁকে বিপ্লবের মন্ত্রণা দিয়েছে। যন্ত্রণা ও অভিজ্ঞতায় সমরেশ-কথকতায় প্রবেশ করেছে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত মানুষ। জালের মতো ছড়ানো নিয়ত জীবনসংগ্রামী পথিকদের একাংশকে উত্তরঙ্গে (১৯৫১) অন্বেষণ করা যায়। প্রবল স্বদেশচেতনার স্বাক্ষর এ রচনায় লেখক সৃষ্টি করেন সিপাহীবিরোধের নেতা হীরালালকে। হীরালাল ওরফে লখাই গ্রামীণ ইতিহাসেরও নায়ক। ১৮৫৭'র সিপাহীবিপ্লবের ভিন্নতর আখ্যান উত্তরঙ্গ। সমরেশ ঐতিহাসিক সত্য-প্রকাশে আধুনিক যন্ত্রযুগের নিমিত্তে পরিবর্তমান সমাজকে তুলে ধরেন। পঞ্চাশের অতীতচারিতায় মগ্নপলায়নপরতা নয়, সমরেশ-উপন্যাস হয়ে ওঠে বাস্তবতার শিল্পভাষ্য। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশবিরোধী চেতনার ধারক লখাই লৌকিক সংস্কার ও জনমিথের আকর। মৃত্যুঞ্জয় হীরালাল হয়ে ওঠে হুগলি তীরের গঙ্গাপারে মনসার বরপুত্র লক্ষীন্দর তথা লখাই বাগদী। উপন্যাসের ভাষায় :

একেই তো নবজন্ম বলে। নাম গোত্র পরিচয় সবই ঢাকা রইল, নতুন ঘরে নতুন মানুষ হয়ে সে জন্মাল। (সমরেশ, ২০০৬ : ১১৮)

লখাই অবিনশ্বর, আখ্যানে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত নির্দেশক। ইতিহাসের ট্রাজিক এই নায়ক জনপদ রাজনীতি অর্থনীতি ও পরাজিত মানুষের নীরব সাক্ষী। এক ব্যাপক কালের ইতিহাস বুনন করেন সমরেশ বসু। কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোম পৈঁচার নকশা* কি *আলালের ঘরের দুলালের* বাবুসমাজের বাসিন্দারা যেন উত্তরঙ্গে জৌলুসপূর্ণ জীবন কাটায়। এক নষ্টসময়ের বলি তাঁতিদের প্রতিনিধি কানুভড়। নব্য-অর্থনৈতিক পরিবেশে আব্রহতাই তার ভবিতব্য। সমরেশ আঠার শতকের ষাট দশকের চটকল তৈরির ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেছিলেন নবকুমার দাশের কাছে। (সরদার, ১৯৯৭ : ৩৮) তিনি পদব্রজে চটকল পর্যবেক্ষণ করে উপন্যাসে প্রোথিত করেন জ্বলন্ত ইতিহাস। হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র করালীরা তো বারবার জন্মে নেয়। বস্তৃত ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে ঘনিজে ওঠা অমোঘ এক দ্বন্দ্বের ইতিহাস উত্তরঙ্গ।

শ্রমিক বস্তি, জীবনযুদ্ধ ও অসমাপ্ত বিপ্লবের গাথা হয়ে ওঠে *বি. টি. রোডের ধারে* (১৯৫৩)। এ উপন্যাসটির কেন্দ্রে বারাকপুর ট্রান্স রোড তথা নয়া সড়কের শ্রমিক বস্তি। কঠোর সংগ্রাম, প্রচণ্ড দারিদ্র্য, অব্যক্ত যন্ত্রণাকাতর জীবন এর উপজীব্য। নগরের শোভাবর্ধক অটালিকার পাশেই জন্ম নেয় অস্বাস্থ্যকর বস্তি। নগরসভ্যতার চোখ-

বালসানো স্থাপত্য দেখে অনুমান প্রায় অসম্ভব- অন্তরালেই ভয়াল অন্ধকার। ‘কল্লোলে’র কালেও বস্তিজীবন নিয়ে প্রচুর সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছিল। কিন্তু বিদেশি সাহিত্য-প্রভাব ও সৌখিনতা জন্ম দেয় রোমান্টিক উচ্ছ্বাস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

বস্তি জীবন এসেছে, কিন্তু বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসেনি- বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসেনি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয়নি, ওই একই রোমান্স শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে। (মানিক, ১৯৯৪ : ১৯)

বস্তুত এই রোমান্টিকতার রঙ অনেকের সাহিত্যে চড়া হয়ে ওঠে। এর অন্যতম কারণ লেখক-অভিজ্ঞতার অপূর্ণতা। বিশেষত ‘কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের জীবন সম্পর্কে ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ নয়।’ (গোপিকানাথ, ১৯৮৬ : ২২০) লক্ষণীয় যে, সমরেশ বসু বি. টি. রোডের ধারের বস্তিজীবনকে ‘রোমান্টিসাইজ’ করেননি। এ উপন্যাসের কাহিনি-চরিত্র মধ্যবিত্ত-খোলস অতিক্রমী। বস্তিবাসের নিষ্করণ অনুভূতি এতে সঞ্চারিত হয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানে। যৌবনের প্রারম্ভেই স্ত্রী গৌরীকে নিয়ে সমরেশ বসু আব্দুল মিস্ত্রির বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। (সমরেশ, ১৯৮৬ : ৬৫) পরে তারা তরফদার পাড়ার বস্তিতে থেকেছেন। ফ্যাক্টরির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও বস্তির নোংরা জীবনযাপনের তিনি প্রত্যক্ষ অংশীদার। জীবিকার জন্য তাঁকে করতে হয়েছে বিচিত্র কাজ- সাহেব পাড়ায় ডিম বিক্রি, রাইফেল ফ্যাক্টরির নকশা আঁকা, কখনও পোস্টার লেখা। সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সুদৃষ্টি পড়ে তাঁর ওপর। এই দীক্ষাগুরুর অনুপ্রেরণায় ধীরে ধীরে জীবনের পর্দা উন্মোচন করে সমরেশ নিজেকে চিনেছেন। চটকলের জঙ্গি শ্রমিক তাঁতি লোহি মিঞার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। এ সবে গভীর ছায়া এ উপন্যাসে পড়েছে। গোবিন্দকে পটভূমি-পরিস্থিতির সঙ্গে অনায়াসে যুক্ত করে উপন্যাসিক ঘটনার জাল বিস্তার করেছেন। উত্তরঙ্গের লখাইয়ের মতোই গোবিন্দ পূর্বজীবনের ব্যর্থতা ফেলে নতুন জীবনে প্রবেশ করে। লখাই এ অঞ্চলের বৃহত্তর ইতিহাসের অংশ; গোবিন্দ ঐতিহাসিক নয়, পারিবারিক-সামাজিক চক্রান্তে নিঃসীম শূন্যতায় নিমজ্জিত। বৃহত্তর সমাজের স্বরূপ-উদ্ঘাটনে আতপুর-জগদল অঞ্চলের শ্রমিকজীবনে লেখক প্রবেশ করেন। আসলে ‘সমরেশ প্রতিভার স্বভাবপ্রেরণা ছিল সমাজের অবতলের ভাঙন ও অবক্ষয়ের মধ্যে নিমজ্জিতপ্রায় মানুষ আর তার প্রতিরোধের দুর্মদ সংগ্রাম।’ (হিতেন্দ্র, ১৯৯৫ : ১৪৮) বস্তির একটি রুগ্ন ছেলে বাস করে স্বাপ্নিক জগতে। গোবিন্দ মা উপন্যাসের পাভেল ভলাসভের মতো প্রতিবাদী আচরণ তার মধ্যে নেই। রুখে দাঁড়ানো পাভেল বলেছিল, ‘গায়ে হাত দিয়েছ ত..., ‘বাস্ ডের গুঁতোনি খেয়েছি, আর না!’ (ম্যাক্সিম, ১৯৭৯ : ৯)কিন্তু সমরেশের রুগ্ন ছেলেটির প্রতিবাদ বাবার কর্ণকুহরে পৌঁছায় না। অন্যদিকে গোবিন্দের অনিঃশেষ লড়াইয়ের ফল মৃত্যু। গোপন আততায়ীর ছুরিতে তার একতরফা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। যুগে যুগে শাসিত, অত্যাচারিত ও জীবনের জটিল-জালে নিবদ্ধ মানুষের কণ্ঠস্বর রূপে গোবিন্দরা বেঁচে থাকে রুগ্ন মায়ের প্রত্যাশার মতোই। লেখক গোবিন্দকে শিক্ষিত

মধ্যবিভক্ত কোনো রাজনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা বা তাত্ত্বিক বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করতে চাননি। ‘কিমলিস’ গল্পের (যা পরে লেখা) নায়ক বেচন অনেক বড় প্রেক্ষিতে গোবিন্দ হয়ে ধরা ছিল *বি.টি. রোডের ধারে* উপন্যাসে। সমরেশের স্বীয় জীবনের ছায়া সেখানে প্রত্যক্ষ। বীরেন্দ্র দত্তের বক্তব্য :

গোবিন্দ সেই নায়ক, যার অতীত জটিলতম উৎকেন্দ্রিকতার পথে নিষ্ক্ষেপ করে তাকে, আবার আর এক জটিল জীবন পরিবেশে পথ তাকে তুলে এনে আশ্রয় দেয়। (বীরেন্দ্র, ১৯৯১ : ৭০৯)

গঙ্গা (১৯৫৭) হয়ে উঠেছে কৈবর্তজীবনের বাস্তব-আলেখ্য। কাহিনি উপস্থাপন, চরিত্রের বাস্তবানুগতা, জীবনধর্মের প্রতিফলন প্রভৃতি অনুষঙ্গে *গঙ্গা*কে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চেনা যায়। পদ্মা, তিতাস ও গঙ্গা— তিন নদীর প্রেক্ষাপটে, এই তিন উপন্যাসের বিষয় নদীতে মাছধরা এবং মানুষের বাঁচামরা। *গঙ্গা* উপন্যাসে ‘মাছমারা’ নামাঙ্কিত জেলে সম্প্রদায় নদীতে নয়, মাছ ধরতে যায় অকূল সমুদ্রে। গঙ্গার ভেতর দিয়ে ঝঞ্ঝাবিষ্ফুর্ত সমুদ্রমুখে মাছ ধরতে অনিশ্চয়তায় ন্যুজ হয় তাদের পরিবার প্রেম সংস্কার ব্যক্তিক-সামষ্টিক জীবন। তেঁতলে বিলেস বংশপরম্পরায় মাছমারা সম্প্রদায়ের মানবিক অন্তর্বেদনার প্রবাহক। *গঙ্গা* অতীত-বর্তমান প্রজন্মের মারী ও মড়কপূর্ণ অনিশ্চয়ক পথের চালক। *পদ্মা নদীর মাঝে*তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যক্তিক-সামষ্টিক জীবনের কথা বলেন। হোসেন মিয়ার *ইউটোপিয়া* আর পরিণতিতে কুবেরে রোমান্টিক দ্যোতনা ব্যতিরেকে পুরোটাই জলজীবনের কঠিন সংগ্রামের আখ্যান। *গঙ্গা* উপন্যাসেও জলের সঙ্গে জীবনের লড়াই করে বাঁচে ‘মাছমারা’রা। তাদের সমুদ্রযাত্রা নিয়তিবিরুদ্ধ যাত্রা। তারা নিয়তির কবলে পতিত হবে জেনেও জীবিকার বংশগত শৃঙ্খল ভাঙতে অপারগ। এ উপন্যাস সৃষ্টি করতে সমরেশ বসু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই জেলেজীবনে মিশে যান। গঙ্গায় জেলেদের মরণপণ জলযাত্রা, জীবনসংগ্রাম সবই তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ; যে-অভিজ্ঞতা রচনাকে করে তোলে স্পর্শক্ষম ও বিশ্বাসযোগ্য। হাসান আজিজুল হক বলেন :

লেখকের অভিজ্ঞতায় জানা প্রতিবেশের শর্তে বাঁধা জগতেরই চিত্র হচ্ছে তাঁর রচনা। লেখক নিজে যা জেনেছেন, দেখেছেন, বিশ্বাস করেছেন, ভালো বা মন্দ বলে বিচার করেছেন— ঘুরে ঘুরে তাই চলে লেখায়। ...লেখকের অভিজ্ঞতার জগৎ অবশ্যই বহুস্তর। ...তাঁর এই অভিজ্ঞতার জগৎ যদি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তাহলে একজন লেখকের অনন্যতার ব্যাখ্যা খানিকটা পাওয়া যায়। (হাসান, ১৯৮৯ : ৫)

জেলে সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক জীবনের একাত্মতায় অনেকদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় এ উপন্যাস সৃষ্টি। লেখক সাক্ষাৎকারে বলেন :

আমি যখন আতপুরে থাকতাম, তখন গঙ্গার ধারে মালোপাড়া বলে একটি পাড়া আছে; আমি সে পাড়াতে প্রায়ই যেতাম। সেখানে আমার অনেক বন্ধু ছিল। তাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া আড্ডা মারা এসব করতাম এবং তারা অনেকেই চটকলে কাজ করতো। কিন্তু ওদের নৌকা এসবও ছিল। বর্ষার মরশুমে ওরা মাছ ধরতো। (নিতাই, ১৯৮৯ : ৬৯)

গঙ্গার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বলে সমরেশ জেলেজীবনের অনালোকিত অধ্যায়ে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। মাছমারাদের জীবন-খননে শেকড়সমেত তিনি তাদেরকে তুলে আনেন।

সীমাহীন অনিশ্চয়তার মধ্যেও জীবনের নিরন্তর প্রবাহ টিকে থাকার শিল্পভাষ্য এ উপন্যাস। চলিষু জলপটভূমিতে শ্রমজীবির জীবনসংগ্রাম, সহিষ্ণুতা ও জীবনপিপাসার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ‘গঙ্গা’-য়। জীবন-মৃত্যুর দ্বৈরথে সমুপস্থিত জেলেজীবনে বিশ্বাস-সংস্কার-প্রেম সবই অনিশ্চয়তার শিকার। উপন্যাসের ভাষায় :

ভূমি মারো মাছ, তোমাকে মারেন আর একজন। সংসারের নিয়ম। কুড়ি গণ্ডটা ব্যতিক্রম, তবে মাছমারাদের কাছে ব্যতিক্রম নয়। তার মরণের লিখন একটু অন্য রকম হয়। যার সঙ্গে তোমার বাস, যে তোমার শ্বাস, সেই মাছের সঙ্গে তোমার মরণের সুতো গাঁথা হয়। বাইরে মারো আর ঘরেই মারো। নিদেনকালে রক্তমাখা মীনচক্ষুর সঙ্গে চোখাচোখি হবে তোমার। (সমরেশ, ১৯৯৭ : ২০৭)

বাথান, টানা-পোড়েন প্রভৃতিও সম্প্রদায়ভিত্তিক উপন্যাস। সংশ্লিষ্ট উপন্যাসগুলোতে সমরেশের পর্যবেক্ষণ নিখুঁত। তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যেতেন গভীরভাবে। প্রচুর উপকথা ও মিথ-ব্যবহার গঙ্গাকে বিশিষ্ট করে তোলে। অবচেতনার অংশ হয়ে সেসব বিশ্বাস মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে জীবনের নির্মম বাস্তবতার প্রকাশক ‘বারমাস্যা’। এরই মতো দুঃখ-বিরহগাথা গঙ্গার অনন্য বৈশিষ্ট্য। অস্তিত্ব ও জীবিকার সংস্থানদাতা গঙ্গাই তাদের পরম আরাধ্য। জীবিকা-উৎপাদনের উদার ক্ষেত্র গঙ্গায় কখনো নেমে আসে নিষ্ফলা মন্বন্তর। লেখক তুলে ধরেছেন আঞ্চলিক সংস্কৃতি, লোকজ উৎসব ও জীবনচরণ। সাংস্কৃতিক উৎসবসমূহ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনধারা পূর্ণ-অনুভবে খুবই জরুরি। সমরেশ বসু উপলব্ধি করেন-উপরিকাঠামোর তলার বাস্তবকে, জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবকাঠামো এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকে। জেলেজীবনকে কেন্দ্র করে বর্ণনার ক্ষুদ্র ডিটেলস্কেও লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের (১৮৯৯-১৯৬১) *দি ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সির* (১৯৫২) সঙ্গে তুলনীয় গঙ্গা সংগ্রামশীল অপরাজেয় মানুষের শিল্পভাষ্য। বৃদ্ধ সান্টিয়াগোর মতোই জীবনের তীব্র কষাঘাত ও বিপদসঙ্কুলতায় নিবারণ-পাঁচু-বিলাসরা হার না-মানা চরিত্র। কোনো উপন্যাসিক সাফল্যের সীমায় পৌঁছেন যখন শিল্পে সমাজ ও মানুষের সমীকরণ সম্ভব হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় :

একজন উপন্যাসিকের পক্ষে জানা দরকার অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভুক্ত সংযোগ স্থাপনের কৌশল। সংশ্লেষণ ও বিয়োজনের মধ্য দিয়ে একটি কেন্দ্রীয় বোধে পৌঁছে উপন্যাসিক যখন তার নিজস্ব বোধ বিস্মৃত হন-তখনই তিনি সময় ও সমাজের সাংস্কৃতিক অন্তর্ভূতনকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন। আসলে সব অর্থেই উপন্যাসিককে গ্রথিত জীবনের সমগ্রতার অংশীদার হয়ে উঠতে হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গী অর্জিত সময়বোধের মধ্য দিয়ে জীবনের কোষে কোষে জমা দিতে হবে তাঁর অভিজ্ঞতা ও পটভূমি-সম্পৃক্ত জীবনবোধকেও। সময় ও সমাজের যুগলবন্দিতে তখনই উপন্যাসিক একই সঙ্গে সম্পৃক্ত ও নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। (জহর, ২০০১ : ২৭১)

সময় ও সমাজের গভীর অভিজ্ঞানে বিশালায়তনিক গঙ্গার রূপ এ উপন্যাসে বিধৃত। জেলে-জীবনের পূর্ণ সাংস্কৃতিক কাঠামো সেখানে উপস্থিত। গঙ্গার বুকে জেলেদের জীবনধারণ, জীবননাশ তথা বাঁচামরার লড়াই সবই লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ। সমরেশ আত্মজীবনীমূলক রচনায় বলেন :

মানুষ কি নিরন্তর তার জীবনকে (বেঁচে থাকাকে) এক সুদূর অনিশ্চয়তার মধ্যে শিকার করে ফিরছে? এই জিজ্ঞাসা জেগেছিল, গঙ্গার 'বুকে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে। মাছ 'ধরা' কথাটা তখনই অসত্য মনে হয়েছিল এবং মৎস্যজীবীদের আমি অভিহিত করেছিলাম 'মাছমারা' নামে। নির্দয় অসহায় সেই শিকারী জীবন, যার সার্থকতা কেউ বা কোন নীতি তাদের হাতে তুলে দিতে পারে না। তাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস আর নিরন্তর চেষ্টা ব্যতিরেকে। (সমরেশ, ১৯৮৮ : ২৯)

২

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাহীনতা দেশজুড়ে প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় ব্যাপক শূন্যতা। এরই মাশুল দুর্নীতি, কালোবাজারি, বেকারত্ব, হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড। নরহরি কবিরাজের বক্তব্য স্মরণ করে বলা যায়, 'জাতীয় বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশকে ধনতন্ত্রের পথে পরিচালিত করল। ফলে দেশ, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার পথে কিছুটা অগ্রসর হলেও, ধনতন্ত্রের পথে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে জনগণের ভাগ্যে জুটল মুদ্রাস্ফীতি মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী।' (নরহরি, ১৯৭৮ : ২৪২) লিওনার্দো মোসলির তথ্য-অনুযায়ী, 'পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে উদ্বাস্ত-আগমন চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৪৭ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক টানাপড়ের নানাকারণে এদের আগমন।' (Leonard Mosley, 1961 : 243-246) বস্তুত, কলকাতার নাগরিক জীবনে এই বিপুল জনসমাগম প্রভূত সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। এ অবস্থায় ব্যক্তিমানুষ হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন, অসহায়। বুদ্ধদেব বসু সময়কে চিত্রিত করেছেন :

এদিকে ফেনিল হয়ে উঠেছে শহরে- স্বার্থে সংঘাতে, বিলাসের লাস্যে, দারিদ্র্যের ভয়াবহতায়, উপছে পড়ছে কূল ছাপিয়ে- মর্মান্তিক সংগ্রামে, অর্ধগৃধ্নুতার পিশাচ বৃত্তিতে, সভ্যমানুষের দীর্ঘজটিল প্রণয়ে, রসবোধের সৌন্দর্য উপাসনায়, ভাড়াটিতে, বোকামিতে, হাস্যশ্রোতে, নিষ্ঠুরতায় বিচিত্র বহুমুখী জীবন, প্রাণের অফুরন্ত, অপরিণত লীলা। (বুদ্ধদেব, ১৯৫৮ : ২৫-২৭)

বিচ্ছিন্নতাবাদ সন্ত্রাস হত্যা লুণ্ঠন জিঘাংসার ফলে সমকালীন জনজীবনে অন্ধকার নেমে আসে। শাসকদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা তখন প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। নকশালবাড়ির ঘটনায় কমিউনিস্ট নেতৃত্ব হয়ে ওঠে আপোষমুখি। গোটা জাতিই তখন দিশেহারা ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাঘিনী সময়ের জটিলতা ও যন্ত্রণার আখ্যান। স্বাধীনতা-উত্তর অর্থনৈতিক পঙ্গুদশা, রাজনৈতিক অস্থিরতা বয়ে আনে চরম দুর্ভোগ-দুর্দশা। দেশব্যাপী বেড়ে চলে শিক্ষিত বেকার সংখ্যা। বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আকর্ষিত হয় বহু যুবক। শ্রেণিহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে অনেকেই। এর মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতাও জন্ম নিতে থাকে। শিক্ষিত বেকার কেউ কেউ হয়ে ওঠে জঙ্গি নেতা। গ্রামীণ অর্থনীতির বিপন্নতায় জীবনের চরম উত্থান-পতন-বিপর্যয় হয়। পঞ্চাশের উত্তরঙ্গ কিংবা জগদলের মতো বহিরাগত নয়, সামাজিক খ্রিশঙ্কু অবস্থা বোঝাতে বাঘিনীতে ভূমিজাত চরিত্র তৈরি করেন সমরেশ। তারা প্রচলিত মূল্যবোধে অস্থায়ী, আপোষহীন কিন্তু অসহায়ত্বে বন্দি। এসময় *বিবর* (১৯৬৫), *প্রজাপতি* (১৯৬৭), *পাতক* (১৯৬৯) *বিশ্বাস* (১৯৭০), *স্বীকারোক্তি* (১৯৬৯) প্রভৃতি উপন্যাস রচিত হয়। নাগরিক জটিলতা, অন্তঃসারশূন্যতা চিত্রণ এ সময়ের

সমরেশ-উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে শুধু শহরকেন্দ্রিক বাস্তবতায় বাঘিনীকে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় নয়। এ উপন্যাস গ্রামীণ পটভূমি নির্মিত। চরিত্রের অন্তর্গত গতিপথও উল্লিখিত রচনাসমূহ থেকে ভিন্ন।

ষাটের শূন্যতায় এ উপন্যাস চিন্তাগতভাবে প্রাতিশ্রুতিক। অন্যায় ও রাজনীতির জটিল-আবর্তে পতিত মানুষের বন্দিত্ব এতে উদ্ঘাটিত। সময়ান্তরে চরিত্রে শুভবুদ্ধির উদ্বোধন ঘটে। তাই মানবিক সম্ভাবনার অস্তিত্ব-প্রবণতায় এতে সিনিজম প্রবল নয়। প্রথমদিকে নায়ক চিরঞ্জীবের অস্থিরতা সময়েরই অভিঘাত। তার পরিণতি রাজনৈতিক আদর্শবাদে থিতু হবার মন্ত্রণাসিক্ত। আপাতভাবে বাঘিনী চোলাইমদ চালানকারীর গল্প। বিষয়ের সঙ্গে চরিত্র ও ভাষা-নির্মাণে তিনি আনেন নতুনত্ব। পুরুষচক্ষুর শাসানি যা, পুরুষের উখিত শিল্পের অহংকার, নারীকে অধোনাথ করে রাখে। (Fiona Tolan, 2006 : 334) বাঘিনী উপন্যাসে রয়েছে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের ধর্মকাম জটিলতা। শুধু যৌনতা প্রসঙ্গেই পুরুষের তুলনায় দুর্গা খাটো নয়; সামাজিক কর্মকাণ্ডে ও অবদমনেও হয়ে ওঠে নিচুস্তরের। তার ওপর দেহগত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিষ্পেষণ চলতে থাকে। এ অবস্থাকে ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণের আলোকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়— ‘সে এখন ইন্ডিপাস গৃঢ়া অতিক্রম করে পরিণত হয়েছে লিঙ্গায়িত বিষয়ে (gendered subject); কিন্তু তা করতে গিয়ে, সে তার নিষিদ্ধ ইচ্ছাকে মাটির নিচে ঠেলে দিয়েছে; চাপা দিয়েছে তাকে এমন স্থানে যাকে আমরা বলি অবচেতন। অবচেতন মন অবশ্য এরকম একটি ইচ্ছাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত ও অপেক্ষমান ছিল না। এই প্রাথমিক অবদমনকর্মই তাকে তৈরি করে। বেড়ে ওঠা পুরুষ হিসেবে ছেলেটি এখন সেইসব মানচিত্র ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকবে সমাজ যাদের সংজ্ঞায়িত করে ‘পুরুষালি’ (masculine) বলে।’ (টেরি, ২০০৪ : ১৬০)নারীর ক্ষমতা ও উত্থান যেখানে সীমিত সেখানে অপরশক্তির দমন-প্রবণতা অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পায়। যৌনচিহ্ন-স্মুরিত শরীর নিয়ে যেন বিব্রত দুর্গা, পিতৃমৃত্যুতেও তার রেহাই নেই।

বিবর, প্রজাপতি কিংবা পাতক ছাড়াও এ পর্বে রচিত স্বীকারোক্তি, বিশ্বাস বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে খুব একটা আলাদা নয়। উপন্যাসগুলোর কেন্দ্রে নায়কের যন্ত্রণা, দ্রোহ, হতাশা, চরিত্র-স্থলন, সমাজের প্রতি বিমোদার। এ পর্বের উপন্যাসগুলোতে রাজনৈতিক বিশ্বাসহীনতায় নায়কের অপমৃত্যু ঘটে। ঘটনার ঘনঘটা, চরিত্রে বিশ্বাসের নৈরাজ্য— নানাবিষয় অন্তর্ভরণে অনিবার্যভাবে মূলচরিত্রের অপমৃত্যু লেখক অতিক্রম করতে পারেন না। ষাট দশকের সাহিত্যের নানা বাঁকবদলের সঙ্গেও সমরেশের উল্লেখযোগ্য সংযোগ লক্ষণীয়। চরিত্র-অন্তর্লোকে আবিষ্কারে হতাশার চরম নির্বেদ উপস্থাপিত হয়। এ সময় সমাজ-রাজনৈতিক বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতায় ব্যক্তি বিচ্ছিন্নসত্তা। মানুষ ক্রমশ সরে যায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ থেকে। অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাসে বলেন :

এই তৃতীয় পর্বের উপন্যাসগুলির সংকটবোধের কেন্দ্রে আছে সমাজবোধের সম্পূর্ণ অপসারণ এবং তজ্জনিত শূন্যতাবোধের ভয়াবহ ভার। এই অন্ধকারের উপন্যাসগুলির জগৎ-মূল্যহীনতা, অস্থিরতা, পাপবোধ, আত্মগ্লানি, ক্রোধ এবং আত্মহত্যার জগৎ। এখানে এমন এক জগতে আমরা প্রবেশ করি যেখানে বিশ্বের আলোক লুপ্ত হয়ে গেছে-হিংস্র রাত্রি সব কিছুকে আকীর্ণ করে ফেলেছে; পৃথিবীতে এক অদ্ভুত আঁধার এসেছে, যখন সততা মহত্ত্ব মানবিকতাবোধ সব শকুন ও শেয়ালের খাদ্য। (অশ্রুকুমার, ১৯৮৮ : ৩০৫)

এই নেতিবাচক ফল বহন করে পরবর্তী প্রজন্ম। মূল্যবোধের অবনমনে যুবসমাজ ধ্বসে যায়। নীতিহীন সমাজে তারা দিশেহারা- কেউ আশ্রয় নেয় সম্ভ্রাস-জগতে, কেউ হয় অস্ত্র ও মাদকের শিকার। উপন্যাসিকের ভাষার ধরনও যেন পাল্টে যায়। নায়কের অন্ধকার-জগত প্রকাশিত হয় আত্মকথন-ভঙ্গিতে। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের হাতে জন্ম নেয় প্রায় সমধর্মী কথনরীতির উপন্যাস। যেমন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্ধ্যার সুর (১৯৬৬), নির্জন শিখর (১৯৬৮), কাঁচের দরজা (১৯৭০), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ঘুণপোকা (১৯৬৭), বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের যদু বংশ (১৯৬৭), সমরেশ বসুর প্রজাপতি (১৯৬৭), পাতক (১৯৬৯), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ (১৯৭০) প্রভৃতি। এসব উপন্যাস ভাষা গঠনশৈলী ও চরিত্রে অভিনবত্ব ঘোষণা করে। সমাজস্বত থেকে নির্মিত বিধ্বংসী মানসপ্রবণ নায়ক আত্মকথনরীতিতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। নায়কের মৌখিক ভাষায় অনুভূত হয় সময়ের মেজাজ। প্রথাসিদ্ধ উপন্যাসের বর্ণনারীতি ও ভাষা পরিত্যাগ করেন তিনি। প্রচলিত কথ্যভঙ্গি নস্যাত্ব করে বিচূর্ণ স্ল্যাঙভাষ্যে নায়কের মনোবিকার অঙ্কিত হয়। উপন্যাসিক কৃত্রিমতা বা ভান-ভণিতার আশ্রয় নেননি কিংবা তোলেননি নৈতিকতার জিগির :

আসলে ‘বিবর’ আমাদের উপনিবেশিক, বিকৃত ভিত্তিরীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আর এ প্রতিবাদ সামগ্রিক, এ কারণে এ ব্যক্তিটি বিচ্ছিন্ন হলেও সমগ্র। এখানে নীতিবোধ অনিবার্যভাবে রক্তমাংসের অস্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। (পার্থপ্রতিম, ১৯৮৯ : ৬৭)

ষাট দশকে দুএকটি ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে অধিকাংশ উপন্যাসেই নাগরিক জীবন ও আধুনিক মানুষের সঙ্কট রূপায়িত। সমাজের সঙ্গে তখন নায়কের সংঘর্ষ অনিবার্য। একটি শ্রেণির কাছে কুক্ষিগত ক্ষমতা-রাজনীতি-অর্থনীতি। তাই প্রতিবাদের ভাষা ভিন্ন, ব্যতিক্রম নায়কের আচরণ। কলকাতার নাগরিক জীবনে নয় শুধু, এ সমস্যা বিশ্বব্যাপী। যুবসমাজের বর্তমান-ভবিষ্যত অন্ধকারে, ‘কলকাতা- তার ঐশ্বর্য আর ধুলো, তার ক্রন্দ আর আলোকমালা, তার রোগ হতাশা উন্মত্ততা উল্লাস ব্যভিচার নিয়ে’ (বুদ্ধদেব, ১৯৫৮ : ২৫) আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?— এ-প্রশ্ন তোলেন বুদ্ধদেব বসুও। তাই :

গৃহকোণ থেকে নির্বাসিত তরুণরা বাইরের সমাজে নানা রকমের ‘কোণ’ বা ‘কর্নার’ খুঁজে বেড়ান, কফি হাউসের কোণ থেকে রাস্তার কোণ। সমাজের চারিদিকে মোচাকের মতো তরুণদের বিচিত্র ‘ডেন ও কর্নার’ গজিয়ে ওঠে। (বিনয়, ১৯৯৯ : ১১৪)

সমস্ত সংসারকে বিপদসঙ্কুল ফাঁদে বন্দি করে সীমিত সংখ্যক স্বার্থবাদী অমানুষ। ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্রের স্বাস্রোধ করে। বিজ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয়-সাধনে আস্থা

হারায় মানুষ। শান্তি স্থাপন কিংবা স্বাধীনতায় বিশ্বাস হারিয়ে মানুষ হয় নিরাশ। জীবন যুক্তিহীন, অর্থহীন, দলছুট- এইসব ভাবনা কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'Absurd-ধর্মী সাহিত্য'। এ সম্পর্কে বলা যায়, 'Absurdist fiction is a genre of literature, most often employed in novels, plays or poems, that focuses on the experiences of characters in a situation where they cannot find any inherent purpose in life, most often represented by ultimately meaningless actions and events. Common elements in absurdist fiction include satire, dark humour, incongruity, the abasement of reason, and controversy regarding the philosophical condition of being "nothing."' (Neil, <https://www.scribd.com> : 2006)

জ্যাঁ পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০), আলবেয়ার ক্যামু (১৯১৩-১৯৬০), অঁদ্রে মালরো (১৯০১-১৯৭৬), সিমন্ দ্য ব্যুভোয়া (১৯০৮-১৯৮৬) এ ধারার সাহিত্যিক। নাগরিক সভ্যতার চূড়ান্ত অবনমন ঘোষিত হয় আলবেয়ার ক্যামুর *The Outsider* উপন্যাসে। নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত নায়ক মায়ের মৃত্যুতেও নির্বিকার। *বিবরে*ও পাই জীবনবিরুদ্ধ নির্লিপ্ত নায়কের সন্ধান। লেখক পাশ্চাত্য তত্ত্ব-অভিযোজনকরে সাহিত্য করতে চাননি- যুগসঙ্কট-আবর্তে অনিবার্যভাবেই পাত্রপাত্রীরা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। জীবনের প্রথম পর্যায় থেকেই ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬), ল্যু শুন (১৮৮১-১৯৩৬), জ্যাকলন্ডন (১৮৭৬-১৯১৬), আলবেয়ার ক্যামু কিংবা আর্নেস্ট হোমিংওয়ে (১৮৯৯-১৯৬১) তাঁকে আকর্ষণ করতো। ষাট দশকের সমাজ-রাজনীতি ও সর্বৈব ধ্বংসের মধ্য থেকে অভিনব রীতির নিরীক্ষা চেয়েছিলেন সমরেশ। চরিত্রের কনফেশন, বিচ্ছিন্নতা গড়ে ওঠে এ সময়। বিনয় ঘোষ সময়ের নাগরিক মন আবিষ্কার করেন :

জীবনে আকাশ নেই মাটি নেই সবুজ নেই। মহানগরের জীবন। এক কামরার ফ্ল্যাটবাড়ির রুদ্ধ ঘরের টবের ফুলগাছের মতো শহুরে মানুষের মন। আকাশের সূর্যকিরণ তাকে স্পর্শ করে না।

(বিনয়, ১৯৯৯ : ৫৮)

এমন পরিবেশে উপন্যাসে স্থলন-পতনোন্মুখ নায়ক চরিত্রের প্রবেশ ঘটে। ফলে নায়ক হয়ে পড়ে সংযোগহীন ব্যক্তিত্ব। সমরেশ বসুর উপন্যাসে সমাজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্ভাবনা, নিরাশা, স্থলন-পতন ও পরাজয় শিল্পিত রূপ লাভ করে। *বিবরের* শেষে ক্যাকটাসের বৃকে রোদ পড়ে, *পাতকে* অন্ধকার সুন্দর হয়ে ওঠে, পুষ্পের মতো ফুটে ওঠে; যার নাম আশাবাদ। এ পর্যায়ের অন্যান্য রচনা যেমন *বিশ্বাস* ও *স্বীকারোক্তি*তেও যুগভাষ্য নির্মিত। প্রত্যেক নায়কে অস্তিত্ব-সঙ্কট জীবন-বাস্তবতার চরম সাক্ষ্য হয়ে ওঠে। এ সময়ে রচিত একটি বড় গল্প 'মানুষের' (১৯৭০) বিষয়বস্তুও 'বিবর পর্বের' উপন্যাস-অনুরূপ। *বিশ্বাসের* (১৯৭০) নায়ক নীরেনের মধ্যে আছে সুখেনের ছায়া। এ পর্বের সব নায়কই বিষাদখিন্তায় আক্রান্ত। ভালবাসার পরিবর্তে তারা পায় জীবজন্তুর মতো স্থূল যৌনসম্বোধের স্বাদ। অথচ নৈতিক ও স্বাধীন হতে চায় তারা। অস্তিত্বশীল মানুষ হবার বিবিধ গুণ থেকে তারা বরাবরই বিচ্ছিন্ন। গঠনমূলক নয়, তারা ধ্বংসাত্মক

কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে। তারা সম্পূর্ণ পৃথিবীর ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে, পরিণামে ধ্বংসের মধ্য দিয়েই অস্তিত্ব ঘোষণা করে। Andriy Tsintsiruk দস্তয়েভস্কির অস্তিত্ববাদ প্রসঙ্গে ‘Freedom beyond Reason in Dostoevsky’ প্রবন্ধে মানবচরিত্রের এই ধ্বংসাত্মক আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

And if he has no other remedy, he will plan destruction and chaos, he will devise all sorts of sufferings, and in the end he will carry his point! He will send a curse over the world, and as only man can curse, he may by his curse alone attain his object, that is, really convince himself that he is a man and not a piano-key! (Andriy, 2004 : 220)

কান্টীয় সার্বিক নীতির আলোকে ‘বিবর পর্বের’ নায়করা নৈতিক নয়। তারা সমাজ-প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের ধারক-বাহক নয়। সাত্ত্বীয় অস্তিত্ববাদ এদের চরিত্র ব্যাখ্যায় উপযোগী দর্শন। স্পিনোজা বা কিয়ের্কেগার্ডের নির্ধারিত ভাগ্য কিংবা ঈশ্বরের মহিমা দিয়েও এদেরকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সবগুলো উপন্যাসেই অনিকেত নায়কের অশ্রদ্ধা, বিবমিষা, ঘৃণা ও অবিশ্বাসের বিষবাস্প ছড়ানো।

দেশভাগ-পরবর্তীকালে পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গ অভিবাসনের করুণ জীবনালেখ্য সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা (১৯৬৯)। বাস্তবতা-ত্যাগী সাধারণ মানুষের জীবনে দেশভাগ অধিকতর প্রভাব ফেলে। বিশেষত শহরে স্বদেশ-বিচ্ছিন্ন উদ্বাস্তু মানুষের ভিড় বাড়ে। মানুষের মূল্যবোধ পতনোন্মুখ হয় ভয়ানকভাবে। স্বপ্ন ও সম্ভাবনা নিয়ে ভারত-পাকিস্তান দুটো আলাদা রাষ্ট্র হয়। কিন্তু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে না। নিম্নজীবী নিরন্ন মানুষের হাহাকারে পূর্ণ হয় দেশ। এ-শ্রেণির মানুষের জটিল বাস্তবতা এ আখ্যানে উদ্ঘাটিত। ব্যক্তির অন্তর্দহনে উত্থিত চিৎকার এতে অনুপঞ্জভাবে উঠে আসে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুচাঁদ; তার মধ্য দিয়েই নিষ্করণ জীবিকান্বেষণ, টিকে থাকার সংগ্রাম, প্রেম, সীমাহীন জীবন-যন্ত্রণা সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত। উপন্যাসিকের প্রাসঙ্গিক একটি বক্তব্য : ‘এলো স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ। দেশ বিভাগকে আমি অন্তর থেকে কোনো-কালেই মেনে নিতে পারি নি।’ (সমরেশ, ১৯৮৬ : ৬৭) উপন্যাসে সুচাঁদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে দেশভাগ, হিন্দু-মুসলমান সংকট, স্বদেশ হারানোর কান্না চমৎকারভাবে রূপায়িত। সুচাঁদ আসলে রাজনৈতিক দেশবিভাজনের বলি। নিম্নকোটির কঠোর জীবন-সংগ্রাম ও নিরন্তর দুঃখশ্রোত এখানে সমীকৃত। উচ্চকোটির মানুষ দেশভাগের যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু তাদের পরিণতি নির্মম নয়। নিম্নশ্রেণির মানুষই কেবল দেশভাগের কঠিন যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়। নায়ক হিসেবে সুচাঁদ এ উপন্যাসের সম্পূর্ণ কাহিনির চালক। সকলের বেদনা সে স্থায়ী স্ফন্দে তুলে নেয়, অথচ তার পরিণতি নির্বাসন তথা জেলবাস।

৩

সময়ের ধারাবাহিকতায় সত্তর দশকে উপনীত সমরেশ বসু। দুদশক অতিক্রান্ত সাহিত্যজীবনে ঘটেছে বিষয়, ভঙ্গি ও ভাষার ব্যাপক পরিবর্তন। এ সময়ের উপন্যাসে

প্রতিফলিত হয় ভারতবর্ষের নকশালবাড়ি আন্দোলনের দুঃসাহসিক অভিযান। ১৯৭২ সালে নকশালের তাত্ত্বিক নেতা চারু মজুমদারের হেফতারের পর আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়। দশকের শেষতম সময়ে লেখকের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে সময়ের অস্থিরতা কেটে নতুন বার্তা সূচিত হয়। *গঙ্গা* কিংবা *উত্তরঙ্গের* মতোই পুরনো ধারার আবর্তন আসে *টানা-পোড়েনের* মতো উপন্যাসে। ষাট দশকের নকশালপন্থী আন্দোলন স্বপ্ন-আকাক্ষা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত সংগ্রামসহ হিংসাত্মক কার্যকলাপ রাজনৈতিক সংগ্রামের সাধারণ একটি ধরনে পর্যুবসিত হয়। (কোকা, ১৯৮৬ : ৭১৪) নকশালবাদী আন্দোলনের আন্তির দিকসমূহও প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে পুলিশি নির্যাতনে নকশাল নেতাদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। এবং *জলার্ক* পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষক কিশলয় সেনের বক্তব্য :

...সত্তরের দশকের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম শহরে উচ্চবিত্ত এবং গ্রামের জোতদার-মহাজনের নিরাপদ ভোগতৃপ্ত বিলাসী জীবনে আসের সম্ভার করেছিল; এটা সমরেশ বাবু মেনে নেননি। ভারতের রাজনৈতিক জগতে ‘সত্তরের দশক’ যে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, একটা গভীর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভয়ঙ্কর চেহারাটাই সেটা প্রমাণ করে। (কিশলয়, ২০০০ : ২৫৩)

দেশের মানুষের বন্দিদশা, রাজনৈতিক বিরোধ ও উত্তাপ, মধ্যবিত্তের অসহায়ত্ব অবলম্বনে এ সময়ের সাহিত্যিকগণ উপন্যাস রচনা করেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), বিমল কর (১৯২১-২০০৩), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২), দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০) প্রমুখের মধ্যে যে সময়ের অভিঘাত সমরেশও সেখান থেকে পিছিয়ে নেই। সত্তরের রাজনীতিকেন্দ্রিক একপ্রকার স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস তৈরি হয়; যেমন : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *কাঁচের দরজা* (১৯৭০), প্রমথনাথ বিশীর *পূর্ণাবতার* (১৯৭২), সমরেশ বসুর *বিশ্বাস* (১৯৭০), *মানুষ* (১৯৭০), *অশ্লীল* (১৯৭৩), *অপদার্থ* (১৯৭৯) ইত্যাদি। এ সকল রচনায় মানুষের হিংসা, ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার অপব্যবহার, পার্টি রাজনীতির অসঙ্গতি অবলীলায় উঠে এসেছে। মিহির মুখোপাধ্যায়ের *শঙ্খমালা* (১৯৭৩), শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *অবনী বাড়ি আছে* (১৯৭৩), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *তৃণভূমি* (১৯৭৩), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ফোটা পদ্মের গভীরে* (১৯৭৫), প্রফুল্ল রায়ের *কেয়াপাতার নৌকা* (১৯৬৯-৭১), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের *ঈশ্বরীতলার রূপকথা* (১৯৭৫), গৌরকিশোর ঘোষের *প্রেম নেই* (১৯৭৫) ইত্যাদি যুগসঙ্কটের ভাষ্য। নকশাল প্রেক্ষাপটে রচিত স্বর্ণমিত্রের *থামে চলো* (১৯৭২), অসীম রায়ের *অসংলগ্ন কাব্য* (১৯৭৩), শঙ্কর বসুর *কমুনিস* (১৯৭৫), সমরেশ বসুর *মানুষ শক্তির উৎস* (১৯৭৪), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *শ্যাওলা* (১৯৭৭), জয়ন্ত জোয়ারদারের *এভাবেই এগোয়* (১৯৭৮) প্রভৃতি উপন্যাস। এ ছাড়াও কৃষিবিপ্লব ও নকশাল বাড়ি আন্দোলন শিল্পিত অভিব্যক্তি লাভ করেছে মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশীর মা* (১৯৭৩), *অপারেশন বসাই টুডু* (১৯৭৮), সমরেশ বসুর *মহাকালের রথের ঘোড়া* (১৯৭৬) প্রভৃতি উপন্যাসে।

মূল্যবোধের সঙ্কট ও জীবন-জটিলতার আখ্যান সমরেশ বসুর *অশ্লীল* (১৯৭৩)। *অশ্লীল* উপন্যাসটি সত্তর দশকে রচিত হলেও ষাট দশকের *প্রজাপতি*, *বিবর* কিংবা *পাতকের* মতোই বিচ্ছিন্নতার আবর্তে নিমজ্জিত ব্যক্তি ও সমাজের চিত্রায়ণ। তবে ‘বিবর পর্বে’র ওই কটি উপন্যাসে যে-ধরনের ভাষাভঙ্গি ও বর্ণন-কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে সেদিক থেকে *অশ্লীল*ে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। নৈতিক ভাবাদর্শের আলোকে তৃতীয় পক্ষ সৃষ্টি করে তিনি অবলীলায় দংশন করেন সামাজিক স্বেচ্ছাচারবৃত্তির মানুষকে। পটভূমি বা পরিবেশের দিক থেকে উচ্চবিত্ত-সমাজ ও তাদের অন্তর্জগত এতে উন্মোচিত। *অশ্লীল*ে অবসিনিটি এসেছে সময়ের প্রয়োজনে, অন্তর্জগত উদ্ঘাটন-আকাঙ্ক্ষা স্বীকার করে। উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি ব্যক্তির কাছে জীবনটা সিরিয়াস দর্শন নয়। এদের লালসাপূর্ণ ন্যাক্কারজনক জীবনঘিরে অসুস্থতা অতৃপ্তি সীমাহীন ভোগাকাঙ্ক্ষা। তাদের কাছে শুভবোধসম্পন্ন ব্যক্তি নেহায়েৎ অবুদ্দিমান প্রাণি, সরলতার অপর নাম বোকামি। তাদের সমাজে চিন্তা ও যাপনে শুদ্ধতায় বিশ্বাসীরা যেন অন্যগ্রহের জীব, অভিযোজন ক্ষমতাবিবর্জিত নির্বোধের দল। বুর্জোয়া সমাজের মূল্যবোধের সঙ্কট, কলকাতার সিভিল সোসাইটির অজানা কাহিনি লিখতে চেয়েছেন সমরেশ। মদন পুরো উপন্যাসে সততা-নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা। কিন্তু তার সরল অভিব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সমাজে অচল। জীবনবোধ যদি সত্যি হয়, জীবনবোধের যন্ত্রণা আরো বেশি সত্য। মানবজীবন সম্পর্কে গভীর ও বাস্তব এ বিষয়টাই *অশ্লীল* উপন্যাসে সমরেশ বসু প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রাজনৈতিক উপন্যাস *মানুষ শক্তির উৎসে* (১৯৭৪) ‘অস্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়’- এ সত্যটি অভিব্যক্ত। সমাজবাদলের সত্যিকার শক্তির উৎস-অন্বেষণে ব্যক্তির উদ্যোগ বড় হয়ে উঠেছে এ উপন্যাসে। নকশালবাড়ি আন্দোলনকারীদের কাছে অস্ত্রশক্তি বড় হয়ে দাঁড়ায়। অব্যবহিত পূর্বে ঘটে গেছে কম্যুনিষ্ট শিবিরের বিভাজন। উপন্যাসে কবি অংশুমালী গুপ্তের দর্পণে মানবিক সঙ্কট প্রতিফলিত হয়েছে এভাবে : মানুষ ‘মৌমাছিতন্ত্রে’ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে পারে না। (সমরেশ, ২০০২ : ১৫২) ‘মৌমাছিতন্ত্র’ বলতে আসলে যান্ত্রিক ‘সমাজবাদ’কে বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে রাজনীতিতে অস্ত্রব্যবহারের অনিবার্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কবি অংশুমালী এ নীতিতে বিশ্বাসী নয়। যুগসঙ্কটের আবর্তে তখন ক্ষমতার হোলিখেলা, মহোৎসব। সমরেশ বসুর লক্ষ্য- এ সময়ের মানুষ ও রাজনৈতিক বাস্তবতা তুলে ধরা। সজল-সুবীর-যমুনা সহ সকল চরিত্রের মধ্যদিয়ে তিনি রাজনৈতিক আদর্শবাদ ব্যক্ত করেন। এ উপন্যাসে ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্বের তুলনায় রাজনৈতিক ভাবনা উচ্চকিত। তবে রাজনৈতিক হত্যাকেন্দ্রিক ব্যক্তি-অন্তর্গত ভয়াবহ যন্ত্রণা যমুনা চরিত্রের স্মৃতিমাধ্যমে অগ্রসর। তবুও চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের চেয়েও এ উপন্যাস বক্তব্যপ্রধান। কিন্তু *মানুষ শক্তির উৎসে* অঙ্কিত সমকালীন রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি যথেষ্টই গুরুত্ববহ।

প্রতারণা ও প্রায়শ্চিত্তের আখ্যান *অবরোধ* (১৯৭৫) পশ্চিমবঙ্গের উচ্চবিত্ত সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে রচনা। মালবিকা চৌধুরী ওরফে মিলু এর মূল চরিত্র। তার বাবা

অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায় কয়লাখনি অঞ্চলের সুবৃহৎ এলাকার আধিপত্যে। মিলু ও অভয়ের মাধ্যমে কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিক নেতা অভয়। এ উপন্যাস রাজনৈতিক আদর্শবাদ দ্বারা পরিচালিত। এ রচনায় নাটকীয় আবেশ তৈরি হয়েছে। তবে নাটকীয়তা সমেত সংশ্লিষ্ট শ্রেণি-অঙ্কনে কোথাও কোথাও কৃত্রিমতা বা অতিরঞ্জন লক্ষণীয়। উচ্চবিত্ত সমাজ-প্রতিভূ চ্যাটার্জিকে লেখক খল চরিত্র হিসেবে দাঁড় করান। তার নির্মম পরাজয়ের মাধ্যমে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নেন। অন্যদিকে নির্ধারিত মানুষের অধিকার আদায়কে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। চ্যাটার্জি কন্যা মিলু সমস্ত ঘটনার অনুঘটক, শুভবোধের প্রতীক। বুর্জোয়া পিতার জীবন ও কর্মপরিধির বিপরীতে সে মূর্তিমান বিদ্রোহ। এ উপন্যাসে প্রথাগত কাঠামো ভাঙেনি উপন্যাসিক। খুব সাদামাটা রোমান্টিক বাতাবরণে মিলু-অভয় সম্পর্ক চিত্রিত। উপন্যাসে অন্যান্য চরিত্রের তেমন নিজস্ব দীপ্তি নেই। মিলু চরিত্র মানবিক মহিমার স্কুরণ। এ আখ্যান ‘দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন’ ভূমিকায় অবতীর্ণ। *অবরোধ* উপন্যাস কলাকৌশল পাশ কাটিয়ে কাহিনি-প্রধান। তবুও এতে রয়েছে সামাজিক দায়ের প্রসঙ্গ। এ উপন্যাস মানবিকতার আদলে নির্মিত, সমসাময়িক ঘটনার রূপায়ণ মাত্র। বিবৃতির প্রাঞ্জলতা এর ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লিও টলস্টয় *What is Art* গ্রন্থে ‘সম্ভবরবাদে’র কথা বলেছেন। তাঁর কথার সারমর্ম হচ্ছে, সাধারণ মানুষের জন্য শিল্পকে হতে হবে সরল, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। অর্থাৎ শিল্প হবে সর্বজনবোধ্য। ১৯০৮ সালের দোসরা সেপ্টেম্বর অনুজ লেখক লি. নি. আন্দ্রেইয়েফকে লেখা একটি চিঠিতে শিল্পের সরলনীতির প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন : ‘...যা সচরাচর দেখা যায় এবং আমার ধারণা, বিশেষ করে এখনকার আধুনিক লেখকেরা যে-দোষে অপরাধী (সব সহিষ্ণুতা এরই ওপর দাঁড়িয়ে আছে) তা হচ্ছে— বিশিষ্ট ও মৌলিক হওয়ার ইচ্ছা, পাঠককে বিস্ময়বিমূঢ়, হতচকিত করে দেওয়া। ... এ ধরনের ইচ্ছা সরলতা বিবর্জিত, অথচ সরলতাই তো সুন্দরের প্রয়োজনীয় শর্ত।’ (অজয়, ২০০২ : ১৫৬) এক্ষেত্রে সমরেশ বসুর *অশ্লীল*, *মানুষ শক্তির উৎস*, *মহাকালের রথের ঘোড়া* কিংবা *অবরোধ* উপন্যাসের ভাষ্য-পরিস্থিতি টলস্টয়ের উপরিউক্ত শিল্পনীতির আলোকে চিন্তা করা যেতে পারে। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে রাজনৈতিক সমস্যার যে-সমালোচনা রয়েছে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নীতিপ্রচার, উপদেশ, কখনও শ্লোগানধর্মিতায় আক্রান্ত। তবুও সেসব শিল্প মানুষের কথাই বলে, এখানেই তাঁর রচনার মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব।

বিপ্লবের ব্যর্থ ও চরম পরিণতির নায়ক *মহাকালের রথের ঘোড়া* (১৯৭৬) উপন্যাসের রূহিতন কুরমি। আদি নৃগোষ্ঠী-অন্তর্গত রূহিতন কুরমি নকশাল আন্দোলনের উচ্চাশা ও চরম পরিণতি। কৃষিমজুর হিসেবে চা-বাগান, বন ও খনির কাজে নিযুক্ত এসব অঞ্চলের কৃষকেরা প্রধানত ভূমিহীন আদিবাসী সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা ও রাজবংশী। অরূপকুমার পালের বক্তব্যে এরাই হলো সমাজের সবচেয়ে নিপীড়িত ও শোষিত অংশ।

(অরুণকুমার, ২০০০ : ৩৩৩) এ উপন্যাসে সমরেশ রাজনৈতিক উপদেশমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। রুহিতন চরিত্র অঙ্কনের মধ্যদিয়ে উঠে আসে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস। বিস্মৃত এক মানবাত্মার গোপন কান্না তুলে ধরেন সমরেশ। যাবতীয় ব্যর্থতা, বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা থেকে রুহিতনের মুক্তি ঘটে মুতু্যতে। রুহিতনরা রথের ঘোড়ার মতোই বিপ্লবের রথ টেনে চলে। ঔপন্যাসিক গদ্যছন্দে তাঁর সে-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটান :

বিশ্বস্ত প্রশ্নহীন যোদ্ধারা লড়ে চলে
লেখা হয়ে চলে ইতিহাস।
ধ্বংস আর নব-নির্মাণের মাঝে
অখ্যাত সেই কোটীদের নাম কী।
যেন দেখি নিরন্তর
ছুটে চলে মহাকাল
বিশ্ব নিয়মের অধীন- ওরা অশ্ববহিনী
চিরকাল টেনে চলে রথ। (সমরেশ, ২০০২ : ৮২৬)

সমরেশ নিজেই তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে বলেন :

ইতিহাস লিখতে বসিনি ভূগোলও না। অতএব, উক্ত বিচারে ক্রটিমুক্ত নই। চরিত্র ও ঘটনার কোন বাস্তব সম্পর্ক আছে? লেখকের কল্পনা যেখান থেকে উদ্ভাসিত হয়, এ কাহিনী সেখান থেকে গৃহীত, পরিণতিতে তেমনি সৃষ্টি ছাড়া, আর একান্ত আপন। (সমরেশ, ২০০২ : ৮২৬)

নকশাল আন্দোলনের আর্কেটাইপ রুহিতন বাস্তব রাজনৈতিক অভিযান থেকে উঠে আসে। সে ছিল রাজনৈতিক আদর্শে একান্তভাবে সমর্পিত। তাঁর ট্রাজিক পরিণতি আন্দোলনের পরিণতি নির্দেশক। ব্যক্তিক বেদনার চরম উপলব্ধিতে তা হৃদয়বিদারক। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে ইরফান হাবিব বলেছিলেন, ‘ইংল্যান্ডের উৎপাদন সামগ্রীর রপ্তানি, প্রথমেই বয়ন শিল্পে, বাস্তবে বস্ত্রসামগ্রীর ভারতীয় রপ্তানিকে কেবল যে মুছে দিল তাই নয়, ভারতবর্ষের উৎপাদন কর্তাদের তাদের দেশীয় বাজারেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানানোর জন্য ভারতবর্ষে প্রবেশ করলো।’ (ইরফান, ২০০১ : ২৬৮) টানা-পোড়েন (১৯৭৯) এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। এর কেন্দ্রবিন্দুতে বিষ্ণুপুরের তাঁতিসম্প্রদায়ের ভেতর ও বাইরের দ্বন্দ্ব। বাদশাহী আমলের রেশমশিল্পের অতুলনীয় সৃষ্টি ‘বালুচর’ শাড়ি। তাঁতিশিল্পীদের বিস্ময়কর এ সৃষ্টি একসময় বিশ্ববাসীর মন জয় করে। পরবর্তীকালে মেশিনে বোনা সস্তা মনোমোহিনী শাড়ি আমদানি করে ইংরেজ। এদেশের তাঁতিশিল্পকে তারা ধ্বংস করে। সমরেশ বসু অবশ্য সে-সময়ের তাঁতির কথা বলেননি। তিনি উপস্থাপন করেন তাদের পূর্বসূরীদের কথা। তিনি চিত্রিত করেন স্বাধীনতা-পরবর্তী বিষ্ণুপুরের নতুন প্রজন্মকে। টানা-পোড়েনে তাঁতিজীবনের ইতিহাসের অবলম্বন বিষ্ণুপুরের অক্ষয় পাটরাঙা নামক এক ব্যক্তি। বিষ্ণুপুর অঞ্চলে রেশমকে পাট বলে। ‘রেশমকে যারা রঙিন করে, তাদেরই পাটরাঙা বলে। সেই হিসাবে অক্ষয়কুমারদের বংশগত পদবীই হয়ে গিয়েছিল ‘পাটরাঙা’। (সমরেশ, ২০০৩ : ৭৪২)

তিনি ঐতিহ্যবাহী বালুচরি শাড়ি সৃষ্টি করেন। প্রজন্মান্তরে তারই শিষ্যরা সৃষ্টিকে অব্যাহত রাখে। কিন্তু আধুনিক বুননযন্ত্রের আবির্ভাবে এর কদর নষ্ট হয়। লেখক উপন্যাস-অবয়বে বালুচরি শ্রষ্টাদের সঙ্কট তুলে ধরেন। *টানা-পোড়েন* উপন্যাসের নামকরণ ইঙ্গিত-মিশ্রিত। এর মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের তাঁতিদের জীবন-জীবিকার প্রতীকী সূত্র লুকানো। কাপড় বোনার তাঁতযন্ত্রের ‘লরাজে’ সুতা গোটানো ও টানা থাকে। মাকুতে সুতা লাগানোর কাজকে বলে পোড়না বা পোড়েন। এই টানা-পোড়েন শুধু তাঁতযন্ত্রের নয়, গোটা তাঁতিসমাজের জীবনযুদ্ধও। লেখক এ উপন্যাস উৎসর্গ করেন অতুলনীয় রেশমী সুতো শিল্পীদেরকে।

টানা-পোড়েন একদিকে তাঁতবিশ্বের ছবি, অন্যদিকে জীবনের রূপক। ঈশ্বরদাসের প্রবল বাধা সত্ত্বেও পাঁচু কীতরা জীবনসংগ্রামে এগিয়ে যায়। *টানা-পোড়েন* বিশিষ্ট জীবিকা ও অঞ্চলকেন্দ্রিক হয়েও গভীর-অন্বেষণ ও ভাবনার আখ্যান। এতে রয়েছে আঞ্চলিক উপন্যাসের বিশিষ্ট গুণ। *টানা-পোড়েনে* ভৌগোলিক সীমাসংহতির আধার হয়ে ওঠে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর গ্রাম। উপন্যাসে সমগ্র বিষ্ণুপুর অঞ্চলের খুঁটিনাটি পরিচয় দেন লেখক। বহু পেশাগত শব্দ, তাঁতযন্ত্রের ডিটেল্‌স, তাঁতবোনার সঙ্গে জড়িত বিচিত্র প্রতীক, আঞ্চলিক ভাষাব্যবহার, যৌনতা প্রভৃতি এ উপন্যাসের কাহিনিকে একটা বিশ্বাসযোগ্য মর্যাদা দেয়। *টানা-পোড়েনের* কেন্দ্রীয় চরিত্র পাঁচু আঞ্চলিক গোষ্ঠীজীবনের প্রতিনিধি হয়েও বিশিষ্ট। লেখকের শিল্পিত চোখে শিষ্য অক্ষয় পাটরাঙার রূপ ওস্তাদ অভয় খান। পাঁচু প্রকৃতই একজন নকশাশিল্পী। সে রেশমী সুতার অতুলনীয় বালুচরি শিল্পশ্রষ্টাদের প্রতিনিধি। পাঁচু তার জীবনের পরম সম্পদ শিল্পিসত্তার স্বীকৃতিও পায়। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেন :

ওস্তাদ অভয় খানের চ্যালা পাঁচু কীতের একটি বালুচরি নকশা; অভয় খানের অনুমোদন ও ঈশ্বরদাসের নকশা নেওয়ার রাজী হওয়া-না-হওয়া— এই ঘটনাটি উপন্যাসের শিরদাঁড়া অর্থাৎ একটি স্বপ্ন এই তাঁতী জীবনের ছোট জগতের সীমাটাকে দেশ-কালের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে প্রসারিত করে। ঘটনাটির দুটি দিক : অভয় খানের অনুমোদন পাওয়া, শিল্পের সার্থকতা পাওয়া : আর একদিকে ঈশ্বর দাসের সম্মতি পাওয়া, ব্যবসার দিক। পাঁচু কীত প্রথমটি পেলে, অর্থাৎ শিল্পীসত্তা জয়ী হল, স্বপ্ন এল বাস্তবে। (সমরেশ, ২০০৩ : ৭৪২)

তাঁতিদের আর্থসামাজিক ভাঙন-পরিস্থিতিকে লেখক তুলে আনেন সুদক্ষভাবে। জাতশিল্পী পাঁচু অর্থনীতির জাতাকলে শৃঙ্খলিত। ঈশ্বরদাসের উপস্থিতি উপন্যাসে তাই অমোঘ হয়ে ওঠে। ব্যবসা-বাজার পাঁচুর দখলে নেই। তাই তাকে শিল্পের জন্য চরমমূল্য ঘোষণা করতে হয়। বালুচরি শাড়ির নকশাটি আর বাস্তবায়ন করা হয়ে ওঠে না। কারণ বালুচরি শাড়ির বাজার তখন নষ্ট হয়ে গেছে। লাইলন, টেরিলিন, কৃত্রিম রেশমী কাপড়ে বাজার ছেয়ে গেছে। ঈশ্বরদাস পাঁচুকে ডেকে নিয়ে বলে :

হ্যাঁ আর এই নতুন যে নকশাটি করছ ওটা আর করো না। বন্ধ করে দাও। ... পড়তাও আসে না, দাম বেশি। ছোটখাট নকশা হলে আজকাল ম্যাকসির জন্য বোনা যায়। ও কাজটা তুমি বন্ধ করে দাও। আর দরকার নেই। (সমরেশ, ২০০৩ : ৬৬১)

বাজারে যা চলবে না, শিল্পীর তা করা চলবে না। এ সঙ্কট পাঁচুর শিল্পীমনে চরম আঘাত করে। ঈশ্বরদাস শিল্প সমঝদার নয়, তার দরকার বাজার ও মুনাফা। তাই পাঁচুর অন্তরাত্মাজাত তাজমহল-অঙ্কিত বালুচরির শেষ নিদর্শনটি মিউজিয়ামে যায়। পাঁচুর সাধনায় চমৎকার শিল্পসৃষ্টিতে গুস্তাদের স্বীকৃতি তাকে একজন প্রকৃত শিল্পী হয়ে ওঠার পথ নির্দেশ করে। কাহিনির শেষপ্রান্তে গুস্তাদ অভয় খানের মৃত্যু স্বাধীন শিল্প ধবংস হওয়ার ইঙ্গিত। কিন্তু শিল্পের ধবংস কখনো সম্ভব নয়; শিল্প বেঁচে থাকে শিল্পীর আত্মবিশ্বাস ও স্বপ্নের মধ্যে। উপন্যাসে তাঁতবিশ্বের উপস্থাপনা তাঁতযন্ত্রের বর্ণনার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে রয়েছে গানের অনন্য সংযোগ আবহ। এমনকি ন্যারেটর প্রত্যক্ষভাবে কাহিনিতে উপস্থিত হননি। চরিত্রের ভাবনাসূত্রেই এগিয়ে চলেছে কাহিনি। বেঁচে থাকা ও শিল্পকে লালন করে তাঁতজীবনের এক গভীর টানাপড়েন উপন্যাসটিতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

৪

সত্তর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা কিছুটা কেটে যায় আশির দশকে এসে। বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ও আন্তর্জাতিক কূটকৌশলের অপছায়া এ সময়কে কলঙ্কিত করে। তবে বিজ্ঞান ও কারিগরি শক্তির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। তবুও সমকালীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে স্থৈর্য তৈরি হয় না। পুরনো ইতিহাস-ঐতিহ্য, রাজনীতির পুনর্মূল্যায়ন, স্বল্প পরিসরে সমকালীনতা এ সময়ের উপন্যাসের চারিত্র্য। প্রফুল্ল রায়ের *আকাশের নীচে মানুষ* (১৯৮১), অনুদাশঙ্কর রায়ের *ক্রান্তদর্শী* (৪খণ্ড, ১৯৮৪-৮৬), দেবেশ রায়ের *বেঁচে বততে থাকা* (১৯৮৪), *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* (১৯৮৯) প্রভৃতি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চালচিহ্ন। এ ছাড়া পুরো দশকজুড়ে কথাশিল্পে ব্যাপ্ত হয় অতীতমুখী টান, যেমন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *সেই সময়* (১৯৮১-৮২), *পূর্ব পশ্চিম, প্রথম আলো*, চিত্তরঞ্জন মাইতির *মরুমুগয়া* (১৯৮৬), সমরেশ বসুর *খণ্ডিতা* (১৯৮৭), আশাপূর্ণা দেবীর *দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে* (১৯৮৮), বারীন্দ্র দাশের *জুলেখা জাহ্নবী* (১৯৮৮) প্রভৃতিতে রয়েছে বাঙালির স্মরণীয় অতীত ও সময়ের পুনর্বিবেচনা। সমরেশ বসু *খণ্ডিতা* উপন্যাসে যাবাবর মেয়েকে বিখণ্ড দেশমাতৃকার প্রতীক করেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আশির দশকে রচনা করেছেন *পূর্ব পশ্চিম*— যার বিবেচ্য দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা। সমরেশ বসুর *যুগ যুগ জীয়ে* (১৯৮১) এক অন্ধকার ইতিহাসের মহা এপিসোড। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *পূর্ব পশ্চিম ছাড়াও সেই সময় ও প্রথম আলো*, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় *অলৌকিক জলযান* (১৩৯৩ ব.), *ঈশ্বরের বাগান* (১৯৮১), *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* (১৯৭১), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় *মানব জমিন* (১৯৮৮), সমরেশ বসু *দেখি নাই ফিরে* (অসমাণ্ড) রচনা করেন। এসব উপন্যাসে রয়েছে অবলুপ্ত ইতিহাসের চিহ্ন। এছাড়াও এ সময়ে মধ্যবিশ্বের অন্তর্লীন অবস্থা, যন্ত্রণা ও পারিবারিক জীবন প্রাধান্য পেয়েছে। সমরেশ বসু পঞ্চাশ দশকের মতো পুনরায় আঞ্চলিকতাকে উপন্যাসের

উপজীব্য করেন। *বাথান, টানা-পোড়েন* প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি প্রান্তিকজনদের সগৌরব প্রতিষ্ঠা দেন।

সংক্ষুব্ধ কাল ও ব্যক্তি সমরেশ বসুর ছায়ায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে যুগ যুগ জীয়ে (১৯৮১) উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে প্রায় এক দশকের ভারতীয় সমাজ-রাজনীতি এতে লক্ষণীয়। বিশালায়তনে রয়েছে নানামাত্রা ও শ্রেণিচরিত্রের আনাগোনা, কাহিনির বহুমুখি শাখা-প্রশাখা, পরিস্থিতির ব্যাপক বিশ্লেষণ। উপন্যাসের আঙ্গিকের দিক থেকে যুগ যুগ জীয়ে প্রথাবদ্ধ নভেলের কাহিনি বা চরিত্র-বিশ্লেষণ কাঠামো সমূলে ভাঙতে পারেনি। একাধিক উপকাহিনির বিস্তৃতি ও ব্যক্তির পুনপুন উপস্থিতিতে কখনও নিরবচ্ছিন্ন গল্পস্বাদ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ব্যক্তি ও রাজনীতি কখনও মিলেমিশে একাকার। উপন্যাসে বিষয়ের জগত ব্যাপক ও বিশাল। দ্বিদিবেশের টানাপড়েন, ভ্রমণ, মনোলৌকিক বিচ্ছুরণ, প্রেম, কামনা, লিবিডো- সর্বাস্তকরণে ব্যক্তিচরিত্রের জটিল-সরল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে রয়েছে ডিটেলের ভঙ্গি। নিয়তির অমোঘ শক্তিতে সংসার ও পৃথিবীতে মানুষ জন্মায় ও ভেসে চলে। মানুষ ভাবে এ তার কর্মফল, আসলে নিয়তি। তবু মানুষ হার মানে না, মানতে চায় না। ভবিষ্যতে আত্মসমর্পণে নয়; জীবনের প্রতি প্রবল অনুরাগ ও আনুগত্যে, সাহসিক সূতীব্র সংগ্রামেই ব্যক্তিমানুষের সার্থকতা। এ উপন্যাসে নিঃসঙ্গ মানুষের একক সংগ্রামে যে-সহনীয়তা তা তুলনারহিত।

নারীর দ্রোহ ও ভালবাসার আখ্যান দশ দিন পরে (১৯৮৩)। এতে ব্যক্তি সমরেশ বসুর রাজনৈতিক ভাবনার প্রতিফলন যেমন ঘটেছে, তেমনি তাঁর চরিত্র-চিত্রণে নতুনত্ব এসেছে। *বাঘিনী* ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপন্যাস দশ দিন পরেতে নারী পুরুষের সহযাত্রী। এ উপন্যাসে প্রচলিত নভেলের ফর্মকে ভাঙা হয়নি; কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। দিবা ও মিনু চরিত্রের দৃঢ়তা ও প্রেমানুভবের মধ্য দিয়ে তা উপলব্ধ। দিবাকর প্রজাপতি উপন্যাসের নায়ক সুখেনের মতোই মাস্তান। তবে সে তার মতো বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত নয়। দিবাকর আদর্শিক মানসিকতা থাকা সত্ত্বেও সঠিক পথের নিশানা খুঁজে পায়নি। সামসময়িক পশ্চিমবঙ্গের যুবসম্প্রদায়ের ছায়া মানুষ সে। পরশ পাথরের স্পর্শে স্বর্ণ যেমন খাঁটি হয়, তেমনি দিবা মিনুকে আবিষ্কার করে হয়েছে অন্য মানুষ। সমরেশ বসু *দশদিন পরে* উপন্যাসে বৃহৎ জীবনের অঙ্গনে পৌঁছাতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক বিভ্রান্তি ও হতাশার বিড়ম্বনা কেটে সর্দর্ক জীবনচেতনায় মানুষ ফিরে আসুক, গভীরভাবে বাঁচুক মুক্ত মানুষের মতো- এ প্রত্যাশার বাণী উপন্যাসে ধ্বনিত।

সমরেশ বসুর বৃত্তিজীবী মানুষের আখ্যান, তা গোপজীবনের সমগ্রতা-সন্ধানী আখ্যান *বাথান* (১৯৮৫)। *গঙ্গা* বা *টানাপোড়েনের* মতো *বাথান* সমরেশ বসুর সূতীক্ষ্ণ ও সুনিপুণ জীবনভাবনার ফসল। উপন্যাসিক সমরেশের ধারাবাহিকতার ফসল এটি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় :

তাঁর অনুভূতি, তাঁর চিন্তন ও সবকিছুর অভিব্যক্তি একান্ত হয়ে উঠল সমরেশসম্ভব রচনা। তথ্যবাহুল্য অতিক্রম করে সমরেশ পৌঁছে গেলেন এক জীবন্ত জীবনের প্রত্যক্ষতায়। এ কথায় কোনও ভুল নেই যে ‘গঙ্গা’, ‘বাথান’, ‘টানাপোড়েন’ এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে একটা নাতিদুর্লভ্য মিল আছে তাদের অন্তর্বর্তী প্রভূত পার্থক্য সত্ত্বেও। সে মিলটা হল বাস্তবের মাটি থেকে পা না তুলে দূর বা দূরের পরে দূর দিগন্তের পারে দৃষ্টিকে মেলে ধরায়। (সরোজ, ২০০২ : ভূমিকাংশ)

আধুনিক সমাজ-পরিবর্তনের মূলে আছে যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ। এটি উপন্যাসে প্রাচলন থাকলেও বুঝতে অসুবিধা নেই যে, সমাজ অভ্যন্তরে কতকগুলো পরিবর্তন ঘটে চলেছে। গোপসম্প্রদায় এখানে নিমিত্ত মাত্র। শিল্প সমাজ নিয়েই গড়ে ওঠে। তার নিজস্ব বিকাশধারা সম্পর্কে বলা যায়, প্রত্যেক যুগের সমাজ-পরিবেশ অনেকটাই তার অর্থনৈতিক বুনিয়েদের ওপর রচিত হয়। সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয় মানুষের আচরণ ও সম্পর্কের ধরনও। উপন্যাসে দু প্রজন্মের ব্যবধানে গদাধর ও যদু দুটো প্রধান চরিত্রের মধ্যদিয়ে সামাজিক পরিবর্তন-রেখা অঙ্কিত। সঙ্গীতের ফল্লধারার প্রবাহ এ উপন্যাসের অনন্যতা। বাঁকার গানে প্রিয়দর্শনের বিরহ-বেদনার ঘনায়মান প্রকাশ; কিন্তু যদুর গানে মানুষের অপ্রাপ্তিজনিত প্রেম ও নিয়তির প্রসঙ্গ সুপরিষ্কৃত। Pastoral elegy বা রাখালিয়া সঙ্গীতের প্রয়োগ উপন্যাসটির কাঠামোতে এনে দিয়েছে অভিনবত্ব। সেই সঙ্গে গোপ যদুর অন্তর্নিহিত সত্তার আবিষ্কারে তা হয়েছে প্রাণবান। Pastoral elegy-র ব্যবহার বাথান উপন্যাসটিতে অনেক বেশি চরিত্র-নিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে, গোপসম্প্রদায়ের জীবন-ঘনিষ্ঠ চিত্রণকেও করেছে সত্যনিষ্ঠ। এভাবেই লোকসংস্কৃতি ও মানবজীবনকে লেখক নস্ট্রীকাঁথার বুননে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। নিতাই বসুর মন্তব্য :

এগুলি শুধু উপন্যাস নয়, এক-একটি প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থগুলিতে নিয়ে আসা হয় কথকতার আমেজ, প্রবহমান জীবনের ধারা, যা মানুষের ইতিহাসের নিরন্তরতায় উত্থান-পতনের মধ্যদিয়ে ভেসে যায়, যা একাধারে ইতিহাস ও লোক সংস্কৃতির অনাবিকৃত দিক। (নিতাই, ১৩৯৪ : ৩০৮)

মধ্যযুগের ইউরোপে একটা সময় ছিল যখন জীবনকে প্রকাশ করার জন্য খ্রিস্টান ও হিব্রু পাঠে রাখালিয়া সাহিত্য ব্যবহার করা হতো। এগুলোতে বেশি গুরুত্ব পেতো তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন। বাঁশি বাজিয়ে তারা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করতো। এর সঙ্গে অবশ্য পরে তাদের যোগাযোগ ঘটে ধর্মের। যেমন তারা জেসাস ক্রাইস্টকে মনে করতো রাখাল আর অন্য সব সাধারণ মানুষ তার অনুসারী। একটি শান্ত প্রাকৃতিক আবহে থাকতো প্রেম, মহৎ জীবন। গোষ্ঠীজীবনের অনুভবও একটি বড় বিষয় ছিল। রাখালিয়া গীতির মধ্যে থাকে প্রেম ও প্রকৃতির গভীরতা অনুভব। জেসাস ক্রাইস্টের স্থলে কৃষ্ণ ভারতীয় রাখালদের গুরুস্থানীয়। তাঁকে তারা সম্মান ও ভক্তির আসনে উঠে তুলে রাখে। প্রকৃতির শান্ত-নির্লিপ্ত ভাব ও প্রেমময় জীবন কৃষ্ণচরিত্রে অন্যতম সত্য। লোকসংস্কৃতির বাস্তব উপকরণের মাধ্যমে সমরেশ তাঁর উপন্যাসে অনালোকিত জীবনকে সামনে এনেছেন। উপন্যাসে ছত্রে ছত্রে বর্ণিত হয়েছে গোপদের

নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উৎসব ও সংস্কারের কথা। উপন্যাসটি গোপসম্প্রদায়ের সম্পূর্ণায়তন জীবনচিত্রকে উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে।

৫

র্যাল্ফ ফক্স তাঁর উপন্যাস ও জনগণ গ্রন্থে বলেন :

উপন্যাস হলো মানুষের জীবনের গদ্য। উপন্যাস হলো মানুষকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার এবং তাকে প্রকাশ করার প্রথম নান্দনিক প্রচেষ্টা।...অন্যান্য শিল্প-মাধ্যম থেকে উপন্যাসের তফাৎ এই যে, উপন্যাস যা কিছু অপ্রকাশিত, তাকে প্রকাশ করতে পারে। (র্যাল্ফ, ২০০৫ : ১৮)

উপন্যাস মানুষের জীবন প্রকাশের বিস্তৃততম সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যমও। জীবনের নানামাত্রিক বিষয় ও ভঙ্গির কারণে তা স্বতন্ত্র শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত। ঘটনার উপস্থাপনা, প্লটবিন্যাস, কথনের বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গি, সর্বোপরি নির্মাণের কারিগরি ঔপন্যাসিককে করে তোলে প্রাতিষিক। উপন্যাসকারদের গল্পগুলোতে থাকে মানুষ ও কালের সচেতন বিন্যাস। উপন্যাসের সারবস্তুকে তা সত্য করে তোলে। বিকাশমান চরিত্রগুলো নানা অভিব্যক্তিতে বাঙময় হয়ে ওঠে উপন্যাসের পটভূমিতে। ঔপন্যাসিকের জীবন ও সমাজপার্শ্বের গভীরতায় সুচিহ্নিত হয় চরিত্রসমূহের বাস্তববিশ্ব। বাস্তব ও কল্পনার দ্বৈত প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে প্লটনির্ভর আখ্যান। সমরেশ বসুর উপন্যাস বাস্তব ঘটনা-উপস্থাপনের প্রক্রিয়াজাত হয়ে জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সামগ্রিক জীবনকে তুলে আনতে ঔপন্যাসিককে হতে হয় জীবনের সৎ ও বিশ্বস্ত অনুকারক। জীবনের কোনো বাঁধাধরা রূপ নেই কিন্তু জীবন-প্রকাশে দন্দ-আবেগ-সমস্যা উপস্থাপনায় রূপের সংহতি বাঞ্ছনীয়। হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় :

উপন্যাস যখন একটি এক বিশিষ্ট সাহিত্য শাখা- বিষয়ের ব্যাপ্তি যতই অনির্দিষ্ট হোক, তার শিল্পরূপ সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত, এবং সেই শিল্পরূপ বিচারের মানদণ্ডও সুনির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। (হীরেন, ১৯৮২ : ৫)

ব্যক্তির চৈতন্য আর সমষ্টির বোধের দন্দ-জটিল সংঘর্ষে কথাশিল্প জন্মালাভ করে। মহাকাব্যের রূপে মানুষের জীবন আর উপস্থাপনযোগ্য হয়ে ওঠে না। তবে একজন ঔপন্যাসিকের পক্ষে সবচেয়ে জটিল কাজ বিচিত্র ও অসংলগ্ন উপাদানকে সমন্বিত করা। কাহিনির গুরুত্ব থাকলেও তা কাহিনিসর্বস্ব হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ই.এম. ফরস্টার বলেছেন, ‘সাহিত্য কাঠামোর এ হচ্ছে সর্বনিম্ন ও সরলতম স্তর। তবুও এই কাহিনীই হচ্ছে উপন্যাস নামে পরিচিত অত্যন্ত জটিল এক সাহিত্য নির্মিতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বিবেচ্য উপাদান।’ (ই. এম. ২০০০ : ১৪১) এ মাধ্যমটি মানুষের জীবন ও সমাজকে সরাসরি মূর্ত করে। *The Bengali novel* গ্রন্থে হুমায়ুন কবীর বলেন : ‘One essential characteristic of the novel is that it must have both vision and design. Rooted in society, the novel reflects the state of development in social consciousness more faithfully than any other form of art.’ (Humayun, 1968 : 2)

লেখক হিসেবে সমরেশ বসু অত্যন্ত সমাজনিষ্ঠ। অভিজ্ঞতার পূর্ণাঙ্গ বিস্তার তাঁর শিল্পসত্য প্রকাশের সহায়ক। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ঘাটতিকে কখনোই ভাষিক কাঠিন্যে নিমজ্জিত করেননি। স্বাভাবিক জীবনের ঘটনা বা যাপিত বাস্তবতার স্বরূপ তাঁর উপন্যাসের চরিত্র। কখনও কখনও ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি উপন্যাসে সংক্রামিত হয়েছে। এতে শিল্পগুণ খর্ব হয়েছে। তবে তা একেবারেই দীপ্তিহীন হয়ে পড়েনি। ব্যক্তি অভিজ্ঞতাই যখন মানুষের প্রতি পরম মমতায় প্রকাশিত হয়েছে, তখন তাঁর লেখনি হয়ে উঠেছে শিল্পিত। প্লটের যথাযথ বিন্যাস, কাহিনি উপস্থাপন, চরিত্রের লীলা-বৈচিত্র্যের সূত্র আবিষ্কার ও প্রাঞ্জল ভাষার মাধ্যমে সমরেশ বসুর উপন্যাসের গ্রন্থনা। বীরেন্দ্র দত্তের ভাষায় :

পূর্বসূরী এবং সমকালীন-সমস্ত লেখকদের থেকে সমরেশ বসু উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও প্রকরণে নতুন এক বাস্তবতায় যে শিল্প উপচার উপহার দিয়েছেন তাঁর উপন্যাস পরিক্রমার সূত্রে তা প্রমাণ করে, তিনি বাংলা উপন্যাসের ধারায় লক্ষণীয় পালাবদলের প্রথম এবং প্রধান নায়ক। (বীরেন্দ্র, ১৯৯১ : ৭২৮)

উপন্যাস বর্ণনাত্মক শিল্প; এর জন্য প্রয়োজন গদ্যভাষা। এই গদ্যকে যথার্থ অর্থেই নিপুণ প্রকাশক হয়ে উঠতে হয়। লেখকের নিজস্ব ন্যারেশন, কথকতার ভঙ্গি ও সংলাপ উচ্চারণে সুচারুতার প্রয়োজন হয়। ভাষার মাধ্যমে উপন্যাসিক মানুষ ও তার সামগ্রিক বস্তুজগতের ছবি অঙ্কন করেন। ফলে ভাষা উপন্যাস নিরপেক্ষ নয়; বরং উপন্যাসের কল্পলোকে দৃশ্যগ্রাহ্য বিশ্বস্ত জগতের নির্মাতা। শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রক্তের স্রোত যেমন প্রাণকে সঞ্জীবিত রাখে, তেমনি উপন্যাসের সর্বশরীরে প্রবেশ করে ভাষা। এ শিল্পকে অসংখ্য মানুষ সমাজ ও সভ্যতার সারগ্রাহী হতে হয়। উপন্যাসিক তাঁর ভাষাকাঠামো সংযোগে পাঠকের সঙ্গে সর্বদাই ‘কম্যুনিকেশন’ রক্ষা করে চলে। আশিসকুমার দে ভাষাকেই উপন্যাসের শৈলীর প্রথম বিচার্য উপাদান বলে মনে করেন। তাঁর বক্তব্য :

সমস্যা, চরিত্র, বিষয়, বর্ণনা, বাস্তবতা, সংলাপ সবকিছুই ফুটে ওঠে ভাষায়। ভাষার সাহায্যে লেখক যে অসাধারণ উপন্যাস প্রতিমা তৈরি করেন, তার দুর্বলতার জন্য মহৎ বিষয়ও কালের গর্ভে লোপ পায়। গঠনের বিচার উপন্যাসের অনেক বৈশিষ্ট্য এবং উপন্যাসিকের মানসিকতাকে যেমন প্রমাণ করে, তেমনি উপন্যাসের ভাষা আলোচনা না করলে এই শৈলীবিচার অসম্পূর্ণ থাকে। (আশিসকুমার, ১৯৮৩ : ৭)

সমরেশ বসু জটিল দুরূহ শব্দ-সংস্থাপন করতে চাননি। সরল বাক-নির্মিত ও সহজাত জীবনের প্রকাশক তিনি। ভাবনার গভীরতা তাঁর উপন্যাসে লক্ষণীয় কিন্তু মানুষের অন্তরাভিব্যক্তি প্রকাশে তা দূরত্ববাচক গাভীর্য তৈরি করে না। নায়ক-নায়িকাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষারূপ নির্মিতিতেও তিনি প্রাতিশ্বিকতার পরিচয় দেন। তাঁর উপন্যাসের কুশীলবদের থাকে নিজ নিজ শব্দভাণ্ডার ও ভাষাবৈচিত্র্য। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে তা মানবজীবনের বহুমাত্রিক বাস্তবতার প্রকাশক। বাখতিনের ভাবনায় : ‘The meaning of the word is determined entirely by its

content, In fact, there are as many meaning of a word as there are contents of its image.’ (Simon, <https://edisciplinas.usp.br> : 123) ভাষা জীবনের ছবি ঐকে চলে, বিচিত্র শব্দযোগে সেসব অনুভূতি সাহিত্যিক তাঁর রচনায় প্রবেশ করান। শব্দ হয়ে ওঠে প্রকাশ মাধ্যমের একেকটি প্রতীক বা সঙ্কেত। সমরেশ বসু এই সঙ্কেতিকতা লাভ করেছেন আন্তরিক তাগিদ থেকে। তাঁর কথকতায় জীবন সবসময় সরলরেখা নয় বরং সেখানে আছে তীর্যক দর্শন ও তীক্ষ্ণ পরিহাস। দ্রোহ-বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অনাস্বাদিত জগতে সে জীবনের বিচরণ। তা কল্লোলিত হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত নদীশ্রোতের মতো। সমরেশের জীবন ও সাহিত্যে আছে সমরূপতা, একই আবেগের চোরাশ্রোত। ভাষার শ্রোতের টানেই প্লটকে তিনি সুসংবদ্ধ করে গড়ে তোলেন, আখ্যান পরিবেশনের একঘেয়েমি দূর করার জন্য সংলাপের আশ্রয় নেন। উপন্যাস বাস্তবজীবনের মায়াকে সাকার করে তোলে। এই মায়াকে সত্য করে তোলার প্রধান হাতিয়ার ‘শব্দ’। কাজেই ভাষায় রয়েছে বিশেষ ইঙ্গিতবর্মিতা, যা নির্দিষ্ট জীবন ও সংস্কৃতি প্রকাশে উপন্যাসিকের সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তোলে। উপন্যাস তাই আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগে শক্তিমান হয়ে ওঠে। আঞ্চলিকতার প্রয়োগ সমরেশ-রচনাকে জীবনঘনিষ্ঠ করে তোলে। আঞ্চলিক জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততায় এখানে লোকজ গানের অনুষ্ণ ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, গভীর জঙ্গলের নিবিড় ছায়ায় উদাস হয়ে রুহিতনের প্রণয়ী টেপড়ি যে-গান গায়, তাতে আবেগমখিত টানাপড়েন ধরা পড়ে :

শোন বাহে দেওয়ানীর ছাওয়া।

মুই কমবখতি কপাল পোড়া ॥

শুগর হয়্যা মাইর খাওয়াইলেন মোকে।

মাইরলে গোলাম দুপুর বেলা

মাইরলে গোলাম মাটিত ফ্যালায়া ॥ (সমরেশ, ২০০২ : ২০৬)

আঞ্চলিক একটি গানের ভাষায় প্রায়ই ব্যক্ত হয় রুহিতনের মনের অভিব্যক্তি— ‘উত্তরে উনাইল ম্যাঘ। পচ্চিমে বরষিল গ! ভিজি গেল গাবানি কাপড়।’ (২০০২ : ২০৫) উপন্যাসিক চরিত্রের জীবনদর্শনের ঘনত্ব প্রকাশে বারবার তা তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের ভাষাভঙ্গিকে ধারণ করে গড়ে ওঠে টানা-পোড়েন উপন্যাসের তাঁতিজীবন কাহিনি। এখানেও আঞ্চলিক উপভাষা চরিত্রের পূর্ণ গতিবিধি নির্ণয়ে সহায়তা করে। উপন্যাসের শৈলী গ্রন্থমতে, ‘যেহেতু লেখকের চরিত্ররা আদর্শ চলিত গদ্যের জগতের অধিবাসী নয়, তাই উপভাষাও চরিত্রগুলির বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলে।’ শুধু বিষয়বস্তু সংযোজন নয়, বাস্তবতার নিখুঁত উপস্থাপনার জন্য সমরেশ বসু তাঁতিদের মুখের ভাষা ব্যবহার করেন। তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠার ফলেই বৃত্তিগত নৈপুণ্যের আধারে জীবনের অখণ্ড মূর্তি তৈরি হয়। টানা-পোড়েনে ভাষা ব্যবহারে সার্থকতার বিষয়টি আবু সয়ীদ আইয়ুব একটি ব্যক্তিগত পত্রে সমরেশ বসুকে লিখেছিলেন, ‘শারদীয়া ‘দেশ’-এ আপনার উপন্যাসখানি [‘টানা-পোড়েন’] পড়ে আমি অভিভূত হলাম। স্পষ্টতই আপনাকে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে, বিষ্ণুপুর অঞ্চলের

তাঁতি মেয়ে-পুরুষের মুখের ভাষা আয়ত্ত করার জন্য, তাদের মনের কক্ষে প্রবেশ করার জন্য। সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে এই পরিশ্রম। বর্ণযোজনার দিক থেকে এমন নিখুঁত উপন্যাস আমি কমই পড়েছি।’ লেখকের নিজের বক্তব্য, ‘আমি চেষ্টা করেছি, বিষ্মপূরের তাঁত শিল্পীদের জীবনযাপনের ছবি, মুখের ভাষা ধ্যান-ধারণাকে রূপ দিতে।’ (হিতেন্দ্র, ১৯৯৫ : ৮) অশিক্ষিত, অসংস্কৃত, অমার্জিত মানুষগুলোর হাসি-কান্না-আনন্দ-বেদনায় এ ভাষা প্রয়োগেই তাদের জীবন-প্রকাশকে পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে। বিষ্মপূর-বাঁকুড়া অঞ্চল নয় শুধু, যে পটভূমিতেই সমরেশ-উপন্যাসের কাহিনি বিধৃত সেই অঞ্চলের ভাষাকঠামোই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। বলা ভালো উপন্যাসকে যথাসম্ভব বাস্তব করার জন্যই তিনি আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্যকে ধারণ করেছেন।

৬

সমরেশ বসুর গল্পের আঙিনায়ও উপন্যাসের মতো বিচিত্র মানুষের কোলাহলপূর্ণ। শহরতলী কিংবা কিঞ্চিৎ গ্রামীণ পটভূমিজাত গল্পের চরিত্রসমূহ শ্রেণিবিশেষে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্রেন্দময় পরিবেশের বাসিন্দা। নিদারুণ অর্থকষ্টে ঘিন ঘিনে বস্তিতে বাস করে কেউ কেউ। ভিখারি, ছিঁচকে চোর, হকার এমনকি বেশ্যার দালাল, নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ, বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষে পূর্ণ তাঁর গল্পজগত। তা যেন অগণিত মানুষের সংগ্রামী জীবনশ্রোত ও সংক্ষোভের বিচিত্র সংবেদ। মার্ক্সবাদে দীক্ষিত সমরেশ বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিকশ্রেণিকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলেন। শ্রমিকজীবনের বাস্তব-অভিজ্ঞতা, জগদল-আতঁপূরের শ্রমিকবস্তি ও শিল্পাঞ্চলের অনুভব তাঁকে নিয়ে গেছে শ্রমজীবী মানুষের কাছে। উত্তরকালে শ্রমজীবী মানুষ নিয়ে তাঁর অসংখ্য কালজয়ী গল্প লেখার রসদ এখানেই নিহিত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষের আদিমতম সংগ্রাম ক্ষুধার বিরুদ্ধে। প্রকৃতি নয়, মানুষই যন্ত্রসভ্যতায় জীবনের নিয়ন্ত্রক। ‘রং’ গল্পের শ্রমিক-মালিক সংঘট্ট বিরাট সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। শ্রমিক-জাগরণের পাশাপাশি সত্য তাদের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতাও। কারখানার অফিসাররা তাই বলার সাহস পায়—‘শ্রমিকদের অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে এনে লাভ নেই। লোকগুলি চিরদিনই ক্যালাস।’ (সমরেশ, ২০০৫ : ৬৩৬-৬৩৭)

গল্পকার বাস্তব-অভিজ্ঞতায় জানেন—মরীচিকার আশাতেই প্রান্তিশূন্য শ্রমিকরা বেঁচে থাকে। অন্যদিকে সমরেশ প্রচুর ভিন্নস্বাদের গল্প রচনা করেন। প্রেমের বিচিত্র গতি ও রূপ প্রত্যক্ষ করে তিনি মানবপ্রেমের জটিলতা ও টানাপোড়েন তুলে ধরেছেন। মনের তীক্ষ্ণ জটিলতায় উঠে আসে অবদমিত আকাঙ্ক্ষা। যেমন, ‘উরাতীয়া’ গল্পে মানবমন জটিল গূঢ়রহস্যময়। বস্তুত যৌনযন্ত্রণার কথা সমরেশ-সাহিত্যে বারবারই এসেছে। তাঁর গল্পে নারী ও পুরুষের কামনা জৈবজীবনের স্মারক, বাসনার চূড়ান্ত নির্দেশক। ‘শানা বাউড়ীর কথকতা’ গল্পেও সমরেশ তুলে ধরেন আদিবাসী জীবন। ‘কালকূট’ পর্বের ‘বনের সঙ্গে খেলা’ কিংবা ‘মন চল বনে’ ইত্যাদি রচনায় তাদের জীবনের কথকতা বিস্তৃতভাবে ধ্বনিত হয়েছে। এছাড়াও গল্পে সাঁওতাল, কুমী, মাহাতো প্রভৃতি শ্রেণির

মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়। স্বাধীন দেশে শিক্ষার সুযোগ, বিচারব্যবস্থার সততা সব মানুষের কাম্য। কিন্তু শানা বাউড়ীরা এসব থেকে বঞ্চিত। চিরাভ্যস্ত অন্ধকারের অরণ্যে বিশাল দৈত্যের মতো রাজমহলের স্থবির পাহাড় আর বিশাল বিশাল শালবনের ছড়াছড়ি। সেই ক্যানভাসকে পেছনে রেখে তারা আজীবনই জীবনযাপনের চড়াই-উৎরাই পেরোয়। আরণ্যিক ঘনঘটার মধ্য দিয়ে মানবচরিত্র অবলোকন সমরেশের প্রধানতম অভিপ্রায়।

কৃষক শ্রেণির কথা সমরেশ বসুর গল্পে খুবই অপ্রতুল। কৃষিভিত্তিক জীবনের অভিজ্ঞতার অভাবই হয়তো এর জন্য দায়ি। শিল্পপুঁজি সামন্তবাদী সমাজ-সংগঠন ভেঙে দেয়। সামান্য ভূমিমালিক কৃষক জমি ছেড়ে শহরে আশ্রয় নেয়। ভূমিহীন উদ্বাস্তুতে পরিণত হবার গল্প ‘উৎপাত’ ও ‘আবর্ত’। ‘আবর্ত’ গল্পে রয়েছে দরিদ্র চাষির জমি হারানো সর্বস্বান্ত পরিস্থিতি এবং শহরে কর্ম-অন্বেষণের সঙ্কট। স্বাধীন চাষি বাদশা জোতদার মামুদের ঋণের জালে জড়ায়। সে ক্রমশ জমি হারাতে থাকে। এভাবেই শহুরে পুঁজি বিকশিত হয়। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার মতোই মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার উঠতি-পড়তি। সমরেশ গঙ্গাতীরে জড়ো হওয়া খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অন্তঃশ্রোত তুলে ধরেন ‘জোয়ার ভাটা’ গল্পে। ‘জলসা’ গল্পে তাঁর সমাজ-সচেতন রাজনৈতিক জীবনবীক্ষা প্রকাশিত। শ্রমিকবস্তির পাশে কোম্পানি লাইনের সামনে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। সেখানে গান্ধীজি, নেতাজি ও জওহরলালের মূর্তি বসানো। চট্টের পর্দা সরিয়ে যে মঞ্চটা প্রত্যক্ষগোচর হয়, তার মধ্যেই গুম হয়ে বসে থাকে শ্রমিক হাফিজের জীবন :

লেড়কাটার বিমারি আজ তিনমাস থেকে। ডাগদার হাকিম ঘাঁটা ঘাঁটি করল নিয়ে অনেকদিন। ...

কাজ থেকে ফিরে, রোজানা একই দৃশ্য ঘরের মধ্যে। তবীয়ত চায়না আর এ সব দুখ তখলিফ

সইতে। ... দাওয়াইয়ের পয়সা নেই। (সমরেশ, ১৯৯৭ : ৪৫৭)

সমরেশ বসুর গল্পের বড় অংশজুড়ে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের অবস্থান। পকেটমার, ছিনতাইকারী, ভিখারি এমনকি বেশ্যার দালাল সবাই ভিড় করে তাঁর গল্পে। গল্পে সমরেশ জীবিকা-আহরণের কন্টকিত গলিপথের সন্ধান দেন। লুম্পেন প্রলেতারিয়েতকে নিবিড় অভিনিবেশে তুলে ধরেন তিনি। ‘খিঁচা কবলা সমাচার’, ‘ফকির’, ‘এস্মাল্গার’, ‘গুণিন’, ‘পঞ্চগোয়েত’, ‘মরেছে প্যালগা ফরসা’, ‘শুভবিবাহ’, ‘প্রাণ-পিপাসা’, ‘মানুষ রতন’ প্রভৃতি শিল্পসফলতার প্রমাণ দেয়। একজন ভিক্ষকের মধ্যে তিনি সর্বহারা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন। ‘ফকির’ গল্পে কলকাতার পেস্তাবাজারে কুলি হয়ে এই ফকির ঘুরে বেড়ায়, ডালহৌসি স্কোয়ারে ভিখিরি বেশে বিচরণ করে, বর্ধমানের রহিমপুরের হাটে গরুর গাড়ির তলায় শুয়ে থাকে। সে নিজের নাম ‘ফকির’ বলে দাবি করে। ক্ষুধাতৃষ্ণির জন্য সে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষেকরে না, স্পষ্ট দাবি জানায়। তাকেই আবার দেখা যায় শ্রমিক-মিছিলে ‘ইনক্লাব জিন্দাবাদ’ ধ্বনি উচ্চারণ করতে। গল্পের শেষে যখন সে বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়, তখন মনে হয় এই সর্বহারা ফকির ‘একটি

অখণ্ড জাতির প্রতীক।’ (সমরেশ, ২০০৫ : ৬৯১) সমরেশ তীব্র সংবেদনশীল শিল্পী। এই সংবেদনার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় শিশুকিশোর চরিত্র। এরকমই একটি গল্প ‘মরেছে প্যালগা ফরসা’। এ গল্পে সাড়ম্বরে আন্তর্জাতিক শিশুদিবস পালিত হয়। তার উল্টোপিঠে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভিখারি বালক। তার মৃতদেহ বহন করে নিয়ে চলে ভিখারি বন্ধুর দল। সমরেশ বসুর একটি প্রিয় বিষয় শিশুকিশোর। নিষ্পেষিত লাঞ্ছিত ও অপমানিত শিশুকিশোরদের তুলে আনেন তিনি। ‘নিষিদ্ধ ছিদ্র’, ‘পেলে লেগে যা’ এমনকি ‘লড়াই’ গল্পে অপাংক্তেয় সাধারণের আমৃত্যু লড়াইকে প্রকাশ করেন সমরেশ। সমাজ-অর্থনীতির যাতায় পিষ্ট ভূমিহীন উদ্বাস্তরা সমরেশ-সাহিত্যের পরতে পরতে। ‘মানুষ রতন’, ‘শুভ বিবাহ’, ‘আর একটি মানুষ’ গল্পে এদের জীবনের পীড়িত অবস্থান তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘উৎপাত’ একটি ভিন্নতর উপস্থাপনা। ক্ষুধাক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ আত্মসম্মান নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। সমরেশ গল্পের বহুরূপী মানুষের একজন সুচাঁদ। বহুরূপী সঙ-জীবনের দুঃখময় কথকতা ‘সুচাঁদের বারমাস্যা’। মামুদ ফকিরের কৃষ্ণযাত্রার দলে সঙের ছলাকলা আয়ত্ব করেছিল সুচাঁদ। বিভিন্ন স্থানে বহুরূপী আবরণের আড়ালে কঠিন জীবনসংগ্রামের খেলা। মানুষ বিচিত্র আর অদ্ভুত তাদের মনস্তত্ত্ব। ‘অকাল বৃষ্টি’ গল্পের চরিত্র দুটো সমাজচ্যুত। শাসনচারী মানুষ ভূতেশ হালদার ও সিধু ডোম। স্ত্রীপুত্র-সংসারহীন জীবনে ভূতেশ হালদারের কাজ মৃতুর রেজিস্ট্রার রাখা :

রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে চিতায় কাঠ সাজায় সে, মরা তোলার আগে শত শোক ও আপত্তি সত্ত্বেও মরার গায়ের জামা খুলে নেওয়ার চেষ্টা করে, মরা মেয়ে মানুষের গায়ের জামা থাকলে চেষ্টা করে তা নেওয়ার। (সমরেশ, ১৯৯৭ : ৬০৯)

‘এসমাল্গার’ গল্পের গৌরাস্ত বা গোরা তেরো বছরের কিশোর। লাঞ্ছিত-অবমানিত কিশোরটি পেশায় স্মাগলার বা বেআইনি চালের বাহক। সবরকম বিপদ ও ঝুঁকি উপেক্ষা করে গোরা চালের চোরাচালান করে। তার ওপর নির্ভরশীল পুরো পরিবার। ট্রেনে চাল স্মাগলিং করতে গেলে পুলিশ, মোবাইল কোর্ট ও সিভিল সাপ্লাইয়ের চোখ ফাঁকি দিতে হয়, কখনো ভেট দিতে হয়। নিয়ত ক্ষুণ্ণবৃত্তির সংগ্রামে পর্যুদস্তদের মধ্যে নারীও সমরেশ-গল্পের অন্যতম বিষয়। ক্ষুধার সংগ্রামে অংশীদার নারীজীবনের লাঞ্ছনা ও কষ্টের চিত্র ‘পশারিণী’। এ গল্পে পুরুষ হকার নয়, পুষ্প নামক মেয়ে হকারের জীবন অঙ্কিত। হকারদের দ্বন্দ্ব-ঈর্ষা-লোভ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে সমরেশ নারীর কঠিন জীবনসংগ্রাম তুলে ধরেন। সমরেশের নারীচরিত্রে রয়েছে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, তুমুল সংগ্রাম, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা। ‘শুভ্রা-সন্ধ্যা সংবাদ’ গল্পে সমাজ ও পরিবারের অসহযোগিতা সন্ধ্যাকে বানায় দেহ-ব্যবসায়ী। চটকল কেরানির সন্তান শুভ্রা শোচনীয় আর্থিক অবস্থায় পতিত। দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যদিয়ে সে সংগ্রামী অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। অসমবিন্যস্ত সমাজ-রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে ব্যঙ্গ করে শুভ্রা :

বাবাকে সেজন্য কখনও দোষ দিতে পারি না। দোষ যদি দিতেই হয়, তবে দোষের বদলে অভিশাপই দেব এই বর্তমান সমাজ আর রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে। ধিক্কার দেব আমাদের সরকারী

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোকে। এইসব ব্যবস্থাই গরীবকে আরো গরীব করেছে, বড় লোকদের আরও বেশি ভরে তুলেছে। (সমরেশ, ২০০৯ : ৭২৬)

শুভ্রা অবদমিত নারী। গণিকাবৃত্তি পরিহার করে সে সমাজ-বদলে প্রতিস্পর্ধী। এই চরিত্র তৈরিতে লেখক ব্যবহার করেন আত্মকথনরীতি। টেকনিকের নতুনত্বে উঠে আসে সামাজিক সত্যদর্শন। সমরেশ তাঁর পাত্রপাত্রীকে রোমান্টিক বাতাবরণ দেননি। শুধু নিম্নবিত্ত নয়, এভাবেই এসেছে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের ফাঁপা অন্তঃসারশূন্যতা। তবে উপন্যাসের মতোই নিম্নশ্রেণির মানুষের উপস্থাপনায়, তাদের অনুভূতি-রূপায়ণে সমরেশ অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি। বস্তুত তিনি অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শনের গভীর প্রত্যয়ে সত্তার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হন। চরিত্রের মুখের ভাষায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন স্বকাল ও মানুষের অদ্বৈত সংগ্রামশিল্প। গ্রামসমাজের ভাঙন, শহরে পদার্পণ, মানুষের নিরন্তর ভাঙাগড়াতাঁর গল্পে অনন্য হয়ে ওঠে।

৭

‘আমার বাড়ির কাছে আরশীনগর সেথা এক পড়শী বসত করে। আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।’... (আবুল, ২০০৮ : ৪৯৮) কালকূটের আত্মপরিচয় কী? তিনি ‘আইডেন্টিফিকেশন’ খোঁজেন নিজের অন্তরাত্মায়। ব্যক্তি সমরেশের ভেতরে অন্য একটি আধ্যাত্মিক ও অচেনা সত্তা লুকানো। সীমাহীন পৃথিবীর অজানা, অচেনা পথ এবং রহস্যময় মানবপ্রাণের শত অলিগলি সন্ধান কালকূটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কালকূট সম্পর্কে বলেন : ‘আমার ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশে’— কালকূট নামক ব্যক্তিটির প্রাণের কথাও তাই, ‘সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া’। (সরোজ, ১৯৭৯ : ভূমিকাংশ) এ আকাক্ষা তাঁর জীবনকে বিচিত্র পথের সারথি করে। সমরেশ বসুর ভিন্নতর সত্তা ‘কালকূট’ তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তারই সম্প্রসারিত রূপ। কালকূটের আরেক অর্থ ‘প্রাণঘাতি বিষ’। এই বিষে জর্জরিত তিনি সন্ধান করেন কর্কশতা ছেড়ে সুন্দরতম পৃথিবী। যুক্তিবাদী মানুষের ভেতরে থাকে কল্পনাশীল মানুষ। কালকূটের ভ্রমণ, তত্ত্বজ্ঞান, বাউলিয়ানা, পৌরাণিকতা সবকিছুর মধ্যে তা স্পষ্ট। কালকূট ছদ্মরূপে সম্ভব হয়ে ওঠে অব্যক্ত সৌন্দর্য আবিষ্কার। নিরেট বস্তুতন্ত্র, নেতি-শূন্যতা ও সমাজ-সচেতন মানুষের ছায়া সেখানে ক্রমশ অপসূরমান। নিস্পৃহ ভাষার পরিবর্তে সেখানে অন্তর-আত্মার অমোঘ ছায়া। কাব্য ও ভাবময়তার সুধা ছড়ানো তার পথে পথে। তবে ভিন্নতা নিয়েও কালকূট ও সমরেশ বসু একই শিল্পীর অভিন্ন রূপ। সেটি তাঁর মানুষ প্রত্যক্ষণে, অন্তর্জগতের বিন্যাসে। কালকূটের ভ্রমণকাহিনি তাই ভ্রমণ হয়ে থাকে না শুধু, আত্মার প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে। কালকূট-রচনায় কালের বিস্তার ভারতবর্ষের বিচিত্র পটভূমিকায়, মানবদর্শনে। কাটকূট-সমরেশের শিল্পযাত্রায় অনন্য স্বাতন্ত্র্য। কালকূট দেখবেন শুনবেন কিন্তু কাউকে জড়াবেন না। ধ্যান জ্ঞান প্রেম নামক রচনায় তিনি বলেছেন :

ধূলা আমার পায়ে। আমার গায়ে। চেনা পথ ধরেই এলাম। অথচ যেন এক অচেনা অঙ্গনে। ...মন এক বস্তু। না দেখা, অধরা। অথচ সেই মনকেই ঠিক চিনি কি না, তা-ই আজ বুঝে উঠতে পারিনি। তার যে কত রকমের গতাগতি, কে বলবে। সে বলে, অচেনা। তবু না কি চেনা চেনা লাগে। এ কি নিজের সঙ্গে নিজেরই রহস্য? (কালকূট, ১৯৮৬ : ৭)

কালকূট-রচনা যুগের প্রতিচ্ছায়া রেখেও আত্মমুখী; যেমন অমৃতকুন্ডের সন্ধানে, বনের সঙ্গে খেলা, শাম্শ। কালকূটে রয়েছে অনন্ত জিজ্ঞাসা, রোমান্টিক আবেগ, আধ্যাত্মিক অলৌকিক চেতনা, প্রকাশ ব্যাকুলতা। ঠিক এ কারণেই পরিবর্তিত হয়ে যায় নির্মাণকৌশল, ভাষা, চিত্রপট, অভিজ্ঞতা, জনপদ, মানুষ সবকিছু। ঘর ছেড়ে পথের টানে কালের পরিসীমাকে কালকূট অনন্তে বাঁধেন। সমকাল ছেড়ে অতীত, ইতিহাস, পুরাণ ও মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত তিনি চলে যান। শাম্শ (১৯৭৮), প্রাচ্যেতস (১৯৮৩), পৃথা (১৯৮৬) বা জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য (১৯৮৭) পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে শেকড় ও ঐতিহ্যের দিকে নিয়ে যায়। স্বদেশের বিশাল ভূগোল-পরিভ্রমণে তিনি মানুষের মেলায় বিচিত্র মানব সন্ধান করেন। কখনও তিনি বিচ্ছিন্ন বনবাসে অদেখা মানুষের অচেনা জগৎ ও প্রকৃতি আবিষ্কার করেন। লেখক-বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি :

অনেক সময় মনে হয় কালকূট ও সমরেশ যেন পরস্পরের পরিপূরক। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে যে অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে কালকূট হিসেবে তাকেই সে বিবৃত করেছে। আবার সেই অভিজ্ঞতাকে কল্পনার জারক রসে মিশিয়ে জিজ্ঞাসায়, শাণিত করে উপন্যাসে পরিণত করেছে যে ‘সমরেশ’, সে লোক দু’ভাগে বিভক্ত ছিল। এক সমরেশ সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন, আরেকজন হল বাউল। সামাজিক সমরেশ যে কত লোকের দায়িত্ব নিল বলে শেষ করা যাবে না। এটা কালকূট করেনি। সে মাঝে মাঝেই পালাতে চাইত- সব ফেলে, সব ছেড়ে। (সরোজ, ১৯৮২ : ১৯)

এভাবেই দেশকে, দেশের মানুষকে তিনি খুঁজে বেরিয়েছেন সর্বত্র। কালকূট ‘কোথায় পাবো তারে’ বলে বেরিয়ে পড়েন, ‘খুঁজে ফিরি সেই মানুষ’ বলে বিচিত্র স্থানে গমন করেন। তিনি গ্রাম শহর নদী প্রান্তরে গহন সম্ভরণে মনের মানুষটিকে ধরা দেন। ‘কালকূট’ রচনায় ঘটনার ঘনঘটা, গল্পে এমন চোরাটান, অসহায়ের মতো তাতে আত্মসমর্পণ করা ব্যতিরেকে উপায় নেই। অঘটন-ঘটনকে আত্মস্থ করতে করতেই এসে যায় নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ। ভাষার এক অনন্য কার্যমতি অজানা কাহিনীর দেশে নিয়ে যায়। গল্পকথকের আসরে পাঠক বসে থাকে গুটিসুটি মেরে। কালকূটের ভাষা মায়াময় মৃগ, ধাবমান পাঠক ভুলে যায় কোথায় তার নিশানা। অমৃত কুন্ডের সন্ধানে (১৯৫৪), হারিয়ে সেই মানুষে (১৯৭৫), পিঞ্জরে অচিন পাখি (১৯৮২), মনভাসির টানে (১৯৮০)- এসব রচনাই তার প্রমাণপত্র। ‘রচনাগুলো প্রচলিত অর্থে ট্রাভেলগ্ বা ভ্রমণকাহিনি নয়।’ (অপূর্বকুমার, ১৪০৮ : ১৪৩) কালকূট ভ্রমণপিয়াসী কিন্তু ভ্রমণবীর বিশ্বজয়ী থ্রিলার নায়কে পরিগণিত হতে চাননি। ‘কালকূট’ রচনাগুলোকে নানাশ্রেণিতে বিভাজন করা যায়। রচনারীতি, মনের কথার গভীরতা ও গূঢ়তা তাঁর

রচনায় স্বাদের বৈচিত্র্য এনেছে। তীর্থভ্রমণ, তত্ত্ব ও ধর্মের গভীর অনুশীলন, জনপদ ও অরণ্য-ভ্রমণে বিচিত্র আঙ্গিকে মানুষকে জানার ও ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি। কালকূট রচনা সমগ্রের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদকের বক্তব্য :

ব্যক্তি কালকূটকে যারা জানেন, তাঁদের কাছে পুরনো লাগবে, যাঁরা জানেন না, তাঁরা শুনে মজা পাবেন, এই ব্যক্তি তিন মাস চার মাস অন্তর অন্তরই এই কথা বলে বসেন— “বেড়া বেশিদিন একটানা এক জায়গায় আটকে আছি। লেখক জীবনের প্রারম্ভে একদিন কথায় কথায় আমাকে জানিয়েছিলেন, ঘুরে বেড়াতে পেলো তিনি আর কিছু চান না।” (সরোজ, ১৯৭৯ : ভূমিকাংশ)

মানুষকে জানার গভীরতা নিয়ে তিনি প্রবেশ করেছেন অধ্যাত্মলোকে। কালকূটের এ অধ্যাত্মবোধ প্রচলিত ধর্মের বিষয় নয়। নির্জন সৈকতে রচনায় এরই সাক্ষ্য :

হঠাৎ মনে হল, তাই বেরিয়ে পড়লাম, ঘুরলাম, দেখলাম, জয় করলাম, বিজিত বা কোথাও, তা হলেও নটে গাছটি মুড়াতো, আমার কথাটি ফুরাতো। কিন্তু এমন হঠাৎ মনে করা আর বেরিয়ে পড়ার বিলাসিতা আমার চারপাশে নেই। মনে মনে যদি বা বিবাগী, বৈরাগ্যের ধূলাপথে জীবনের অয়ন চলন সবটুকু মিলিয়ে নেব, সে স্বাধীনতা পাইনি। ঘর ছাড়া যখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে, তখনই বাইরের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। সেই অপ্রতিরোধ্য বাসনার ভূমিকা তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ল। (কালকূট, ১৯৭২ : ৯)

নাগরিক বৈদম্বের মোড়কটা ছিন্ন করে ফেলেন কালকূট। মানুষের সাধনা ও ধর্মধারণের পথকেও খাটো করে দেখেন না। প্রয়াগের কুম্ভমেলা দর্শনে কালকূট পেয়েছিলেন তাঁর অস্বিষ্ট ভারতচিত্র আবিষ্কারের প্রেরণা। আর এজন্যই তিনি বলেছিলেন, ‘লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি ধর্মান্বিত হয়, তবে খুঁজেই দেখিনা কেন, লক্ষ মনের কোন্‌ চোখে পরানো আছে সেই ঝুলি।’ (কালকূট, ১৯৭৫-১৯৯১ : ১২) যা কিছু অদৃশ্যপূর্ব, যা কিছু অপ্রাপ্য-অধরা তার জন্যই তাঁর ব্যাকুলতা। প্রয়াগের লক্ষকোটি মানুষের মিলনমেলায় স্বদেশের মানুষের নাড়ীর স্পন্দনকে আবিষ্কার করেছেন কালকূট। ভূ-ভারতের বেশিরভাগ মানুষই ধর্মাচ্ছন্ন, প্রান্তিক মানুষ সংস্কারাঙ্ক। তাদের জীবনযাপন ও চৈতন্য নিয়ে খেলা করেছে রাজনীতিবিদরা। মিথ্যা রাজনীতির ফাঁদপাতা গৃহে তাদেরকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে। এসব মানুষ অবচেতন অভিজ্ঞানে তা বুঝতে পারলেও অবস্থা বদলাতে অপারগ। মধ্যশ্রেণির রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার কাছে তারা পরাজিত। তাদের চিন্তাধারা অবদমিত, কণ্ঠস্বর অবনমিত, চক্ষু নির্মিলিত। অবহেলিত জাতিগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক ইতিহাস অন্বেষণ করলে সে সত্য ধরা পড়ে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যকের সত্যচরণ এজন্যই তথাকথিত সভ্যদের সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কালকূটের রচনায় প্রান্তিক মানুষের পরাভবের সঙ্গে বিভূতিভূষণের কথা প্রাসঙ্গিক :

বুঝি না কেন এক-এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কী বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাহারা যত দিন যায় তত উন্নতি করে – আবার অন্য জাতি হাজার বছর ধরিয়ও সেই একস্থানে স্থাপবৎ নিচল হইয়া থাকে? বর্বর আর্যজাতি চার-পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চরক-সুশ্রুত লিখিল, দেশ জয় করিল, সাম্রাজ্য পত্তন করিল, ভেনাস দ্য মিলোর মূর্তি, পার্থেনন, তাজমহল, কোলোঁ ক্যাথিড্রাল গড়িল, দরবারি কানাড়া ও ফিফথ সিমফোনির সৃষ্টি করিল, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা, আমাদের দেশের ওই মুণ্ডা, কোল, নাগা, কুকিগণ যেখানে সেখানেই কেন রহিয়াছে এই পাঁচ হাজার বছরে? (বিভূতিভূষণ, ২০০৮ : ৫৯০)

সভ্যতাগর্বি আর্য়গণ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিল। বিশাল অংশ অনার্যদের সুখ-দুঃখের ইতিহাস অস্বীকার করেছিল। আজও তাদের ইতিহাস অস্বীকার থেমে নেই, কলাকৌশল পাণ্টেছে মাত্র। সাংস্কৃতিক শাসন-শোষণ চালানোর মহাপ্রকল্প এখন আর অনাবিষ্কৃত নয়। কালকূটও তাঁর প্রখর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সত্যগুলো উন্মোচনে সক্ষম ছিলেন। একসময়ের মার্কসবাদী সমরেশ বসুর অন্যসত্তা কালকূট যেন ভিন্নপথের সমাধানসূত্র। স্বদেশ, মানবমুক্তি ও রাজনৈতিক-বিপ্লবের পক্ষে তা জীবনু অস্ত্র।

কালকূট আপন খেয়ালে বহমান এক জনপদ থেকে আরেক জনপদে। এর মধ্য থেকেই ধৃত হয় নিরেট নিবিড় জীবন। বাউল সন্ন্যাসীর মেলা, আখড়া, বনবাদার, অরণ্য, গ্রাম-নিকুঞ্জ কি শহর যাতায়াত তাঁকে বিচিত্র অনুভবের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। অমৃত বিষের পাত্রে কালকূটের অরণ্য নির্বাসন নয়। তিনি প্রতিকূল মন নিয়ে দিল্লিতে উপস্থিত হন। অপরিচয়ের আনন্দই এর বড় অভিপ্রায়। সেখানে আবিস্কৃত হয় ভিন্ন নারীর অন্তরঙ্গণ। অন্যথা কালকূট-সাহিত্যে বনভ্রমণ একটি বিশেষ দিক। বিভিন্ন তীর্থে বাউল-সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি পেয়েছেন অনিবর্তনীয় জীবনের স্বাদ। কালকূট-ভ্রমণে নাগরিক জীবন যেমন এসেছে, তেমনি সভ্যতাকে আড়াল করে অরণ্যচারী মানুষে তাঁর অন্বেষণ পরিণত হয়েছে স্বতন্ত্র এক দর্শনে। মহারণ্যিক সৌন্দর্যের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে অরণ্যমানব। বিভূতিভূষণের অরণ্য-সৌন্দর্যের উত্তরাধিকারী হয়েও তিনি স্বতন্ত্র একটি স্বর তৈরি করেছেন। *মন চলা বনে* (১৯৭৩) *বনের সঙ্গে খেলা* (১৯৭৪), *প্রেম নামে বন* (১৯৭৫)- এই তিন উপন্যাসে নয় দিনের অভিজ্ঞতায় বনভ্রমণের চিত্র অঙ্কিত। *মন চল বনে* উপন্যাস নবীন আগ্রাসী চোখে অরণ্য অবলোকন। সে-অভিজ্ঞতারই সম্প্রসারণ *বনের সঙ্গে খেলা*। *প্রেম নামে বন* গহীন অরণ্যের অবচেতন, কালকূটের আবিষ্কার সিংজীর অন্তর্দ্বন্দ্বয় হৃদয়। তৃপ্তি ভৌমিকের আরণ্যিক প্রেমের বহিঃপ্রকাশ মহত্তম মহিমাপ্রাপ্ত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অরণ্যবিহার *বনের সঙ্গে খেলা* উপন্যাসে ঘটেছে। এদেলবা গ্রাম ও সুরসতিয়ার কাহিনি দিয়ে অরণ্যবাসীর অন্তর্দর্শে তিনি যাত্রা করেছেন। অরণ্য যেন মায়ার হরিণ; তার কাছে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা যায় কিন্তু অধরাই থেকে যায়। প্রকৃতির নিজস্ব রূপ-মহিমায় আপনক্রোড়েই সে সুন্দর। অরণ্যবিশুক্ত জীবনে সুরসতিয়ার অরণ্য প্রতিমূর্তি মেলে না; তারা অরণ্য নিবিড়তারই আরেক নাম। আগ্রাসী নগরসভ্যতার তথাকথিত জোয়ার প্রগতি ও আধুনিকতার নামে মুণ্ডাদের প্রাকৃত জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। এসব চিন্তায় কালকূটের প্রখর মানবপ্রেম ও দৃষ্টির স্বচ্ছতা ফুটে উঠেছে। মূলবাসী-আদিবাসী সঙ্কটের স্বরূপ তিনি যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

কালকূটের কাছে অরণ্য নিছক মোহনীয়তা ও রোমান্টিক বাতাবরণ হয়ে থাকে না। পুরাণ, ইতিহাস ও আত্মদর্শনের পথ বেয়ে তিনি গুরুতর জীবনসত্যের সন্ধান করেন। *শাম্ভু, প্রাচ্যেতস, যুদ্ধের শেষ সেনাপতি, পৃথা* ও *অস্তিম প্রণয়* এই পাঁচটি আখ্যানে বিধৃত হয় কালকূটের গভীর পুরাণ অভিজ্ঞান। পুরাণের নতুন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তিনি স্বদেশ

ও সমাজের সংগ্রামী চরিত্রের স্বরূপ অন্বেষণ করেন। কালকূট এজন্যই বলেন, ‘এবারের ভ্রমণটা ইতিবৃত্তের ঝরা পাতার পথে।’ (কালকূট ১৯৯৬ : ৯২৭৮) বলা বাহুল্য কালকূটের এই ভ্রমণ পুরাণবিদ বা ইতিহাসবিদের সঙ্গে তুল্য নয়। পুরাণের ধূলিধূসর পথে ঐতিহাসিক তাৎপর্য অন্বেষণ করে চলেন তিনি। তাঁর ভ্রমণপথে আবিষ্কৃত হয় ভারত-ভূগোলের বিশাল পটভূমি— দ্বারকাবতী, কুরুক্ষেত্র, অশ্বিনদী, রৈবতক পর্বত কিংবা তমসা নদী। এই ভ্রমণপথেই সংশ্লিষ্ট হয় দিল্লির সুলতান শাহী, ঢাকা সোনার গাঁর রাজ-আধিপত্য, নবদ্বীপের চৈতন্যভূমি থেকে নীলাচল। পুরাণের নির্মোক খসে গেলে কালকূট হয়ে ওঠেন অনন্য শিল্পদ্রষ্টা। মহাভারতের কাহিনি থেকে নির্মিত হয় অন্তিম প্রণয়, যুদ্ধের শেষ সেনাপতি ও পৃথা উপন্যাসত্রয়ী। আত্মোদ্ধোধন, মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় কালকূট চরিত্রকে অভিষিক্ত করেছেন ত্যাগ ও ভালবাসার অনন্যতায়। তিনি আত্মদ্রোহ ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন ব্যক্তিমানুষের চরম নৈঃসঙ্গ্য। নারীচরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে অন্তর্দন্দ্ব, কর্তব্যপরায়ণতা ও সন্তান-বাৎসল্য। পুরাণ তাঁর রচনায় কাহিনি ও ঘটনাবিন্যাসের খোলসমাত্র, তার আসল রূপ বৃহত্তর জীবন-পরিবৃত্ত। কালকূট-রচিত পৌরাণিক ঘটনাপ্রবাহে সঞ্চারিত হয়েছে পুরাণ-আদলে মানুষের প্রতিকল্প।

পরিশেষে বিভিন্ন শ্রেণির বিচিত্র মানুষের আনাগোনা সমৃদ্ধ সমরেশ-সাহিত্য। উত্তরঙ্গ থেকে আরম্ভ করে আত্মদর্পণে নির্মিত যুগ যুগ জীয়ে উপন্যাস, প্রভূত ছোটগল্প এবং ছদ্মনামী কালকূট-রচনার পটভূমিতে বহুবিচিত্র মানুষের পদচারণা। এমনকি জীবনের ঘনায়মান শেষপ্রান্তে অসমাপ্ত উপন্যাস দেখি নাই ফিরেতে তিনি অঙ্কন করেছেন অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের অন্তকরণ। অসংখ্য মানুষের মুখচ্ছবিতে কালকূট-রচনা হয়ে উঠেছে প্রগাঢ় জ্ঞানী থেকে নিপাট মূর্খ, প্রবল বিভ্রাট থেকে হতদরিদ্র, তত্ত্বজিজ্ঞাসু থেকে সন্ন্যাসী, সংস্কারাচ্ছন্ন অনিকেত মানুষ থেকে সংসার-আবদ্ধ মানুষের বিরাট ক্যানভাস। পৌরাণিক ঘটনার পুনর্নিমাণে ইতিহাস ও দর্শনের বিচিত্র পথে কালকূট জীবনঘনিষ্ঠ ও প্রপদী সত্যের সন্ধান পেতে চেয়েছেন। বস্তুত সমরেশ বসু ও কালকূট উভয় সাহিত্যসত্তা ভাবে-বিভাবে মনুষ্যলোকের দিকে ধাবমান। মানুষের বিচিত্র রূপাঙ্ঘষণই সমরেশ বসুর কথাসাহিত্যের আরাধ্য।

সহায়কপঞ্জি

অচ্যুৎ গোস্বামী (১৯৬৮)। বাংলা উপন্যাসের ধারা। পাঠ ভবন, কলকাতা।

অজয়কুমার ঘোষ (২০০২)। ‘লিও টলস্টয়’। নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা [সম্পাদিত। তরুণ মুখোপাধ্যায়], দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

অপূর্বকুমার রায় (১৯০৮)। ‘ভ্রমণ সাহিত্য’। সাহিত্য রূপ-বিচিত্রা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

অমর মিত্র (২০০০)। ‘অনন্য উত্তরাধিকার’। সমরেশ বসু : মানুষের কথাকার [সম্পাদনা : স্বপন দাসাধিকারী], এবং জলার্ক। পুস্তকবিপণি, কলকাতা।

- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৭৪)। *বাংলা উপন্যাসের পঞ্চাশ বছর ১৯২৩-৭২*। দে'জ প্রথম প্রকাশ, কলকাতা।
- অরুণকুমার পাল (২০০০)। 'নকশালবাড়ির নগরায়ণ ও মহাকালের রথের ঘোড়া'। *এবং জলার্ক* ২য়পর্ব, কলকাতা।
- অশ্রুকুমার সিকদার (১৯৮৮)। *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*। প্রথম প্রকাশ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
- আবুল আহসান চৌধুরী (২০০৮), *লালন সমগ্র*। সংগ্রহ-গবেষণা-ভূমিকা-সম্পাদনা। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।
- আশিসকুমার দে (১৯৮৩)। *উপন্যাসের শৈলী*, তারাক্ষর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্যাপিরাস, কলকাতা।
- ই.এম. ফরস্টার (২০০০)। 'উপন্যাসের বিষয়-আশয়' [সম্পাদক : সাজ্জাদ আরেফিন, বঙ্গানুবাদ : সুব্রত বড়ুয়া], *নান্দীপাঠ* [শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ঐতিহ্য, বিষয়ক ত্রৈমাসিক, সংখ্যা : এক, বর্ষ : এক], ঢাকা।
- ইরফান হাবীব (২০০১)। *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ* [ভাষান্তর: কাবেরী বসু], ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., কলকাতা।
- কালকূট (১৯৭২)। *নির্জন সৈকতে*। প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলিকাতা।
- কালকূট (১৯৮৬)। *ধ্যান জ্ঞান প্রেম*। প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা।
- কালকূট (১৯৮৭)। *ধ্যান জ্ঞান প্রেম*। *কালকূট রচনাসমগ্র* [নিতাই বসু সম্পাদিত], মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা।
- কালকূট (১৯৯৬)। *প্রাচ্যেতস*। *কালকূট রচনাসমগ্র* [তৃতীয় খণ্ড, নিতাই বসু সম্পাদিত], মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা।
- কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোন্গার্দ-লেভিন, গ্রিগোরি কতোভস্কি (১৯৮৬)। *ভারতবর্ষের ইতিহাস* [অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন শর্মা], দ্বিতীয় সংস্করণ প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।
- গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৮৬)। 'কল্লোল চেতনা'। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*। প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা।
- গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৯১)। *বাংলা সাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা*। পুস্তকবিপণি, কলকাতা।
- জহর সেন মজুমদার (২০০১)। *উপন্যাসের ঘরবাড়ি*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
- জীবেন্দ্র সিংহ রায় (১৯৮৭)। *কল্লোলের কাল*। দে'জ প্রথম সংস্করণ, কলকাতা।
- টেরি ইগলটন (২০০৪), *সাহিত্যতত্ত্ব* [মূলগ্রন্থ : Terry Eagleton, *Literary Theory An Introduction*, অনুবাদ : খোন্দকার আশরাফ হোসেন], নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
- দিবেন্দ্র পালিত (১৯৮৮)। 'এক ধরনের আশ্রয়'। *দেশ* [সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা], কলকাতা।
- দীপালি নাগ (১৯১২)। *এবং মানুষ সমরেশ বসুর গল্প*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
- নরহরি কবিরাজ (১৯৭৮)। *স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা*। চতুর্থ সংস্করণ, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।
- নিতাই বসু (১৯৮৯)। *আমার আয়নায় মুখ* [সমরেশ বসুর একান্ত সাক্ষাৎকার], মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা।

- পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৯)। ‘বিবর’। সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন। রেডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।
- বারিদবরণ ঘোষ (১৯৯৬)। ‘ভূমিকা’-কল্লোলের গল্প পঞ্চাশৎ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
- বিনয় ঘোষ (১৯৯৯)। ‘কলকাতার তরুণদের মন’। মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিভ বিভ্রোহ। ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা।
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৮)। আরণ্যক, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস [সম্পা: হায়াৎ মামুদ ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়], অবসর প্রকাশ, ঢাকা।
- বীরেন্দ্র দত্ত (১৯৯১)। ‘সমরেশ বসু পালাবদলের কথাকার’। প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস [সম্পাদক: অরুণ স্যানালা], ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।
- বুদ্ধদেব বসু (১৯৫৮)। ‘কলকাতা’। হঠাৎ আলোর ঝলকানি। ওয় মুদ্রণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৪)। ‘সাহিত্য করার আগে’। লেখকের কথা। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা.লি. কলকাতা।
- ম্যাক্সিম গোর্কি (১৯৭৯)। মা, প্রথম খণ্ড [অনু : পুষ্পময়ী বসু, সম্পা: অরুণ সোম] ‘রাদুগা’ প্রকাশন, মস্কো।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০০)। ‘সভ্যতার সংকট’। প্রবন্ধসমগ্র। সময় প্রকাশন, ঢাকা।
- র্যালফ ফল্ড (২০০৫)। উপন্যাস ও জনগণ (অনু : বদিউর রহমান)। প্যাপিরাস, বাংলাবাজার ঢাকা।
- সমরেশ বসু (১৯৮৬)। ‘প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি’। দেশ। কলকাতা।
- সমরেশ বসু (১৯৯৭)। ভূমিকাংশ। ‘সমরেশ বসু ব্যক্তি ও লেখক’। সমরেশ বসু রচনাবলী-১, [সম্পা: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়], আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
- ‘অকাল বৃষ্টি’, অকাল বৃষ্টি, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, [সম্পা: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়], কলকাতা।
- ‘জলসা’, মরশুমের একদিন। কলকাতা।
- (২০০৩)। সমরেশ বসু রচনাবলী-৮ [সম্পা: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়], কলকাতা।
- (২০০৪)। ‘শানা বাউরির কথকতা’। সমরেশ বসু রচনাবলী-৯ [সম্পা: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়], কলকাতা।
- (২০০৫)। ‘ফকির’, সুবর্ণা, সমরেশ বসু রচনাবলী-১০ [সম্পা: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়], কলকাতা।
- ‘রং’, দেওয়াল লিপি, সমরেশ বসু রচনাবলী-১০, কলকাতা।
- (২০০৯)। ‘শুভ্রা-সন্ধ্যা সংবাদ’। ও আপনার কাছে গেছে। সমরেশ বসু রচনাবলী-১৩ [সম্পা: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়], কলকাতা।
- সমরেশ বসু (১৯৮৮)। ‘নিজেকে জানার জন্য’। দেশ [সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা], কলকাতা।
- সরদার আব্দুস সাত্তার (১৯৯৭)। ‘সমরেশ বসু : তাঁর শিল্প ও সংগ্রাম’, কথাসাহিত্য সমীক্ষণ, বই প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭৯)। ‘ভূমিকা অংশ’। কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড [সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত], মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা।
- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮২)। ‘প্রসঙ্গ সমরেশ: একটি সাক্ষাৎকার’। অপরাজিত [সমরেশ বসু সংখ্যা], কলকাতা।

- সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০২)। ‘ভূমিকা অংশ’। *বাথান*। *সমরেশ বসু রচনাবলী-৭*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
- হাসান আজিজুল হক (১৯৮৯)। ‘লেখকের উপনিবেশ’। *কথাসাহিত্যের কথকতা*। ‘একুশে’ সংস্করণ, কলকাতা।
- হায়াৎ মামুদ [সম্পা] (১৯৮৫)। *লেভ তল্শ্চোয়*। আহ্ফা-এশীয় লেখক ইউনিয়ন, মুক্তধারা, ঢাকা।
- হিতেন্দ্র মিত্র (১৯৯৫)। *সমরেশ বসু : মুক্তিপন্থার সন্ধান*। প্রাইমা পাবলিকেশন্স, কলকাতা।
- হীরেন চট্টোপাধ্যায় (১৯৮২)। *বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি*। তারাসংকর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।
- Andriy TsintsirukŌs (2004), ‘Freedom beyond Reason in Dostoevsky’ *Basic Writings of Existentialism* [Marino, Gordon], The Modern Library, New York.
- Fiona Tolan (2006), ‘New French feminisms : Kristeva, Cixous, Irigaray’, *Feminisms*, Ed. Patricia Waugh, *Literary Theory and Criticism*, Oxford University Press, London.
- Humayun Kabir (1968), *The Bengali novel* [Rabindranath Tagore Centennial Lectures], The University of Wisconsin Madison, USA, Published by Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta
- Leonard Mosley (1961), *The Last Days of the British Raj*, First edition, Weidenfield and Nicolson, London.
- Neil Cornwell (2006) *The Absurd in Literature*, [https://www.scribd.com/doc/161289660/absurdism-recite-docx], NY: Manchester University Press ,New York.
- Simon Dentith (Ed), ŌVoloshinov : Language, speech and utterance and verbal interaction’, *Bakhtinian thought* [https://edisciplinas.usp.br/enrol/index.php?id=70887], 11 New Fetterlane, London EC4P4EE, Routeledge, New York.